Written strictly in accordance with the Approved Syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal, for Classes IX, X & XI of Higher Secondary and Multipurpose Schools of West Bengal.

(*Vide Circular No. HS/1/58, dated 7th March, 1958.*)

ইতিহাসের ধারায় ভারত

[উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের **নবম, দশম** ও **একাদশ শ্রেণীর জন্য**
নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত]

প্রথম খণ্ড : নবম শ্রেণীর জন্য

আসাম বুক ডিপো
২১, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ইতিহাসের ধারায় ভারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব : বৈচিত্র্যময় ঐক্যময় ভারত

Syllabus : (*a*) Man and his environment—Two basic factors in history. Geography—the principal element of environment. Geographical features contributing to the unique character of some nations, *e. g.* Greece and England.

Physical features of the Indian sub-continent—five well-defined areas, their political significance. Importance of the Himalayas—relations with Nepal, Tibet, Burma, China, Afghanistan and Central Asia. Importance of the Vindhyas—barrier to unification. Importance of the Indian Ocean—maritime contacts. Islands in the Indian Ocean. Pattern of trade. Different attitudes of Northern and Southern India towards the sea.

(*b*) Man in India—different races, languages, religions, ways of life—evolution of a composite culture.

(*c*) Unity in Diversity.

পাঠসূচী : (ক) মানুষ ও তাহার পরিবেশ—ইতিহাসের দুইটি মূল উপাদান। ভূগোল—পরিবেশের প্রধানতম অংশ। কতিপয় জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে দেশের ভৌগোলিক গঠনের প্রভাবের দৃষ্টান্ত—যথা, গ্রীস, ইংল্যাণ্ড।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকৃতিক গঠন—পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল, তাহাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। হিমালয়ের গুরুত্ব—নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, চীন, আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ার সহিত সম্পর্ক। বিন্ধ্য পর্বতের গুরুত্ব—ঐক্যসাধনের অন্তরায়। ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব—সামুদ্রিক যোগাযোগ। ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধরন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়গণের সমুদ্র সম্পর্কে মনোভাবের পার্থক্য।

(খ) ভারতের অধিবাসী মানবগোষ্ঠী—বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, জীবনযাত্রার বিভিন্ন পদ্ধতি ও রীতি-নীতি—একটি মিশ্র ও সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ।

(গ) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

ইতিহাস কাহাকে বলে ?—সংস্কৃত ভাষায় "ইতিহাস" শব্দের অর্থ হইল "ইতি হ আস" বা "ইহাই ছিল"। অর্থাৎ অতীতে যাহাই ছিল, তাহার কাহিনীই ইতিহাস। এই সূত্রটি মানিয়া লইলে ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল বিষয়ের সহিত ইতিহাসের কিছুটা যোগ থাকিলেও, এগুলিকে আমরা ইতিাহাসের মূল বিষয় বলিয়া মনে করি না। তাই আধুনিক পণ্ডিতগণ "মানুষের সহিত অপর মানুষদের ব্যবহার ও কার্যকলাপ এবং মানুষ ও বিভিন্ন মানবদলের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ধারা সংক্রান্ত পর্যালোচনাকেই" ইতিহাস আখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ মানব বা বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর কার্যকলাপ, তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক, সংঘাত ও সংহতি এবং তাহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবাহিক কাহিনীই হইল ইতিহাস। এক কথায়, মানুষই ইতিহাসের নায়ক ও নিয়ন্তা।

মানুষ ও তাহার পরিবেশ—ইতিহাসের দুইটি মূল উপাদান।—এখন প্রশ্ন আসে, মানুষের বৈশিষ্ট্য কি, যাহা তাহাকে ইতিহাসের নায়ক ও নিয়ন্তা করিয়াছে। অনেকে বলিবেন, তাহারা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, তাহারা সামাজিক প্রাণী অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং তাহাদের রচনাশক্তি বা নির্মাণ-পটুতা রহিয়াছে। কিন্তু এই গুণাবলী প্রাণিজগতে বহু পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের মধ্যেও দেখা যায়। মৌমাছি বা পিপীলিকার দলবদ্ধভাবে বাস করিবার ও কাজ করিবার ক্ষমতা সুবিদিত। বাবুই পাখী ও মৌমাছির নিজ নিজ বাসা নির্মাণের শক্তি বিস্ময়কর। বানর ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও বুদ্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। সুতরাং বুদ্ধি, দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবণতা এবং নির্মাণশক্তিই মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রয়োজন মতো প্রকৃতি ও পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং প্রয়োজন মতো প্রকৃতি ও পরিবেশের পরিবর্তন-সাধনের শক্তি। শীতের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য মানুষ তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের উদ্‌ভাবন করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী শীতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক

মানুষের বৈশিষ্ট্য

স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করে। এমন কি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বহু প্রাণী জীবলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথাও খাদ্যাভাব ঘটিলে অন্যান্য প্রাণী খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যায়, এমন কি উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এক-একটি প্রাণীর সমগ্র জাতি জীবলোক হইতে নিশ্চিহ্নভাবে লোপ পায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, তাহারা খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য খাদ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। ইহা হইতে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতেছি যে, মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি—এক, মানুষ নিজ উদ্‌ভাবনী শক্তির দ্বারা নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন মতো প্রকৃতি ও পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়, দুই, মানুষ নিজ প্রয়োজন মতো নিজ উদ্‌ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ও পরিবেশ পরিবর্তন করে। তাই আমরা দেখি, মানুষ তাহার বাসব্যবস্থা, বেশভূষা, খাদ্য ইত্যাদির পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, একদা যেখানে অরণ্য বা জলাভূমি ছিল, মানুষ সেখানে শস্যশ্যামল গ্রাম ও সুরম্য নগর রচনা করিয়াছে। অন্য পক্ষে, পরিবেশ মানুষের বাসব্যবস্থা, খাদ্য, বেশভূষা, জীবনযাত্রার বিভিন্ন পদ্ধতি ও রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই ইতিহাসের ধারায় একদিকে যেমন আছে মানুষের সহিত মানুষের সংঘাত ও সংহতির ধারাবাহিক কাহিনী, তেমনি অন্যদিকে রহিয়াছে পরিবেশের সহিত মানুষের সংগ্রাম ও সামঞ্জস্যের ধারাবাহিক বিবরণ। তাই ইতিহাসের মূল দুইটি বিষয় হইল—মানুষ ও তাহার পরিবেশ।

পরিবেশের পরিবর্তন ও পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের শক্তি

ইতিহাসের মূল উপাদান

ভূগোলই পরিবেশের প্রধানতম অংশ।—পরিবেশ বলিতে আমরা সাধারণত জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, অনুর্বরতা, খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতিকেই বুঝি। কোনও স্থানের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যই এগুলিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই তাই সেই দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। তাই ভারতীয় ইতিহাসের

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

ধারাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। "ভৌগোলিক জ্ঞান ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিভূমি"—এ প্রবচনটি একান্তই সত্য।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য—জাতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য গঠনে তাহার প্রভাব—গ্রীস ও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত।—কোনও দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সেই দেশের ইতিহাসকে কিভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে গ্রীস ও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে। গ্রীসের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হইল তাহার দুস্তর পর্বতময়তা, ভূমির অনুর্বরতা এবং সমুদ্রের তীরবর্তিতা। গ্রীসদেশ অসংখ্য পর্বতে পূর্ণ হওয়ায় সেখানে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও দুস্তর পর্বত-প্রাচীরে বেষ্টিত সুরক্ষিত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। পর্বতময়তার জন্য এই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কখনও ঐক্যবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী বৃহৎ কোনও রাষ্ট্রের জন্মদান করিতে পারে নাই। অন্য পক্ষে, রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র হওয়ায় নাগরিকরা সহজেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিতে পারিত। ফলে গ্রীকরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গ্রীসদেশে গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্রগুলির বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। গ্রীসদেশের ভূমি অনুর্বর হওয়ায় গ্রীকদের দৈহিক পরিশ্রম বিশেষভাবে করিতে হইত। ফলে গ্রীক জাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের ভূমি অনুর্বর হওয়ায় গ্রীকরা উপনিবেশ স্থাপনে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করায় সহজেই তাঁহারা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং সেই যুগে নৌবলে তাঁহাদের সমকক্ষ প্রায় কেহই ছিল না বলিলেও চলে। সূর্যকরোজ্জ্বল ও দক্ষিণ মৃদুমন্দ পবনে ব্যজিত গ্রীসের আবহাওয়া শিল্প-সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার পক্ষেও যথেষ্ট অনুকূল ছিল।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায়, তাহার জাতীয় জীবনকে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের চতুর্দিক সমুদ্র-বেষ্টিত। ইহার জলবায়ু বর্ষা ও শীতপ্রধান। ভূমি অনুর্বর ও খনিজ সম্পদে পূর্ণ। বর্ষা ও শীতের প্রাধান্য থাকায় ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা

জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সুপটু হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের মৃত্তিকা শস্য-উৎপাদনে কৃপণা এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধা হওয়ায় ইংরেজ জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শ্রমশিল্পে অতিশয় উন্নত হইতে পারিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রবেষ্টিত দ্বৈপায়ন জীবনধারাই তাহাকে সমুদ্র-অভিযানে অনুপ্রেরিত করিয়াছিল এবং ইংল্যাণ্ড নৌশক্তিতে বলীয়ান হইয়া একদা সুদূর ভারত, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়, আফ্রিকা ও আমেরিকায় তাহার প্রধান্য বিস্তার করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ড

ভারতের ভৌগোলিক সীমা।—ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও যে তাহার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তনশীল নহে। প্রকৃতিই তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়, উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ এবং উত্তর-পূর্বে লুসাই ও পাতকোই প্রভৃতি পর্বতমালা বিরাজ করিতেছে। বাকী তিন দিকে—পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে—যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহা-সাগর এবং আরব সাগর রহিয়াছে। এই সমুদ্র-পর্বতবেষ্টিত ভারতভূমির সীমারেখা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল। (পাকিস্থান সহ) ভারতভূমির সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য এইরূপ:—উত্তর স্থলসীমা ১৬০০ মাইল, উত্তর-পশ্চিম স্থলসীমা ১২০০ মাইল, ও উত্তর-পূর্ব স্থলসীমা ৫০০ মাইল; এবং সমুদ্র-উপকূলের সীমা প্রায় ৩৪০০ মাইল।

ভৌগোলিক সীমা

হিমালয়—ভারতীয় ইতিহাসে হিমালয়ের গুরুত্ব।—পর্বত ও সমুদ্র ভারতবাসীর জীবনধারা তথা ভারতীয় ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব বর্ণনাতীত। তাই হিমালয় ভারতীয় হিন্দুদের নিকট দেবতাদের লীলাভূমি ও আবাসস্থল। তাই হিমালয় কেবল পর্বত নহে, হিন্দুদের নিকট হিমালয় দেবতাত্মা, হিন্দুদের প্রধান আরাধ্যা দেবী পার্বতীর জনক। হিমালয়েই হিন্দুদের দেবাদিদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাস। ভারতবাসীর চিন্তা, শিল্প-সংস্কৃতি ও ধর্মে হিমালয় যেভাবে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য

কোনও পর্বত কোন দেশ ও জাতির জীবনে করে নাই। ভারতীয় জীবনে
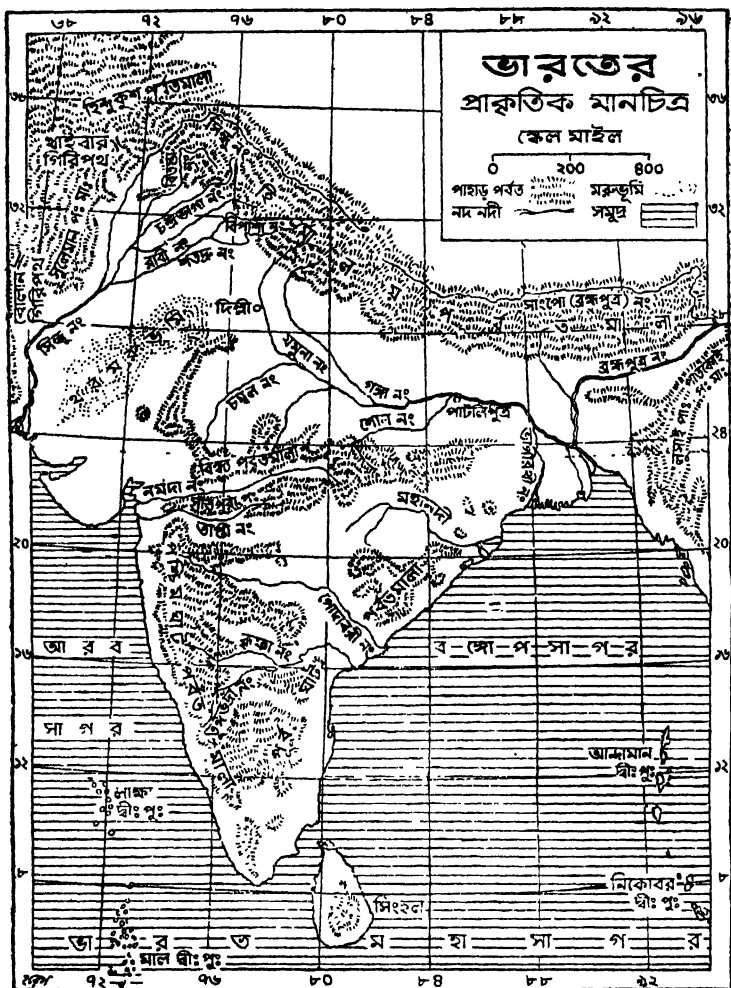
হিমালয়ের এই প্রাধান্তের কারণ কি? হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তরে এক দুস্তর ও দুর্ভেদ্য মহাপ্রাচীরের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ইহা দৈর্ঘ্যে

প্রায় ২০০০ মাইল, প্রস্থে প্রায় ১৫০ মাইল এবং ইহার সর্বোচ্চতা ২৮০০০ ফুটেরও অধিক। হিমালয় ও তাহার সংলগ্ন পর্বতমালা দক্ষিণে ও বামে যেন দুই দুর্বার বাহু মেলিয়া বলিষ্ঠ দানবের মতো ভারতবর্ষকে ইরান, আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চিমে, উত্তরে ও পূর্বে অগাধ স্নেহভরে আগলাইয়া রাখিয়াছে।

• হিমালয়ের আয়তন

হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালার এই পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টনী ভারতবর্ষকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে সুনির্দিষ্টভাবে যেমন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তেমনি তাহাকে দিয়াছে নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র্য। ফলে ভারতবাসীরা হিমালয়ের অপর পারের দেশগুলির রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন সম্পর্কে চিরদিনই নির্বিকার ও উদাসীন ছিলেন। ভারতের রণবীর সম্রাটরা কখনও হিমালয়ের অপর পারে রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নাই। তাঁহাদের সকল সমর-অভিযান হিমালয়ের দক্ষিণেই সীমাবদ্ধ ছিল। মৌর্য, বাহ্লীক গ্রীক, কুষাণ ও মুঘল সম্রাটদের সময়ে হিমালয়ের অপর পারে পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতীয় সাম্রাজ্য কখনও কখনও বিস্তার লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। গ্রীকদের সহিত যুদ্ধের ফলেই আফগানিস্থানের কতকাংশ ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বাহ্লীক গ্রীক, কুষাণ ও মুঘলগণ বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। তাই হিমালয়ের অপর পারে অবস্থিত কতক অঞ্চল তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু ভারতীয় সম্রাটদের লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল "হিমবৎসেতুপর্যন্তম্" বা হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করা।

• রাজনৈতিক গুরুত্ব

হিমালয়ের অপর পারে অবস্থিত দেশগুলি সম্পর্কে সচেতন না থাকায় বারে বারে ভারতীয় ইতিহাসে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ভারতবাসীরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলির রণদুন্দুভি শুনিতে পান নাই। তাই যখনই বহিঃশত্রুর আগমন ঘটিয়াছে, তখনই তাঁহারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং গ্রীক, শক, হুন, তাতার, মুঘল, কোনও শক্তির আঘাতকে প্রতিহত করিতে পারেন নাই।

উত্তর-পশ্চিমে ভারতের খাইবার, বোলান প্রভৃতি গিরিপথগুলি বারে

বারে বহিঃশত্রুর আগমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। উত্তর-পূর্বে আহোম জাতিরও ভারত-প্রবেশ এইভাবেই ঘটিয়াছে। হিমালয়ের গিরিপথে উত্তর হইতে তিব্বতীরাও অভিযান করিয়াছে। এই সকল গিরিপথে চিরদিন অসংখ্য মানবের গমনাগমন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ঘটিয়াছে। এই সকল গিরিপথ দিয়াই পারসিক, গ্রীক, মঙ্গোল ও ঐসলামিক প্রভাব ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে। ঐ সকল গিরিপথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, সিয়াম, এমন কি কোরিয়া ও জাপানেও বিস্তারলাভ করিয়াছে। এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আফগানিস্থান যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, ভারতের গৌরববর্ধনকারী "গান্ধার-শিল্প" তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টেইন চীনা তুর্কিস্থানের মরুময় অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যেসব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন, এ প্রসঙ্গে তাহাও কম উল্লেখযোগ্য নহে। হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত নেপাল ভারতীয় ইতিহাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে পারে নাই।

গিরিপথের গুরুত্ব

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের সহিত সম্পর্ক

কেবল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতেই নহে, অর্থনৈতিক দিক হইতেও হিমালয় ভারতীয় ইতিহাসে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। উত্তর ভারত সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাহার উপনদী ও শাখানদীগুলির দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। এই প্রধান তিনটি নদী হিমালয় বা তৎসংলগ্ন উচ্চভূমি হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। হিমালয় চিরতুষারাবৃত থাকায় এই সকল নদী বৎসরের সকল সময়েই জলপূর্ণ থাকে এবং উত্তর ভারতকে শস্যশ্যামলা ও সুজলা করিয়া রাখে। উত্তরে হিমালয়ের অভ্রভেদী পাষাণ প্রাচীর বর্তমান থাকায় মৌসুমী বাতাস তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বর্ষণসিক্ত রাখিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, হিমালয়ের প্রাচীর গাত্রে উত্তর হইতে আগত বিশুষ্ক

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষের ভূমি শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইবার ভয়ংকর সম্ভাবনার হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

ভারতীয় ইতিহাসে বিন্ধ্য পর্বতমালার প্রভাব।—হিমালয় পর্বতমালা যেমন ভারতবর্ষকে এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি বিন্ধ্য পর্বতমালাও ভারতের উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের মধ্যস্থলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিন্ধ্য পর্বতমালা বিস্তৃত। উহা ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুই প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলকে উত্তর ভারত বা আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলকে দক্ষিণ ভারত বা দাক্ষিণাত্য বলা হয়। বিন্ধ্য পর্বত

ঐক্যের অন্তরায়

মহা প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান থাকায় উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইতে বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে এই অন্তরায়কে সম্পূর্ণরূপে দুস্তর বা অনতিক্রম্য বলাও চলে না। আর্যগণ প্রথমে দক্ষিণ ভারতে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও সেই বাধাকে যে তাঁহারা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পুরাণে বর্ণিত অগস্ত্যের কাহিনী হইতে জানা যায়ঃ ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতকে তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নতশির থাকিতে বলিয়াছিলেন। অগস্ত্য আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই এবং বিন্ধ্য চিরনতশির রহিয়াছিল। ইতিহাসে দেখা যায়, মৌর্য যুগে, খলজি ও মুঘল

অন্তরায় অনতিক্রম্য নহে

সম্রাটগণের আমলে, বা ইংরেজদের শাসনকালে এই বাধা বারে বারে অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলা চলে, বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতীয় ইতিহাসে ঐক্যের অন্তরায় হইলেও তাহা ভারতবর্ষকে চিরদিন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই প্রতিবন্ধকতা এখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে।

ভারতীয় ইতিহাসে সমুদ্রের গুরুত্ব।—হিমালয়ের মতো সমুদ্রও ভারতীয় ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের তিনদিকে

রহিয়াছে সমুদ্র। এই সামুদ্রিক উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতীয়গণ সম্ভবত সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। বৈদিক যুগে আর্যগণ যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন, তাহার উল্লেখ ঋগ্‌বেদেও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয়গণ যে সামুদ্রিক অভিযানে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশ, মালয়, বোর্নিও, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সহিত সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। ঐ সকল স্থানে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে ভারতীয়গণ পশ্চিমের দেশগুলির সহিতও যোগাযোগ ও বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। আরব, সিরিয়া, মিশর, গ্রীস ও রোমের সহিত যে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা যে বহুল পরিমাণে জলপথেই ঘটিয়াছিল, তাহা এখন সুপ্রমাণিত হইয়াছে। তাই প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ইতিহাসে সমুদ্র ও উপকূলভাগ যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহির্বাণিজ্য

ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের শতকরা ৮৫ ভাগ সমুদ্রপথেই হইয়া থাকে। উপকূল ভাগে ছাড়া অন্য কোথাও ভারতের উল্লেখযোগ্য বন্দর নাই। ভারতের শ্রমশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা এবং ভারতবাসীদের ব্যবহার্য অধিকাংশ সামগ্রীই সমুদ্রপথে আনীত হয়। বিদেশে রপ্তানির জন্যও সমুদ্রপথ ছাড়া গত্যন্তর নাই। কেবল বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে মাল প্রেরণ ভারতের উপকূলভাগ ধরিয়া বন্দর হইতে বন্দরে সমুদ্রপথেই বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে।

অন্তর্বাণিজ্যে সমুদ্রের প্রভাব

ভারতের কৃষি-সম্পদের জন্যও সমুদ্র বিশেষভাবে দায়ী। সমুদ্র হইতে আগত মৌসুমী বায়ুই ভারতের কৃষির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বর্ষা

আনয়ন করে। ভারতবর্ষ যে শস্যশ্যামল হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে হিমালয় ও মহাসমুদ্র। হিমালয় যেমন একদিকে উত্তর হইতে আগত শুষ্ক বায়ুকে প্রতিহত করিয়া ভারতভূমিকে সরস রাখিয়াছে, অন্যদিকে সমুদ্রও তেমনি তাহাকে সজল বায়ুপ্রবাহে বর্ষণসিক্ত করিয়াছে।

ভারতীয় কৃষিতে সমুদ্রের প্রভাব

সমুদ্র সম্পর্কে ভারতীয়গণের মনোভাব।—কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি সমুদ্রের উপর এইভাবে নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও উত্তর ভারতীয়গণ কখনও নৌবলের উপর জোর দেন নাই। মৌর্যগণ হইতে মুঘলগণ পর্যন্ত কোনও উত্তর ভারতীয় সম্রাটই নৌবলকে তাঁহাদের সামরিক শক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। অন্য পক্ষে, দক্ষিণ ভারতীয়গণ সমুদ্র-জয়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতে রণপোত ও পণ্যপোত ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিত, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, চীন, আরব, গ্রীস, রোম প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইত; সমুদ্রপথে ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিত। উত্তর ভারতীয়গণের সমুদ্র সম্পর্কে ঔদাসীন্যই ভারতে পরবর্তী কালে রাজনৈতিক দুর্যোগ ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। মুঘলগণ উত্তর ভারতীয় মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া নৌ-শক্তিকে অবহেলা করিয়াছিলেন। ফলে নৌ-শক্তিতে বলীয়ান ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতে আপন আপন প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছিল এবং অবশেষে নৌবলে সর্বাপেক্ষা বলীয়ান ইংরেজগণ ভারতবর্ষকে পদানত করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয়গণ সমুদ্র সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। চোলরাজগণ নৌশক্তির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের বেশীর ভাগই দক্ষিণ ভারতীয়গণের হস্তে ছিল।

উত্তর ভারতীয়গণের ঔদাসীন্য

দক্ষিণ ভারতীয়গণের আগ্রহ ও উদ্যম

তবে একথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, সমুদ্রের প্রতি উত্তর ভারতীয়গণের এই অনাগ্রহ ও ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ সমুদ্র হইতে উত্তর

ভারতের প্রধান অঞ্চলগুলির দূরবর্তিতা। উত্তর ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলি যে সমুদ্র সম্পর্কে উদাসীন ছিল, তাহা বলা যায় না। সমুদ্রযাত্রায় বঙ্গদেশ ও গুজরাট যে একদা অসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বঙ্গদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্তি ও গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ (বরোঁচ) প্রভৃতি বন্দরগুলি। পূর্বে তাম্রলিপ্তি ও পশ্চিমে নর্মদার উত্তর তীরবর্তী ভৃগুকচ্ছ সমুদ্রাভিযানের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

ভারত মহাসমুদ্রে দ্বীপাবলী।—অন্যান্য মহাসমুদ্রের তুলনায় ভারত মহাসাগরে দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সংখ্যা খুবই কম্। ভারতের নিকটবর্তী দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির মধ্যে সিংহল, মাল দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলির উপর দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বিজয় সিংহ নামে এক ভারতীয় বীরের নাম অনুসারেই সিংহলের নামকরণ হইয়াছিল বলা হয়। ইংরেজগণ সিংহল এবং নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল। আন্দামান ও নিকোবর এখনো ভারতের অঙ্গীভূত রহিয়াছে। সিংহল স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। লাক্ষা দ্বীপ বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মালদ্বীপ ভারতের অঙ্গীভূত হয় নাই।

ভারতীয় ইতিহাসে নদ-নদীর প্রভাব।—ভারতবর্ষের ইতিহাসে নদ-নদীগুলিও একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীগুলি কেবল ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে উর্বর ও কৃষির উপযোগী করিয়া তোলে নাই; যোগাযোগ, যানবাহন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারেও সেগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে যে "নদীমাতৃক" বলা হয়, তাহা অকারণ নহে। সিন্ধু অঞ্চলের সুপ্রাচীন সভ্যতা সিন্ধু নদের তীরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্যগণ সপ্তসিন্ধুর তীরবর্তী অঞ্চলেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। "সিন্ধু" (নদী) শব্দ হইতেই প্রাচীন ভারতীয়গণের

নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ

নাম "হিন্দু" এবং ভারতের নাম "হিন্দুস্থান" হইয়াছিল। গঙ্গা ও শোন (সুবর্ণবাহু) নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্রই বারে বারে ভারতীয় ইতিহাসে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বহু যুদ্ধ নদীতীরেই সংঘটিত হইয়াছিল।

ভূমির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ্।—ভূমির উর্বরতা এবং খনিজ সম্পদ্ সকল দেশের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতের ভূমির উর্বরতা ও ঐশ্বর্যের কথা বিশ্ববিদিত ছিল। তাই বিশ্বের সকল জাতিই তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিয়াছে। ভূমির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ্ ভারতবাসীকে অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী করিয়াছিল এবং ভারতবাসীকে জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য ও অবকাশ দিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতীয়গণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে অভাবনীয়রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতের আয়তন ও ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব।—ভারতবর্ষের বিপুল আয়তনও ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা পূর্ব হইতে পশ্চিমে ২৫০০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ২০০০ মাইল বিস্তৃত। ইহার আয়তন প্রায় ১,৫৭৫,০০০ বর্গ মাইল। ইহা রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সমান। ইহার আয়তন সমগ্র গ্রেট বৃটেনের বিশ গুণ। তাই ইহাকে যে উপমহাদেশ বলা হয়, তাহা অতিভাষণ নহে। ভারতের এই বিশাল আয়তন ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে যে জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন যুগে মৌর্য সম্রাটগণের সময়ে, মধ্যযুগে খলজি ও মুঘল সম্রাটগণের সময়ে এবং আধুনিক যুগে ইংরেজগণের সময়ে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে ঐক্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল সময়েও ভারতবর্ষের সকল অংশ যে একই রাষ্ট্র-শক্তির অধীন হইয়াছিল, তাহা নহে। মৌর্যদের সময়ে ভারতের দূর দক্ষিণ অঞ্চল, খলজিগণের সময়ে দূর পূর্ব অঞ্চল, মুঘলগণের সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল এবং ইংরেজদের সময়ে ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চলগুলি পৃথক শক্তির শাসনাধীন ছিল।

উপমহাদেশ

এখনও সমগ্র ভারতবর্ষ একই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধীন হইতে পারে নাই। তাহার কতকাংশ পাকিস্থানরূপে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং কতকাংশ পর্তুগীজ শাসনাধীনে রহিয়াছে। ভারতবর্ষের আয়তন সুবিশাল হওয়ায় ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় তাহা অন্যভাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিগুলি সকল সময়েই সমগ্র ভারতবর্ষকেই জয় করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত এবং সেজন্যই সচেষ্ট থাকিত। ফলে ভারতের শ্রেষ্ঠ রণবীরগণ কখনও ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। ভারতবাসীরা যে ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন নাই, তাহার কারণ ভারতীয়গণের কাপুরুষতা বা দুর্বলতা নহে, তাহার কারণ ভারতবর্ষের এই সুবিশালতা।

রাষ্ট্রীয় সমগ্রতা ও ঐক্যের অন্তরায়

স্বয়ম্পূর্ণতা

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ ও ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব।—ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় ইতিহাসের ধারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাগের সংখ্যা কিন্তু সকল ঐতিহাসিক একরূপ দেন নাই। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ অনেক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে প্রধান তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত আর্যাবর্ত; (২) তাপ্তী ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্য; এবং (৩) তুঙ্গভদ্রা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত দূর দক্ষিণ ভারত। অপর পক্ষে, An Advanced History of India গ্রন্থের লেখকগণ ভারতবর্ষকে চারিটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) হিমালয়ের পাদদেশে তরাই হইতে হিমালয়-শিখর পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চল—ইহাতে কাশ্মীর, কাংড়া তেহ্‌রী, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম ও ভুটান অবস্থিত; (২) সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীগুলির দ্বারা বিধৌত সুবিশাল উত্তর ভারত—ইহার মধ্যে সিন্ধু ও রাজপুতানার মরু অঞ্চলও রহিয়াছে; (৩) বিন্ধ্য-পর্বতমালা, সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট) পর্বতমালা ও মহেন্দ্র (পূর্বঘাট) পর্বতমালার

মধ্যে সীমাবদ্ধ দক্ষিণ-মধ্য ভারতের উচ্চ মালভূমি ; (৪) পূর্বঘাট পর্বতমালার পূর্বে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমে এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত উর্বর ভূমি। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কূটনীতিবিদ্ কে. এম. পানিক্কর তাঁহার Geographical Factors in Indian History গ্রন্থে হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগকে প্রধান পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ বিভাগগুলিকে ভারতের ঐতিহাসিক ধারার সহিত সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রদত্ত বিভাগগুলিই নিম্নে প্রদত্ত ও আলোচিত হইল : (১) গঙ্গা নদীর উভয় তীরবর্তী উর্বর সমভূমি—অর্থাৎ পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চল ; (২) বিন্ধ্য পর্বতের দুই-পার্শ্ববর্তী মধ্য ভারতের উচ্চ মালভূমি ; (৩) উত্তরে অজন্তা পাহাড়, দক্ষিণে নীলগিরি, পূর্বে পূর্বঘাট ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বেষ্টিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ; (৪) কাবেরী নদী-বিধৌত দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-উপকূলবর্তী সমভূমি ; এবং (৫) পাঞ্জাবের দক্ষিণ হইতে গুজরাটের সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত মরুময় অঞ্চল।

পাঁচটি বিভাগ

গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলটিই যে ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়াছে, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে কোনও রাজা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কেবল সমগ্র আর্যাবর্তে নহে, দক্ষিণ ভারতেও তাঁহার প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা থাকিত। ভারতীয় ইতিহাসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা দাক্ষিণাত্যের শক্তিশালী রাজগণও বিশ্বাস করিতেন। তাই কি সাতবাহনগণ, কি রাষ্ট্রকূটগণ, কি মারাঠাগণ, সকলেই গঙ্গা-বিধৌত উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বিদেশ হইতে আগত ইংরেজগণও তাহা সহজেই বুঝিয়াছিলেন।

গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল

গঙ্গা-তীরবর্তী উত্তর ভারতের সমভূমির দক্ষিণে গুজরাট হইতে রাজমহল

পর্যন্ত বিস্তৃত যে পার্বত্য ও অরণ্যময় উচ্চ মালভূমি রহিয়াছে, দক্ষিণ ভারতের সহিত উত্তর ভারতের ঐক্যবিধানের পক্ষে তাহাকে অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলা চলে। আশ্রয়স্থল হিসাবে এই অঞ্চলের বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই ভারতের প্রাচীন উপজাতির লোকেরা এই অঞ্চলের অরণ্যে পর্বতে বহুল পরিমাণে আশ্রয় লইয়াছিল। উত্তর ভারত হইতে আগত প্রচণ্ড আক্রমণকে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির পক্ষেও প্রতিহত করা এই অঞ্চলে সহজেই সম্ভব হইত। ফলে উত্তর ভারতের অভিযানগুলি প্রায়ই দক্ষিণে অগ্রসর না হইয়া পশ্চিমে মালব ও গুজরাটের দিকে চালিত হইত।

বিন্ধ্যের পার্শ্ববর্তী উচ্চভূমি

দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতেও বহু শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। অতি সাময়িকভাবে ভিন্ন উত্তর ভারত এই অঞ্চলে কখনো দীর্ঘস্থায়ী প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। মৌর্য যুগে কিছুদিন এই অঞ্চল মগধের অধীন থাকিলেও অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সাতবাহনগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং উত্তর ভারতেও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে অভিযান করিলেও এই অঞ্চল তাঁহার পদানত হয় নাই। গুপ্ত সম্রাটগণ ও বাকাটক রাজগণ যথাক্রমে নিজেদের মধ্যে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন বলা চলে। আলাউদ্দিন খলজি দেবগিরির যাদব ও বরঙ্গলের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ভারতে সাময়িকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিলেও বাহ্‌মনী ও বিজয়নগরের রাজগণের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের এই অঞ্চল আবার আপনার স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল এবং প্রায় আড়াই শত বৎসরের জন্য এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। মুঘল সম্রাট আকবরের নেতৃত্বে উত্তর ভারত দাক্ষিণাত্যকে পদানত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুকালে দাক্ষিণাত্য নামমাত্র দিল্লীর অধীন হইলেও তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ঔরংজেবের মৃত্যুর মাত্র ৩২ বৎসর বাদে দাক্ষিণাত্য পুনরায় উত্তর ভারতের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

কাবেরী-বিধৌত দূর দক্ষিণ অঞ্চলও নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

আসিয়াছিল। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অশোকের সময়েও সুদূর দক্ষিণের চোল, চের ও পাণ্ড্য রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল। এই অঞ্চলে যে সকল শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সেগুলিও উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি দেয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চল সমুদ্রপারে সিংহল, মালয়, সিয়াম, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে নিজ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিত। সমুদ্রপারের ঐ সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যেসব চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই অঞ্চলের পল্লব রাজগণের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ চোল রাজগণও সমুদ্রপারের রাজনীতি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন।

কাবেরী-বিধৌত দূর দক্ষিণ

পাঞ্জাবের দক্ষিণে অবস্থিত সিন্ধু ও রাজপুতানার মরু অঞ্চলটিও প্রায়ই আপনার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইত। উত্তর ভারতের দোর্দণ্ড রাজশক্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয়স্থল হিসাবে এই অঞ্চল প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালে আদিবাসীরা এই অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাজপুতগণ এই অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া বহু ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মাড়োয়ার, বুন্দি, উদয়পুর ইত্যাদি ইতিহাসবিখ্যাত স্থানগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

সিন্ধু ও রাজপুতানার মরু অঞ্চল

ভারতের অধিবাসী।—রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হোলো হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হোলো লীন।"

ভারতকে "মহামানবের সাগর" বলিয়া কবি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একান্তই সত্য। জনসংখ্যার দিক হইতে ভারত যেমন পৃথিবীতে চীনের

পরেই স্থান অধিকার করিয়া আছে, তেমনি পৃথিবীর প্রায় সকল মানব-গোষ্ঠীর লোককেই ভারতের অধিবাসী রূপে লক্ষ্য করা যায়।

কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতেই মানুষ ভারতের মৃত্তিকায় বসবাস শুরু করিয়াছিল। অনেক পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও জীবলোকের উদ্‌বর্তনের ফলে পৃথিবীর যে সকল স্থানে মানুষের জন্ম হইয়াছিল, ভারতবর্ষও তাহার অন্যতম। কিন্তু ঐ আদিম মানুষগণের কোনও নির্ভরযোগ্য কঙ্কাল আজও ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার ঐ সকল মানুষের অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা যাইতে পারে? সেজন্য পুরাতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় লইয়াছেন।

মানবের অন্যতম আদিভূমি

ঐ সকল মানুষ তাহাদের হাতিয়াররূপে গাছের শাখা-প্রশাখা. জীবজন্তুর অস্থি এবং প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করিত। কাষ্ঠ ও অস্থি কালের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কিন্তু প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ারগুলি রক্ষা পাইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথা, পটোয়ার (রাওলপিণ্ডি), জব্বলপুর, হোসাঙ্গাবাদ, চিঙ্গলপেট, কুর্নুল প্রভৃতি স্থানে প্রস্তর-নির্মিত মনুষ্যব্যবহৃত অসংখ্য হাতিয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সময় মানুষ পাথর দিয়াই তাহাদের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিত। তাই পুরাতাত্ত্বিকগণ ঐ সময়কে "প্রস্তর যুগ" (Stone Age) আখ্যা দিয়াছেন। কয়েক লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ ক্রমাগত প্রস্তরের হাতিয়ার ব্যবহার করায় সেগুলির নির্মাণকার্যে ক্রমেই তাহারা দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। ফলে প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলি মসৃণ, সূক্ষ্ম, অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং অন্যান্য দিক হইতেও অনেক উন্নততর হইয়াছিল। পুরাতাত্ত্বিকগণ প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের অপটুতা ও পটুতা লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর যুগকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—পুরাপ্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age) ও নবপ্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। নবপ্রস্তর যুগের তুলনায়

আদিম মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ

প্রস্তর যুগ

পুরাপ্রস্তর যুগের ব্যাপ্তি অনেক বেশী। আধুনিক পুরাতাত্ত্বিকগণ পুরাপ্রস্তর যুগের পরিমাণ আড়াই লক্ষ হইতে চার লক্ষ বৎসর এবং নবপ্রস্তর যুগের পরিমাণ দশ হাজার হইতে পনের হাজার বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
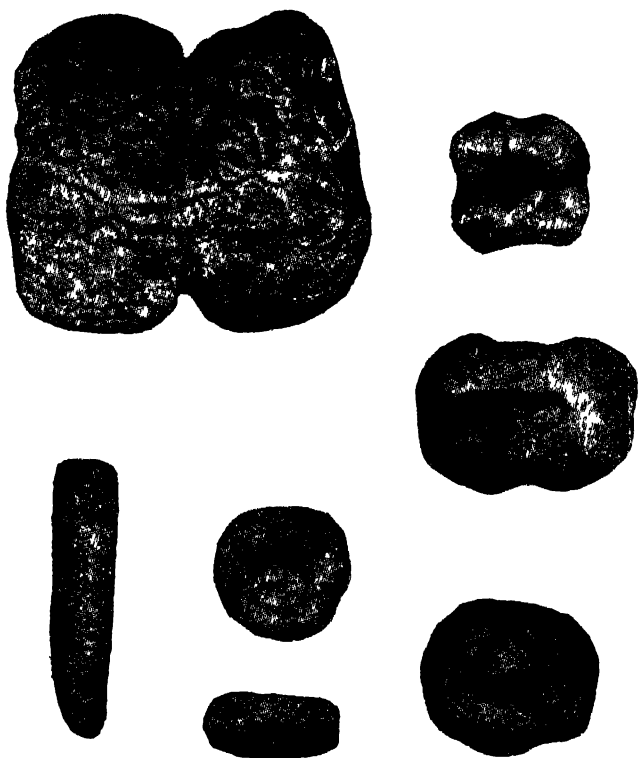
প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি—উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাপ্ত

মানুষ প্রস্তর ব্যবহার করিতে করিতে তাম্রের ব্যবহারও আবিষ্কার করিয়াছিল। মানুষ তাম্রের আবিষ্কার খ্রীষ্টের জন্মের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্বে করিয়াছিল মনে হয়। প্রস্তরের অপেক্ষা তাম্রের ব্যবহারযোগ্যতা অধিক হওয়ায় তাম্র-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে

প্রচলিত হইয়াছিল। এইভাবে প্রস্তর যুগের পরে মানব সভ্যতার ইতিহাসে আসিল "তাম্রযুগ" (Copper Age)। ভারতবর্ষে তাম্র ও টিন প্রায়ই মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যাইত। তাম্র ও টিন মিশ্রিত হইলে ব্রোঞ্জের উৎপত্তি হয়। তাই ভারতে তাম্রের পরিবর্তে

তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ
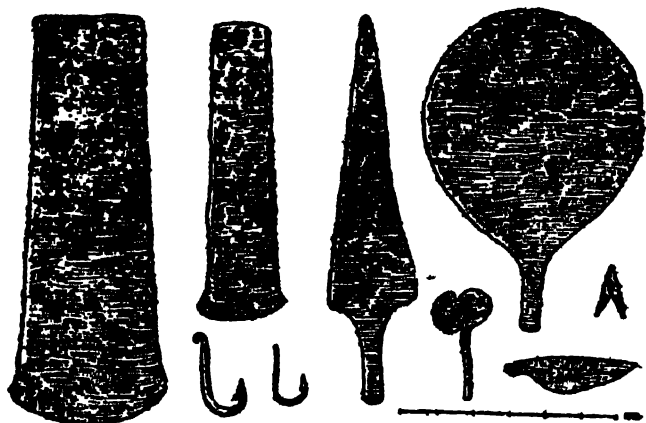
ব্রোঞ্জ যুগের অস্ত্রশস্ত্র

ব্রোঞ্জের ব্যবহারই প্রচলিত হইল। ভারতে সেজন্য তাম্র যুগের স্থলে ব্রোঞ্জ যুগই (Bronze Age) দেখা দিল।

মানুষ অবশেষে আবিষ্কার করিল লৌহ। উপযোগিতাব দিক হইতে লৌহ তাম্রকেও ছাড়াইয়া গেল। তাম্র বা ব্রোঞ্জের পরিবর্তে লৌহের ব্যবহার প্রবর্তিত হইল। এইভাবে আসিল লৌহ যুগ (Iron Age)। পুরাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, এই সকল বিভিন্ন যুগে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আগমন বা অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

লৌহ যুগ

আধুনিক পুরাতাত্ত্বিকগণের মতে, ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যে সকল মানবগোষ্ঠীর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সবগুলিই বাহির হইতে আসিয়াছিল। সুদূর অতীতে পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগেও ভারতে লোক বসবাস করিত। পণ্ডিতরা মনে করেন, পুরাপ্রস্তর যুগে ভারতে নিগ্রোবটু (Negrito)

শ্রেণীর মানুষরা বাস করিত। বর্তমানে এই শ্রেণীর লোককে খাস ভারত-ভূমিতে দেখা যায় না। তবে আন্দামানে ঐ শ্রেণীর লোক আজও কিছু পরিমাণে রহিয়াছে। তাহারা আজও তাহাদের নিজস্ব আদিম ভাষায় কথা বলে। কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর এবং আসাম প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী কোনও কোনও জাতির মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষের জাতিগত চিহ্ন ও প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। উহাদের মধ্যে কাদির, ইরুলা, কুরুম্বা, পনিয়ন্, আঙ্গামী নাগা প্রভৃতি জাতিগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিগ্রোবটু শ্রেণীর লোকদের চেহারা বেঁটে, মাথা ছোট, চিবুক নাই বলিলেও চলে। ঠোঁট উঁচু ও পুরু, নাক থ্যাবড়া, গায়ের রং অত্যন্ত কালো ও মাথার চুল খুব কোঁকড়া। শরীরের তুলনায় হাত লম্বা। ভ্রূ উঁচু নয়, কপালের সঙ্গে সমতল।

নিগ্রোবটু

পুরাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, নবপ্রস্তর যুগে ভারতে অন্য এক মানব-গোষ্ঠীর লোক বসবাস করিতেছিল। ইহাদের সহিত অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের

আদি-অস্ত্রালরূপ শ্রেণীর মানুষের মুখ

অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। তাই পণ্ডিতরা এই শ্রেণীর মানুষদের নাম দিয়াছেন "আদি-অস্ত্রালরূপ" (Proto-Australoid)। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও এই শ্রেণীর মানুষকে দেখা যায়। ইহারা একদা সমস্ত উত্তর ভারতে বাস করিত মনে হয়। ইহাদের বংশধরগণ আজও

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। হো, মুণ্ডা, কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভূমিজ, অসুর, কোরকু, খাড়িয়া, শবর, গড়াবা প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা ইহাদের বংশধর। ইহারা যে সকল বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং সেগুলির সহিত দ্রাবিড় ও আর্য গোষ্ঠীর ভাষার সাদৃশ্য নাই। ইহারাও নিগ্রোবটুদের মতো বেঁটে ও কালো, কিন্তু ইহাদের চুল নিগ্রোবটুদের অপেক্ষা অল্প কুঞ্চিত ও ঢেউ-খেলানো। চুল দেখিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, ইহারা নিগ্রোবটুগণের বংশধর নহে।

আদি-অস্ত্রালরূপ

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে তাম্রযুগে ভারতে অপর এক মানবগোষ্ঠীর অধিবাসীদেরও দেখা যায়। ইহাদের সহিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোনও কোনও মানবগোষ্ঠীর সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। তাই অনেকে মনে করেন,

দ্রাবিড় জাতির স্ত্রী ও পুরুষের মুখ

ইহারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানব-গোষ্ঠীর বংশধর। ইহারা ভারতে দ্রাবিড় নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্‌ ও কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বালুচিস্তানের ব্রাহুই জাতির লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে, তাহার সহিত দ্রাবিড় ভাষাগুলির কিছু

দ্রাবিড়

সাদৃশ্য আছে। তাই অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এই পথেই দ্রাবিড়রা ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই একটি অংশ ঐ অঞ্চলে রহিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে তাম্র (ব্রোঞ্জ) যুগে যে গৌরবময় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরাই তাহার স্রষ্টা ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। শ্যাম হইতে ঈষৎ পিঙ্গল পর্যন্ত সকল প্রকার হালকা রং ইহাদের দেহে দেখা যায়। ইহাদের চক্ষু আয়ত, চক্ষু-তারকার বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইতে কটা পর্যন্ত সকল রকমের হয়। নাক অল্প উঁচু। মুখে ও দেহে লোমের পরিমাণ বেশী। লোমের রং ঘন কালো হইতে কটা পর্যন্ত সকল রকমেরই দেখা যায়।

আয

লৌহযুগে ভারতে অপর এক মানবগোষ্ঠীর লোকদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের শারীরিক গঠন ও ভাষা নিগ্রোবটু, আদি-অস্ত্রালরূপ ও দ্রাবিড় মানবগোষ্ঠীর লোকদের দৈহিক গঠন ও ভাষা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহারা দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি ও উচ্চনাসিকাবিশিষ্ট। ইহারা আর্য (Indo-Aryan) নামে পরিচিত। ইহারা যে ভাষায় কথা বলিতেন, তাহা হইতে পরে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আরও পরে হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী, সিন্ধী, মারাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার জন্ম হইয়াছে। আর্যদের ভাষার সহিত গ্রীক, লাতিন, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাগুলির প্রচুর সাদৃশ্য মেলে। প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষার সঙ্গেও ইহাদের রচিত বেদের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাই পণ্ডিতরা অনুমান করেন, ককেশাস বা মধ্য-এশিয়ার কোনও অঞ্চল হইতে আর্যরা পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একটি শাখা পারস্যের পথে ভারতে আসিয়াছিলেন।

আর্যজাতীয় লোকের মুখের গঠন

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে আরও একটি মানবগোষ্ঠীর লোকের পরিচয় মেলে, তাহাদিগকে তিব্বত-ব্রহ্মীয় (Tibeto-Burman) বা চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) বলা হয়। ইহারা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ, দেহ হ্রস্ব, কিন্তু পেশল, দেহে ও মুখমণ্ডলে লোমের স্বল্পতা; ইহাদের চোখ চাপা ও চেরা এবং নাসিকা অনুন্নত। নেপালী,

মঙ্গোলজাতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মুখ

ভুটিয়া, নাগা, কুকি, আহোম, সান প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তভুক্ত। স্মরণাতীত কাল হইতেই এই জাতীয় লোকেবা উত্তব ও উত্তব-পূর্ব সীমান্ত-পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এই শাখার অন্তর্গত আহোম জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ করে। তাহাদের বাসস্থানই এখন আসাম নামে পবিচিত।

মঙ্গোলীয় জাতি

অন্যান্য সময়েও বাহির হইতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর লোকদের ভারত-আগমন অবিরাম চলিয়াছে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে গ্রীক, শক, ইউ-চি, হুন, পারসিক, আরব, তাতার, আফগান, হাবসী, মুঘল, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং ভারতের মহামানবের সাগরে লীন হইয়াছে।

বলাই বাহুল্য, এই সকল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর লোকে ভারতে আসিলেও আজ খাঁটি নিগ্রোবটু, খাঁটি আদি-অস্ত্রালরূপ, খাঁটি দ্রাবিড, খাঁটি আর্য বা খাঁটি মঙ্গোলীয় বলিয়া কোনও জাতি নাই। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ও মিশ্রণ চলিয়াছে। এই অবিরাম মিলন ও মিশ্রণ এবং আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাবের ফলে ভারতে বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণ এক মহা-জাতিতে পরিণত হইয়াছে। স্যার হার্বার্ট রিসলি, ডাঃ হার্টন, রমাপ্রসাদ চন্দ, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রভৃতি খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতের অধি-বাসিগণকে ছয় হইতে নয় পর্যন্ত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীযগণেব মধ্যে মিলন ও মিশ্রণ এমনভাবে হইযাছে যে, ঐ সকল বিভাগকে সম্পূর্ণ বলিযা গ্রহণ করা যায না। বস্তুত, ঐরূপ বিভাগ অসম্ভব।

বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ

ভারতের বিভিন্ন ভাষা।—বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীব মিলনের ফলে ভারতে কেবল বহু জাতির সৃষ্টি হয় নাই, বহু ভাষা ও উপভাষাবও সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ভারতে ১৪টি প্রধান ভাষা এবং প্রায ২০০টি উপভাষা বহিয়াছে। ভারতে আযগণের আগমনেব পূর্বে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহাদেরও নিজ নিজ পৃথক্ ভাষা ও উপভাষা ছিল। আন্দামানের নিগ্রোবটু শ্রেণীর মানুষরা আজও তাহাদের আদিম ভাষায় কথা বলে। কোল, ভীল প্রভৃতি আদি-অস্ত্রালরূপ গোষ্ঠীর অধিবাসীদের ভাষার নিদর্শন সাঁওতালী, মুণ্ডারী, খাসিয়া, নিকোবারী ভাষার মধ্যে আজও লক্ষ্য করা যায়। এইগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ অষ্ট্রিক (Austric) গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দ্রাবিডগণ যে সকল ভাষা ও উপভাষায কথা বলিতেন, সেগুলির নিদর্শন আজও দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, কানডী, মালয়ালম্ প্রভৃতি ভাষার মধ্যে রহিয়াছে। পরে আর্যগণ ভারতে আসায় আর্যগোষ্ঠীর বৈদিক ভাষা উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। বৈদিক আর্য ভাষা হইতেই পরে

বহু ভাষা

অস্ট্রিক গোষ্ঠীব ভাষা

দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা

সংস্কৃত ভাষা ও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভাষা এবং প্রাকৃত ভাষাগুলি ছিল প্রকৃতিপুঞ্জ বা জনসাধারণের ভাষা। প্রাকৃত ভাষাই পরে কালক্রমে নানা অপভ্রংশ রূপের মধ্য দিয়া উত্তর ভারতের পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, হিন্দী, মারাঠী, বাংলা, উড়িয়া, অহমিয়া (অসমীয়া) প্রভৃতি বহু আধুনিক ভাষার জন্ম দিয়াছে। মুসলমানগণের আক্রমণের ফলে ভারতে আরবিক ও পারসিক ভাষা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। আরবিক ভাষা সেমিটিক গোষ্ঠীর এবং পারসিক ভাষা মূলত আর্য গোষ্ঠীর ভাষা। ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে উদ্ভূত হিন্দী ভাষা আরবিক ও পারসিক ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উর্দু ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। মঙ্গোলীয় শ্রেণীর ভাষা হইতেই গারো, মেইতেই (মণিপুরী), লুসাই প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। তাতার, মঙ্গোল এবং পোর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাগুলিও শব্দসম্ভারে ভারতীয় ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আবার তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলি যেমন আয সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও ভাবসম্ভারে নিজেদের সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলিও দ্রাবিড় প্রভৃতি অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব আহরণ করিয়াছে।

আর্য গোষ্ঠীর ভাষা

সেমিটিক প্রভাব

মঙ্গোলগোষ্ঠীর ভাষা

প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত ও তামিল সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইল বাংলা ভাষা, তাহার পরে যথাক্রমে উর্দু ও হিন্দী ভাষার স্থান।

ধর্ম।—ভারত যেমন বহু ভাষার দেশ, তেমনি বহু ধর্মেরও দেশ। সত্যই ভারতবর্ষের মতো এমন বহু ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায় পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এখন এখানে প্রধানত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্র-প্রবর্তিত পারসিক ধর্ম এবং ঐগুলির বিভিন্ন শাখার মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা বাস করেন। এই সকল বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মশাখা একদিনে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে নাই। ইহার পশ্চাতে নানা ঐতিহাসিক

প্রভাব কাজ করিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতের আদিম অধিবাসিগণ উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, প্রস্তর, ভূতপ্রেত প্রভৃতির পূজা করিতেন।

নানা ধর্মের দেশ

মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতার যুগে যাঁহারা ভারতে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর পূজা প্রচলিত থাকিলেও তাঁহারা যে শিব-দুর্গার মতো কোনও দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ সকল স্থানে খননকার্যের ফলে যে সকল মূর্তি ও সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায়, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন এবং যোগসাধনাও করিতেন।

অনার্যদের ধর্ম

তাঁহাদের পর আর্যগণ যখন ভারতে আসিলেন, তখন তাঁহারা দ্যৌস্ (আকাশ), মিত্র (সূর্য), বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পূজা করিতেন। ভারতের বাহিরে যে সকল আর্য বাস করিতেন, তাঁহাদের ধর্মের সহিত ভারতীয় আর্যগণের ধর্মের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। গ্রীক দেবতা জিউস ও রোমান দেবতা জুপিটর "দ্যৌস্" ও "দ্যৌস্ পিতর্" শব্দের ভাষান্তর মাত্র বলিয়া ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ইরানেব জেন্দাবেস্তার সহিত বেদের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মিথ্রাইটগণও মিত্র বা সূর্যেরই উপাসক ছিলেন। পরে ভারতে আর্যধর্ম ক্রমেই যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইতে থাকে। বর্ণভেদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

প্রাচীন আর্যদের ধর্ম

কিন্তু তৎকালীন প্রগতিশীল আর্যগণ উহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রহ্ম বা নিরাকার একেশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করিতে থাকেন। বৈদিক যুগের শেষের দিকে ভারতে বহু ধর্মমতের প্রচলন হয়। সেগুলির মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মই প্রধান। জৈনগণ পরে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। বৌদ্ধগণের মধ্যেও পরে মহাযান ও হীনযান নামে প্রধান দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম

অন্য পক্ষে, অনার্য ধর্ম ও আর্য ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা চলিতে থাকে। শিব-দুর্গার মতো দেব-দেবীগণ হিন্দুধর্মে প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মেরও

উদ্ভব হয়। চক্রধারী বিষ্ণুকে আর্যদেবতা সূর্যেরই উদ্বর্তিত রূপ বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। দেশে বহু শৈব (শিবের উপাসক) ও শাক্ত (শক্তির উপাসক) সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম

এই সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি একব্রহ্মের উপাসনা ও অদ্বৈতবাদের প্রচারও চলিতে থাকে। অনেকে অদ্বৈতবাদকে যথেষ্ট মনে না করায় অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিবাদের মিশ্রণ ঘটাইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির ফলে সহজযান, বজ্রযান প্রভৃতি নানা ধর্মমতের উদ্ভব হয়। এইভাবে ভারতবর্ষে পাশাপাশি বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও সেগুলির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রচলিত থাকে।

বাহির হইতে মুসলমানগণের আগমনের ফলে ভারতে ইসলামধর্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। ইসলামধর্মের শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ইসলামধর্মের সাধকগণ অন্যান্য ধর্মের সহিত ইসলামের সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় সুফী ধর্মমত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

ইসলাম

হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম পাশাপাশি থাকায়, সেগুলির মধ্যেও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলিতেছিল। এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় নানক, কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানক শিখধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাহা একটি প্রধান ধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

শিখধর্ম

হিন্দুধর্ম ও ইসলামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সত্যপীর, ওলাবিবি প্রভৃতির ন্যায় নূতন দেবদেবীরও কল্পনা ও উদ্ভব চলিতেছিল।

পারস্য মুসলমানগণের অধিকারে গেলে সেখানকার জরথুস্ত্রপন্থী অগ্নি-উপাসকগণ ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বেদের সহিত আবেস্তার সাদৃশ্য থাকায় ভারতবর্ষে তাঁহারা নির্বিবাদে স্থান পাইয়াছিলেন এবং পার্শী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

পারসিক ধর্ম

ইউরোপীয়গণের ভারত-আগমনের ফলে ভারতে খ্রীষ্টধর্মও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টান কিংবদন্তী অনুসারে, যিশু খ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেণ্ট টমাস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আসিয়াছিলেন।

তখন খ্রীষ্টধর্ম ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও পরে খ্রীষ্টান শাসক ও মিশনারিদের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে তাহা ক্রমেই ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এখন রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট উভয় মতাবলম্বী বহু খ্রীষ্টান ভারতের অধিবাসিগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে ভারতে বাস করিতেছেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই সর্বাধিক। তৎপরেই সংখ্যার দিক হইতে মুসলমানগণের স্থান। শিখধর্ম পাঞ্জাবের বাহিরে বিস্তার লাভ না করিলেও শিখগণ বর্তমানে পাঞ্জাববিভাগের ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতে শুরু করিয়াছেন। রাজপুতানা ও গুজরাটে জৈনধর্ম প্রচলিত। কিন্তু ব্যবসায় ও কর্মব্যপদেশে ইহারা ভারতের সর্বত্র কিছু কিছু পরিমাণে ছড়াইয়া আছেন। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে, কাশ্মীরে, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ এবং দক্ষিণ ভারতে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টান বাস করেন। প্রধানত বোম্বাই অঞ্চলেই অগ্নি-উপাসক পার্শীগণের বাস।

কেবল ভাষা ও ধর্মের দিক দিয়া নহে, খাদ্য, বেশভূষা, রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহারের দিক দিয়াও ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

খাদ্য।—খাদ্যের ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, উৎপাদনের সুযোগসুবিধা ও বহিরাগতদের ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয়দের প্রধান খাদ্য গম ও চাউল। উত্তর-পশ্চিম ভারতকে গমের অন্যতম আদিভূমি বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসব চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায়, ভারতীয়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই খাদ্যরূপে গম ব্যবহার করিতেছেন। চাউলও অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে খাদ্যরূপে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইতেছে।

গম ও চাউল

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট (Stuart Piggot) তাঁহার "প্রাগৈতিহাসিক ভারত" (Prehistoric India) গ্রন্থে বলেন, ধানের চাষ অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে শুরু হইয়াছিল এবং সম্ভবত ভারত হইতেই তাহা চীনদেশে বিস্তারলাভ

করিয়াছিল। গম ও চাউল ছাড়া জোয়ার, যব, ভুট্টা প্রভৃতিও ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শাকসবজি, ফল-মূল, দাল, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, দধি প্রভৃতি ভারতবাসিগণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। সুপ্রাচীনকালেও ভারত-বাসিগণ মৎস্য ও মাংস আহার করিতেন। আর্যগণ প্রথম যুগে মাংসাহারী থাকিলেও পরে ক্রমেই মাংসাহারের বিরোধিতা করিতে থাকেন। ফা-হিয়েন ভারত-ভ্রমণে আসিয়া মধ্য দেশে চণ্ডাল ব্যতীত সকলকেই নিরামিষাশী দেখিয়াছিলেন। জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এজন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। এখনও জৈনগণ এবং হিন্দুদের একটি প্রধান অংশ মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না। তবে মুস্‌লিম ও ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মাছ-মাংস সম্পর্কে নিষেধ ও রক্ষণশীলতা ভারতবর্ষে অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষ সমুদ্রবেষ্টিত এবং নদীবহুল হওয়ায় মৎস্য ভারতীয়গণের খাদ্যতালিকায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। তাই নারিকেলও ভারতীয়গণের খাদ্য হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতে ইক্ষুর চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়ায় গুড় ও শর্করা ভারতীয়গণ সুপ্রাচীনকাল হইতে ব্যবহার করিতেছেন। প্রাচীনকাল হইতেই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ইক্ষু ও গুড় উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পূর্বে মধুর ব্যবহারও প্রচুর পরিমাণে হইত।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

মাংস ও মৎস্য

প্রাচীন ভারতীয়গণ সোমরস পান করিতেন। তাহা কি, আজও নির্ধারিত না হইলেও প্রাচীনকালে যে সুরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে সুরাপান নিন্দনীয় বলিয়াই গণ্য হয়। তাহা হইলেও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ইহার চলন এখনও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। তবে ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় উহা নগণ্যই। চা এখন ভারতের অন্যতম সুপ্রচলিত পানীয়। চায়ের চাষ ভারতের একটি প্রধান কৃষিশিল্পে পরিণত হইয়াছে।

পানীয়

বেশভূষা।—মানুষের ভৌগোলিক পরিবেশ বেশভূষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশ। ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, প্রাকৃতিক সম্পদ্ প্রভৃতির মধ্যে ঘোরতর পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র শত শত মাইল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, কোথাও বা বিশুষ্ক মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও অসহ্য গ্রীষ্মে মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে; আবার কোথাও মানুষ তুষারপাতের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে। কোথাও বা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক বারিপাত ঘটিতেছে, কোথাও মানুষ একবিন্দু বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে চাতকের মতো চাহিয়া আছে। জলবায়ুর এই পার্থক্য ভারতবাসীর বেশভূষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মরু ও হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশভূষার আপেক্ষিক আধিক্য এবং বঙ্গদেশ, বিহার ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসিগণের বেশভূষার আপেক্ষিক অল্পতা লক্ষণীয়।

পরিবেশের প্রভাব

বহিরাগত জাতিগুলি যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বেশভূষার বৈশিষ্ট্য লইয়াই আসিয়াছিলেন। ভারতের জলবায়ু ও পরিবেশ সেগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করিলেও প্রাচীন সাজসজ্জাব পদ্ধতি বহুল পরিমাণে থাকিয়া গিয়াছিল। চীনা পর্যটক ইউয়ান চোয়াং যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি নাকি ভারতীয়গণকে সেলাই-করা কাপড় পরিতে দেখেন নাই। পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি হইতেও জানা যায়, ঐ সময় সেলাই-করা পোশাকের চল ছিল না। এখনও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ অনেকেই সেলাই-করা পোশাক পরেন না। সেলাই-করা পোশাকের চল মুসলমান আমলেই এদেশে ব্যাপক হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৈদেশিক শাসকগণের পোশাক-পরিচ্ছদও নানাকালে নানাভাবে ভারতবাসীদের বেশভূষাকে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদের উপর বহিরাগত মুসলমান ও ইউরোপীয়গণের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই

বেশভূষার বিভিন্নতার অন্যান্য কারণ

সকল বিভিন্ন কারণে ভারতীয়গণের বেশভূষায় যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, সেরূপ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। পশম, রেশম, পাট, কার্পাস ইত্যাদির উৎপাদনও বেশভূষাকে কিছু পরিমাণে যে প্রভাবিত করে নাই, এমন নহে। তাই বলা চলে, জলবায়ু, উৎপাদনের সুযোগসুবিধা ও বহিরাগত বিভিন্ন জাতির পোশাক-পরিচ্ছদের প্রভাবের তারতম্যের ফলেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বেশভূষা প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচীন বেশভূষা

প্রাচীনকালে ভারতীয় পুরুষগণ সাধারণত অধোবাস, উত্তরীয়, পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকেরা অধোবাস, উত্তরীয় ও কাঁচলি (বক্ষাবরণ) ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকেরা যে সকল সময়ে বক্ষোবাস ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে। প্রাচীনকালের ভাস্কর্য ও মূর্তিশিল্প তাহার প্রচুর প্রমাণ বহন করিতেছে।

আধুনিক বেশভূষা

বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় পুরুষগণ ধুতি ও পায়জামা, অন্তর্বাস, কামিজ, কোট, পাগড়ি ও টুপি ব্যবহার করেন। স্ত্রীলোকেরা শাড়ি, পায়জামা, সায়া-সেমিজ জাতীয় অন্তর্বাস, বডিস, ব্লাউস ও আঙিয়া জাতীয় অঙ্গাবরণ, কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধুতি ও শাড়ি পরিবার রীতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

অলংকার ভারতীয়দের বেশভূষার একটি প্রধান অঙ্গ। ভারতবাসিগণ যে সুপ্রাচীন কাল হইতে অলংকারপ্রিয় ছিলেন, মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত অলংকারগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রাচীনকালে পুরুষগণও অলংকার ব্যবহার করিতেন। কণ্ঠ, কর্ণ ও বাহুর বহুবিধ অলংকার পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও কোনও কোনও শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে কণ্ঠভূষণ, কর্ণভূষণ ও বাহুর অলংকার ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তবে ইহা ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

অলংকারপ্রিয়তা

সুপ্রাচীন কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্যন্ত ভারতীয় রমণীগণের মধ্যে অলংকারপ্রিয়তা অত্যধিক পরিমাণেই লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ইহার পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইলেও অলংকারপ্রিয়তা ভারতীয় রমণীগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ

ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণের সাজসজ্জায় পুষ্পপ্রিয়তাও পরিলক্ষিত হয়।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয়গণ প্রসাধন করিতেন। হরপ্পা-মহেন্‌জো-দড়ো অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জনির্মিত দর্পণ তাহার প্রমাণ। প্রসাধনের জন্য প্রাচীন ভারতীয় স্ত্রীলোকগণ লোধ্ররেণুর পাউডার ব্যবহার করিতেন, পায়ে লাক্ষারস (আলতা) পরিতেন, দেহে চন্দন ইত্যাদির দ্বারা পত্ররচনা করিতেন। বর্তমানকালে ভারতীয় রমণীদেব মধ্যে কাজল, আলতা ও সিঁদুরের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কোনও কোনও অঞ্চলের ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা সুর্মা এবং মেহেদী রং ব্যবহার করেন। ভারতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে উল্‌কির ব্যবহাবও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

প্রসাধন

রীতিনীতি।—খাদ্য, বেশভূষা, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির মতোই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারেও বিশেষ তারতম্য রহিয়াছে। স্থানীয় পবিপার্শ্ব ও বহিরাগতদের প্রভাবই যে এই সকল রীতিনীতি ও আচাব-ব্যবহারগুলিব বিভিন্নতার জন্য প্রধানত দায়ী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে ধর্ম যথেষ্টরূপে প্রভাবিত করিলেও একই ধর্মের লোকের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার দেখা যায়। রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি প্রধান সামাজিক ক্রিয়াতেই অতি সহজেই চোখে পড়ে। হিন্দুগণের কথাই ধরা যাক। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুগণের মধ্যে বৈবাহিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন রীতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শবসৎকারের ব্যাপারেও হিন্দুগণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুগণ প্রধানত শবদাহ করিলেও, কোনও কোনও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শব সমাহিত করিবার রীতিও প্রচলিত আছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা শব সমাহিত করেন। পার্শীরা শবদাহ বা শব সমাহিত না করিয়া নির্দিষ্ট গৃহের ছাদে মৃতদেহ রাখিয়া দেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। উপরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হইল।

সমন্বয়সাধনের চেষ্টা।—ধর্ম, খাদ্য, বেশভূষা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সকল কিছুর মধ্যে ভারতের এই উপমহাদেশে যথেষ্ট ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকিলেও ক্রমাগতই সেগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করিতেছে। তাই এই বিভিন্নতা বিরোধে পরিণত না হইয়া বৈচিত্র্যেই পরিণত হইয়াছে। এইরূপে ভারতে বিবিধের মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলিতে এই বৈচিত্র্যময় ঐক্যকেই বুঝায়।

ভারতের বৈচিত্র্যময় ঐক্য।—পূর্বে ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও রীতিনীতিগত যে সকল পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্বতঃই এই ধারণা হইতে পারে যে, ভারতের জাতীয় ঐক্য কোনও কালে ছিল না বা ভারতীয় ঐক্য অসম্ভব। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবাস্তব। ভারত চিরদিন ঐক্যের সন্ধান করিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রেও আসমুদ্রহিমাচল ভারতের অধিবাসীদের সকলকে "ভারতী সন্ততি" বা ভরতের বংশধর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি পূর্ব, কি পশ্চিম, কি উত্তর, কি দক্ষিণ, ভারতের সকল অঞ্চলের লোকই চিরদিন নিজেদের ভারতীয় বলিয়াই পরিচয় দিয়াছে। ভারতবর্ষ একটি সুবিশাল দেশ। ইহার জনসংখ্যা পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। এই অসংখ্য-অধিবাসী-অধ্যুষিত সুবিশাল ভারতভূমিতে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষা পাশাপাশি রহিয়াছে। কিন্তু তাহা ভারতবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ সমগ্রতার বিরোধী হইয়া কখনও দেখা দেয় নাই। উত্তরে হিমালয় ও অপর তিনদিকে সমুদ্রের দ্বারা ভারতবর্ষ এশিয়ার অন্যান্য অংশ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় ভারতের একতার, সমগ্রতার ও অখণ্ডতার এই ধারণা ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

এক ভারতের ধারণা

অনাদিকাল হইতে দ্রাবিড়, আর্য, গ্রীক, শক, কুষাণ, হুন, আরব, তাতার, মঙ্গোল প্রভৃতি জাতির লোকেরা ভারতে আসিয়াছে। তাহারা ভারতে আসিয়া ভারতের মহামানবের সাগরে লীন হইয়াছে। তাহাদের স্বকীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এক অপরূপ সমৃদ্ধিময় রূপ লাভ করিয়াছে।

বহুর মিলনে বৈচিত্র্য

প্রাচীন আর্যগণের মনে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের যে ধারণা ছিল, তাহা রামায়ণের কাহিনী হইতেই বোঝা যায়। মৌর্য, মুসলমান ও বৃটিশ আমলে ভারত বার বার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে এবং ভারতের এই ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড রূপই ভারতের আদর্শরূপে চিরদিন দেখা দিয়াছে। ইংরেজ আমলে ভারতীয়গণের মধ্যে এই ঐক্যবোধ ও একজাতীয়তার ধারণা পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। ফলে ভারতে এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা-স্পৃহার জন্ম হইয়াছিল। তাহা দমন বা বিনষ্ট করিবার জন্য ইংরেজগণ ভারতবাসীর মনে বিভেদের ধারণা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের চক্রান্তেই যে ধর্মীয় বিরোধ ও প্রাদেশিকতা ভারতবাসীর ঐক্যের আদর্শকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশের এই ভেদনীতির ফলেই ভারত আজ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে—পরিণত হইয়াছে ভারত ও পাকিস্থানে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতের ঐক্য, সমগ্রতা ও অখণ্ডতার ধারণা যে ভারতবাসীর মন হইতে লুপ্ত হইয়াছে, একথা বলা যায় না।

রাজনৈতিক ঐক্য

ভারত প্রাচীন কালে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য কখনও লাভ করিতে না পারিলেও চিরদিন সাংস্কৃতিক ঐক্যলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় সাত-বাহন ও পল্লব রাজগণ উত্তর ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও আর্য সংস্কৃতির উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। উত্তর ভারত শংকরাচার্য ও রামানুজকে তাহার ধর্মগুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। বিদেশাগত জাতিগুলিও তাহাদের নিজস্ব যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া আসিয়াছিল, তাহা সহজেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ধর্মের দিক হইতেও ভারতবর্ষ পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা দেখাইয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পাশে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসলাম, পারসিক ও খ্রীষ্টান ধর্ম বর্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মে আবার শাখা-প্রশাখা, সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়েরও অভাব নাই। তথাপি এইগুলি ভারতীয় ঐক্যের পথে কখনও অন্তরায় হয় নাই। অশোক বৌদ্ধ হইয়াও

সাংস্কৃতিক ঐক্য

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। গুপ্তরাজগণ হিন্দু হইয়াও বৌদ্ধগণের প্রতি অবিচার করেন নাই। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ হইয়াও সূর্যের উপাসনা করিতেন। আকবর মুসলমান হইয়াও অন্যান্য ধর্মের প্রতি উদারতা দেখাইয়াছিলেন। শিবাজী হিন্দু হইয়াও মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। বাংলার মুসলমান সুলতানরা মহাভারত ও ভাগবত রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া হিন্দু প্রজাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া অশোক ও আকবরের এই সুমহান্ ঐক্যের আদর্শকেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভৌগোলিক ঐক্য

পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি ও অসংখ্য নদ-নদী ভারতের ঐক্যবিধানের পথে কিছুটা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়তো করিয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজ তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। রেলপথ, বিমান ও দ্রুতগামী বাষ্পীয়পোত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ এক সুমহান্ রাষ্ট্রে পরিণত কবিবার কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. "Geography is the basis of history."—Discuss with suitable illustrations from Greek, English and Indian history.

"ভূগোলই ইতিহাসের ভিত্তিভূমি।"—গ্রীক, ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহ এই উক্তি আলোচনা কর।

2. Estimate the influence of the physical features of India on Indian history.

ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভারতীয় ইতিহাসকে কি ভাবে প্রভাবিত করিযাছে লিখ।

3. Show how man and his environment determine the history of a people.

মানুষ ও তাহার পরিবেশ কোনও জাতির ইতিহাসের নিয়ন্তা, ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাও।

4. The unity of India lies in her diversity.—Discuss.

ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাহার ঐক্য নিহিত আছে।—আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

Syllabus : Sources of Indian History—Varied sources of history—the romance of archaeology—stories of several momentous excavations, *e. g.*, Mahenjodaro, Sanchi, Nalanda. Inscriptions—their deciphering, *e. g.*, Prinsep and Asokan Inscriptions. Coins as a source—importance of numismatic evidence—significant illustrations from Indian History. Ancient monuments—their importance in the study of Indian History. Character of literary evidence in the ancient, mediaeval and modern periods (suitable illustrations to be given).

পাঠসূচী : ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান—প্রত্নতত্ত্বের মনোরম কাহিনী—কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ খননকার্যের বিবরণ—যথা, মহেন-জো-দড়ো, সাঁচী, নালন্দা। উৎকীর্ণ লিপি—সেগুলির পাঠোদ্ধার, জেম্‌স্ প্রিন্সেপ্ ও অশোকলিপির পাঠোদ্ধার। ইতিহাসের অন্যতম উপাদান মুদ্রা—ঐতিহাসিকতার প্রমাণে মুদ্রার গুরুত্ব—ভারতীয় ইতিহাস হইতে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। প্রাচীন স্মারককীর্তি— ভারতীয় ইতিহাস আলোচনায় তাহার গুরুত্ব। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কালের ইতিহাসে লিখিত প্রমাণের স্থান (উপযুক্ত দৃষ্টান্ত)।

ধারাবাহিক কালক্রমিক ঘটনাপঞ্জীকেই সাধারণত ইতিহাস বলা হইয়া থাকে। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে হেরোডোটাস, থুকিদিদিস, জেনোফোন প্রভৃতি গ্রীক মনীষিগণ এইরূপ ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন : তৎকালীন ভারতীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক হইতে গ্রীকগণের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা ঐরূপ কোনও কালক্রমিক ঘটনাপঞ্জী বা ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিককে নানাভাবে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের লিখিত উপাদান।—প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাস রচনা না করিলেও ধর্ম, সমাজনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানের

অফুরন্ত ভাণ্ডার হইয়া আছে। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ করিতে হয়। তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মশাস্ত্রগুলি হইতে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়াছে। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি হইতেও প্রাচীন কালের বহু ঘটনা, বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম, তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। পুরাণের শেষাংশে পুরাণকারগণ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে কতিপয় রাজবংশের তালিকা দিয়াছেন। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী নয়, অতীত রাজবংশগুলির তালিকা। এই তালিকায় গুপ্তরাজগণের বংশাবলী পর্যন্ত রহিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রাচীন পুস্তকগুলি হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কালিদাস প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনা হইতেও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবন লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি হইতে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ঐতিহাসিকগণ সহজেই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন। ঐ ধরনের রচনাগুলির মধ্যে সংস্কৃতে রচিত বাণের "হর্ষচরিত", বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস", বিহ্লণের "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাক্‌পতির "গৌড়বহো" (গৌড়বধ) ও হেমচন্দ্রের "কুমারকল্পচরিত" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজনীতি সম্পর্কে রচিত পুস্তকগুলি ইতিহাস-রচনায় খুবই সাহায্য করিয়াছে। প্রাচীন রাজাদের বংশাবলীও কিছু পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান রহিয়াছে। বংশাবলীগুলির মধ্যে কহ্লণের "রাজতরঙ্গিণী"-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশীয় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি

গ্রীক, রোমক, চীনা, তিব্বতীয় ও মুসলিম লেখক ও পর্যটকগণের রচনা হইতেও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা হইতে পারস্য কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকারের কথা জানা যায়। গ্রীকগণের ভারত আক্রমণের বিবরণ ও তৎকালীন ভারত

সম্পর্কে নানা তথ্য আমরা গ্রীক ও রোমক লেখকগণের রচনা হইতে পাই। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমলের অনেক কথা জানিতে পারা গিয়াছে। এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক-রচিত Periplus of the Erythrean Sea নামক পুস্তক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়াছে। টোলেমি-রচিত ভৌগোলিক বিবরণও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। মৌর্যোত্তর ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য চীনদেশের ইতিহাস ও চীনা পর্যটকদের বিবরণ অপরিহার্য। চীনদেশের ইতিহাস না জানিলে শক, পহ্লব, কুষাণ ও হূন প্রভৃতি জাতির গতিবিধি ও পরিচয় সম্যক্‌রূপে জানা সম্ভব নহে। গুপ্তযুগের ভারতের বহু তথ্য আমরা ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে এবং হর্ষবর্ধনের আমলের ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ হইতে পাই। চীন ও তিব্বত হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি ভিন্ন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নির্ভুলভাবে রচনা করা সম্ভব নহে। হিন্দু যুগের শেষদিকের ইতিহাস ঠিক-মতো জানিতে হইলে আল্ বিরুনি, আল্ মাসুদি, সুলেমান প্রভৃতি মুসলিম লেখক ও পর্যটকগণের সাহায্য লইতে হয়।

বৈদেশিক বিবরণ

কিন্তু কেবলমাত্র লিখিত উপাদানই ইতিহাস রচনার পক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রথমত, ঐগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাল্পনিক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন লেখকগণ প্রায়ই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতেন। তাই তাঁহাদের রচনায় অনেক সময় ভুল তথ্য স্থান পাইত। তৃতীয়ত, লেখকগণ নিজ নিজ সমাজ, ধর্ম ও পৃষ্ঠপোষকের সমর্থনে এমন সব বিবরণ ও কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, যাহাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। চতুর্থত, বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা অনেকেই ভারতীয়-গণের ভাষা ও সমাজ-সংস্কৃতি ভালো করিয়া না জানায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু ভ্রমাত্মক তথ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। ঐতিহাসিকের গুরু দায়িত্ব হইল এই সকল বিষয় যাচাই করিয়া দেখা ও এইগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করা। প্রায়ই দেখা যায়, একই বিষয়ে প্রাচীন কালের বিভিন্ন রচনায় বিভিন্নরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

লিখিত বিবরণের দুর্বলতা

সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য নহে, কিম্বা কোনটিই গ্রহণীয় নহে, বা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব, এইসব নির্ধারণ করা ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। প্রাচীনকালের লিখিত তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই লিপি, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেন। তাই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্ব।—কেবল লিখিত তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়েই যে প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য অপরিহার্য, তাহা নহে। কয়েক লক্ষ বৎসর ধরিয়া ভারতে মানুষ বাস করিতেছে। কিন্তু বৈদিক যুগের পূর্বেকার ভারতীয় ইতিহাস কোনও লিখিত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ যে বেদ, তাহার রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দুই বা দেড় হাজার বছরের বেশী নহে। তাই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারের জন্য কেবল প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায় না। ভারতীয় ইতিহাস রচনার উপাদানের এই গুরুত্বপূর্ণ অভাব প্রত্নতাত্ত্বিকদের অবিরাম চেষ্টায় এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে খননকার্যের ফলে কিছুটা মোচন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খনন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানের ফলে ভারতের পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগের বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূতাত্ত্বিক ব্রুস ফুট মাদ্রাজের নিকটবর্তী অঞ্চলে পুরাপ্রস্তর যুগের কিছু হাতিয়ার আবিষ্কার করেন। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় কাহিনী রচনার সূত্রপাত ঘটে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় আবিষ্কার সম্ভবত ঘটিয়াছে সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে—মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায়। এই আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয়গণ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও সুসভ্য ছিলেন, তাঁহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাচীন মিশর, সুমের ও চীনদেশের সভ্যতার সমকক্ষ ছিল। এখানে অসংখ্য লিপি পাওয়া গিয়াছে। মিশর ও সুমের অঞ্চলে প্রাপ্ত সুপ্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার হইতে সেই সকল অঞ্চলের বহু

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

অজ্ঞাত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইলে যে ভারতের এক অবলুপ্ত যুগের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ল্যাংডন, হাণ্টার, গ্যাড, হেরাস, হ্রজ্‌নি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, অন্যান্য অনেকেও করিতেছেন।

প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারগুলি সত্যই রোমাঞ্চকর। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কার গল্পের মতোই শোনায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন ব্রাণ্টন ও উইলিয়াম ব্রাণ্টন নামে দুই ভাই ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ স্থাপনের কাজে ইঞ্জিনিয়াররূপে নিযুক্ত ছিলেন। জন দক্ষিণ দিকে ও উইলিয়াম উত্তর দিকে রেলপথ নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জন তাঁহার পৌত্রপৌত্রীদের জন্য পরে যে স্মৃতিকথা লেখেন, তাহাতে তিনি লেখেন, তিনি যেখানে রেলপথ নির্মাণ করিতেছিলেন, তাহার কাছেই অতি প্রাচীন কালে একটি শহর অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছেন এবং ঐ শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই বহু ইট-পাথর তিনি রেলপথ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। উইলিয়ামও উত্তর অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের জন্য অনুরূপ একটি প্রাচীন অবলুপ্ত শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইট-পাথর রেলপথ নির্মাণের কাজে লাগান। জন

প্রত্নতত্ত্বের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী

ব্রাণ্টন খুব ভালো বন্দুক ছুঁড়িতে পারিতেন। তাঁহার শিক্ষায় একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনী গুলী ছোঁড়ায় অত্যন্ত নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিযোগিতায় ঐ স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনীর হাতে সরকারী লাইন রেজিমেণ্ট প্রায়ই পরজিত হইত। তখন যিনি লাইন রেজিমেণ্টের সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নাম কানিংহাম। এই কানিংহাম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্য-বাহিনী হইতে অবসর লইয়া উত্তর ভারতের সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল বা পরিচালক নিযুক্ত হন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে জেনারেল কানিংহাম অমর হইয়া আছেন। উইলিয়াম ব্রাণ্টন যখন একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষকে রেলপথ নির্মাণের ইট-পাথর হিসাবে ব্যবহার করিতেছিলেন, কানিংহাম তখন সেখানে যান এবং সেখানে মজুরদের নিকট হইতে সীলমোহর প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে লাগিতে পারে এমন

বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনেন। কিন্তু তখনও জন ব্রাণ্টন, উইলিয়াম ব্রাণ্টন, এমন কি জেনারেল কানিংহাম পর্যন্ত কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার একটি মহান্ অবলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লইয়া খেলা করিতেছেন। ইহার পরে অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর স্যার জন মার্শাল সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে ভারতীয় কৃতী প্রত্নতাত্ত্বিকরাও কাজ করিতে থাকেন। ঐ সময় বৌদ্ধ স্তূপগুলির খননকার্য চালাইয়া তাহা হইতে প্রাচীন বৌদ্ধ ভারতের তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছিল। এই সন্ধানকার্যের অঙ্গরূপে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মহেন-জো-দড়োর উঁচু ঢিপি খনন করিতে শুরু করেন। বৌদ্ধস্তূপের পরিবর্তে ভূগর্ভ হইতে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন এক সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে। দুই বৎসর পূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহানীর পরিচালনায় হরপ্পায় খননকার্য শুরু হইয়াছিল। সেখানেও এক সুপ্রাচীন শহর আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাসের অজ্ঞাত এক অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়।

সাঁচী, নালন্দা, তক্ষশিলা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হইয়াছে, সেগুলিও এমনি রোমাঞ্চকর। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ খননকার্য চালানো হইয়াছে এবং প্রাচীন ভারতের বিস্মৃত ইতিহাস ক্রমেই উদ্ঘাটিত হইতেছে।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের" প্রতিষ্ঠাকেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সূচনা মনে করা যাইতে পারে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স্ কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইয়া আসেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন এবং "এশিয়ার ইতিহাস, পুরাবস্তু, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য" সম্পর্কে সন্ধান ও গবেষণার জন্য কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। জেনারেল কানিংহাম, স্যার জন মার্শাল, স্যার অরল স্টেইন, ডক্টর মর্টিমার হুইলার প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সূত্রপাত

আত্মনিয়োগ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ভারতীয় কৃতী প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী, এন. জি. মজুমদার, কে. এন. দীক্ষিত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন লিপি।—প্রাচীন ইতিহাস রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ হইল লিপি। এগুলি প্রায়ই স্বর্ণফলকে, রৌপ্যফলকে, তাম্রফলকে, মৃৎফলকে, স্তম্ভগাত্রে বা পর্বতগাত্রে লিখিত হইয়াছিল। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল অনুশাসন (উপদেশ ও সরকারী নির্দেশ), প্রশস্তি, দানপত্র, ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। ফলে এগুলি হইতে কেবল রাজারাজড়ার নাম ও পরিচয় নহে, সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা গিয়াছে। গুপ্ত যুগের পূর্বে রচিত প্রায় দেড় হাজার লিপি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হস্তগত হইয়াছে। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিগুলি হইতে অশোকের কালের বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এলাহাবাদের স্তম্ভে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ-রচিত প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। এমন আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

লিপি

প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের মতো এইসব লিপির পাঠোদ্ধারও অতিশয় রোমাঞ্চকর। বলাই বাহুল্য, এখনকার প্রচলিত ভারতীয় অক্ষরমালার সহিত এই সকল প্রাচীন অক্ষরমালার সম্পর্ক থাকিলেও, সাদৃশ্য নাই। তাই এইগুলি পাঠ করা আধুনিক কেন, মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তুঘলক-বংশীয় সম্রাট ফিরোজ শাহ্ চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি অশোক স্তম্ভের লিপির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতগণকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) অশোক লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জেম্‌স্ প্রিন্সেপ্ নামে জনৈক ইংরেজ ভারতবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রিন্সেপ্ ঐ সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপিগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি এই অজ্ঞাত লিপিগুলির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া

পাঠোদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টায় সাত বৎসর কাটাইয়া দেন। অবশেষে তিনি সাঁচীতে প্রাপ্ত কতকগুলি লিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং সেই লিপির সাহায্যে দিল্লী ও এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভগুলির পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই কঠোর সাধনা সার্থক হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অশোক কর্তৃক ব্যবহৃত ব্রাহ্মীলিপি পাঠের রীতি আবিষ্কার করেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধারেও সমর্থ হন। পরে প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের কাজে অন্যান্য কৃতী প্রত্নতাত্ত্বিকরা

অশোকলিপির পাঠোদ্ধার ও জেম্‌স্ প্রিন্সেপ্

𑀅 𑀆 𑀇 𑀉 𑀏 𑀑 𑀓 𑀔 𑀕 𑀖 𑀘 𑀙 𑀚 𑀛 𑀜

অ আ ই উ এ ও ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ

𑀝 𑀞 𑀟 𑀠 𑀡 𑀢 𑀣 𑀤 𑀥 𑀦 𑀧 𑀨 𑀩 𑀪 𑀫

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

প্রিন্সেপ্-পঠিত অশোক-লিপি—ব্রাহ্মী-লিপি ও তাহার বাংলা প্রতিরূপের কিছু নমুনা দেখ।

অগ্রসর হন এবং ভারতীয় ইতিহাসেব বহু অজ্ঞাত অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করেন। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহরে লিখিত লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নাই। এগুলি সম্ভব হইলে ভারতীয় ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় যে উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মুদ্রা।—প্রাচীন লিপির মতোই প্রাচীন মুদ্রাগুলিও অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করিয়াছে। মুদ্রাগুলি মূল্যবান্ ধাতুতে নির্মিত হওয়ায় লোকে সেগুলিকে প্রায়ই গালাইয়া ফেলিত। তথাপি হাজার হাজার প্রাচীন মুদ্রা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের হস্তগত হইয়াছে। মুদ্রাগুলি হইতে প্রায়ই রাজার নাম ও তাঁহার রাজত্বকাল জানা যায়। মুদ্রায় অঙ্কিত

মূর্তিগুলি দেখিয়া রাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মও অনেক সময় অনুমান করা চলে। অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সত্যতাও মুদ্রার দ্বারা যাচাই করিয়া লওয়া যায়। কোনও রাজার মুদ্রা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেলে তাহা হইতে ঐ রাজার রাজ্যসীমাও অনেকখানি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কোনও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেলে সেই বিদেশের সহিত যে একদা বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, তাহা বোঝা যায়। মুদ্রার সাদৃশ্য দেখিয়া বিভিন্ন দেশের বা রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য ছিল, এমনও অনুমান করা চলে। কুষাণ রাজগণের মুদ্রার সহিত তৎকালীন রোমক মুদ্রার সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝা যায়, ঐ সময় ভারতীয় কুষাণ রাজগণের সহিত রোম রাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য ছিল। প্রায় কেবলমাত্র মুদ্রার সাহায্যেই ভারতীয় শক ও বাহ্লীক রাজগণের অজ্ঞাত ইতিহাস নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। বাহ্লীক গ্রীক সম্পর্কে প্রাচীন শাস্ত্রে সামান্যমাত্র উল্লেখ আছে। তাহা হইতে মাত্র চার-পাঁচজন রাজার নাম জানা যায়। কিন্তু বাহ্লীক গ্রীকগণের বিভিন্ন মুদ্রা হইতে প্রায় ত্রিশজন রাজা ও রানীর নাম জানা গিয়াছে। বাহ্লীক গ্রীকগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে প্রায় দুই শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই মুদ্রাগুলি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় শকরাজ বা ক্ষত্রপগণ যে সকল মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেগুলিতে কেবল রাজা ও তাঁহার পিতা বা পূর্বপুরুষের নাম উল্লিখিত থাকিত না, মুদ্রাপ্রচলনকালীন শকাব্দেরও উল্লেখ থাকিত। তাহা হইতে ঐ সকল রাজার শাসনকালও জানা গিয়াছে।

মুদ্রার গুরুত্ব

প্রাচীন কালের স্মারককীর্তি।—প্রাচীন মন্দির, চৈত্য, স্তূপ, প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ বা ঐসবের ভগ্নাবশেষ হইতেও অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা গিয়াছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড লিটন ভারতীয় প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ আইন (Indian Treasure Trove Act) পাস করিয়া ভারতের প্রাচীন কীর্তিগুলিকে সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। পরে বড় লাট লর্ড কার্জনের উৎসাহে এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় কীর্তিগুলির সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয়।

ফলে, সাঁচী, সারনাথ, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, রাজগির, পুরুষপুর (পেশোয়ার), নালন্দা, পাটলিপুত্র, ইলোরা, অজন্তা প্রভৃতি স্থানের গৌরবময় স্মৃতিগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং ভারতের সুমহান্ অতীতের জলন্ত সাক্ষ্য রূপে রহিয়াছে।

মুসলমান আমলের উপাদান।—কিন্তু মুসলমানগণের আগমনের পর হইতে ভারতীয় ইতিহাস ক্রমেই স্পষ্টতর হইতে থাকে। সমসাময়িক বা অর্ধ-সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সহজেই সংগ্রহ করা যায়। মিন্‌হাজ-উদ্-দিনের "তবকাত-ই-নাসিরী", জিয়া-উদ্-দিন বরনির "তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী," আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" ও "আকবরনামা" প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "বাদশাহ্‌নামা" প্রভৃতি দরবারী ইতিহাসগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার জন্য গোলাম হোসেন-রচিত "সিয়র-উল-মুতাক্ষরিন" নামক গ্রন্থটিও খুবই মূল্যবান্।

সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ

মুসলমান সুলতান ও বাদশাহ্‌গণ অনেক সময় স্মৃতিকথা রচনা করিতেন। ঐতিহাসিকতার দিক হইতে সেগুলির মূল্যও খুব কম নহে। এ বিষয়ে ফিরোজ শাহ্-রচিত "ফুতুহত্-ই-ফিরোজ শাহী", বাবর-রচিত "বাবরনামা" এবং জাহাঙ্গীর-রচিত "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলতান ও বাদশাহ্‌গণের আত্মীয়-স্বজন এবং আমীর-ওমরাহ্‌দের স্মৃতিকথাগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নহে। হুমায়ুনের ভগিনী গুল্‌বদন বেগম-রচিত "হুমায়ুননামা" গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান্।

স্মৃতিকথা

সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ও ইশ্‌তেহার এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলিও ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুর আক্রমণের ফলে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক ব্যক্তিগত দলিল ও চিঠিপত্রাদি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। চিঠিপত্রগুলির গুরুত্বের উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে, কিছুদিন পূর্বে কুমার রাম সিংহের কতকগুলি পত্র জয়পুর হইতে উদ্ধারের ফলে শিবাজীর জীবনের এক অজ্ঞাত ইতিহাস অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র

মুসলমান আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা হইতেও তৎকালীন ভারত সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়। এ বিষয়ে বিখ্যাত কবি আমীর খসরুর নাম সহজেই করা চলে। তাঁহার রচনা হইতে আলাউদ্দিন খলজির আমলের অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। ঐ যুগে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় রচিত সাহিত্য হইতেও তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়।

সাহিত্য

মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার জন্য ইবন্ বতুতা, আবদুর রজ্জাক, আফানাসি (আথানাসিয়াস) নিকিতিন, নিকলো কন্তি, ফিচ, টেরি, রো, তাভের্নিয়ে, বের্নিয়ে, কারেরি, মানুচি প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণগুলিও খুবই মূল্যবান্। বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের কারখানা ও কুঠির দলিল, বিবরণ ও চিঠিপত্রও এ বিষয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

বৈদেশিক বিবরণ

আধুনিক কালের উপাদান।—ইংরেজ আমলের বা বর্তমান কালের ইতিহাস রচনার উপাদান কিন্তু এমন বিরল নহে। সেগুলি সংবাদপত্র, ঐতিহাসিকগণের দ্বারা লিখিত ইতিহাস, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও স্মৃতি-কথা প্রভৃতি হইতে অপেক্ষাকৃত সহজেই সংগ্রহ করা যায়। পুলিস ও আদালতের নথিপত্র, সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ, কোম্পানির আমলের কুঠির বিবরণ ও হিসাবপত্র প্রভৃতিও এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. What different sources can we use to reconstruct the ancient and mediaeval history of India ?

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস রচনার জন্য আমরা কি কি উপাদান ব্যবহার করিতে পারি ?

2. Discuss the importance of (i) inscriptions, (ii) coins, (iii) literature, (iv) foreigners' accounts, and (v) various documents as the sources of modern history.

ভারতীয় ইতিহাস রচনার উপাদানরূপে (১) লিপি, (২) মুদ্রা, (৩) সাহিত্য, (৪) বৈদেশিক বিবরণ ও (৫) অন্যান্য বিভিন্ন দলিলপত্রের গুরুত্ব আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা

Syllabus : Indus Valley Civilization (with some reference to other contemporaneous civilizations).

পাঠসূচী : 'সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা (সমসাময়িক সভ্যতাগুলির উল্লেখ সহ) ।

মানব জাতির ইতিহাসের ধারায় ভারতবর্ষ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অংশগ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এখন মিলিয়াছে। সুপ্রাচীন কালে, খ্রীষ্টের জন্মের তিন-চার হাজার বছর আগে, মিশরের নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল এবং মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সমসময়ে ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলেও যে অনুরূপ এক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা কিছুদিন পূর্বেও অজ্ঞাত ছিল। প্রথমে যখন এই সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখনও সিন্ধু নদের তীরবর্তী এই সুপ্রাচীন সভ্যতার সহিত মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুমের সভ্যতার সাদৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ প্রথমে ইহাকে সুমের সভ্যতারই অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপক খনন ও গবেষণা কার্য চালাইবার পরে এখন এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। সুপ্রাচীন ভারতীয়গণই যে এই সভ্যতার স্রষ্টা, এখন সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই।

সমসাময়িক অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতা

মাত্র আটত্রিশ বৎসর পূর্বেও আর্য সভ্যতাকেই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা মনে করা হইত। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেন-জো-দড়ো (মহেন-জো-দড়ো শব্দের অর্থ 'মৃতের স্তূপ') এবং পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশের মণ্টগোমারি জেলার হরপ্পা নামক স্থান দুইটিতে ভূগর্ভে প্রোথিত শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। আর্যগণের

ভারতে আগমনের পূর্বেও ভারতবর্ষ যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে খুবই উন্নত ছিল, তাহা প্রায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। মহেন-জো-দড়ো শহরটি সিন্ধু নদের এবং হরপ্পা শহরটি সিন্ধুর উপনদী রাবী (ইরাবতী) নদীর তীরে অবস্থিত। তাই এই সুপ্রাচীন সভ্যতাকে "সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতা" বলা হয়। মহেন-জো-দড়ো করাচী হইতে প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে এবং হরপ্পা লাহোর হইতে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক

মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পা
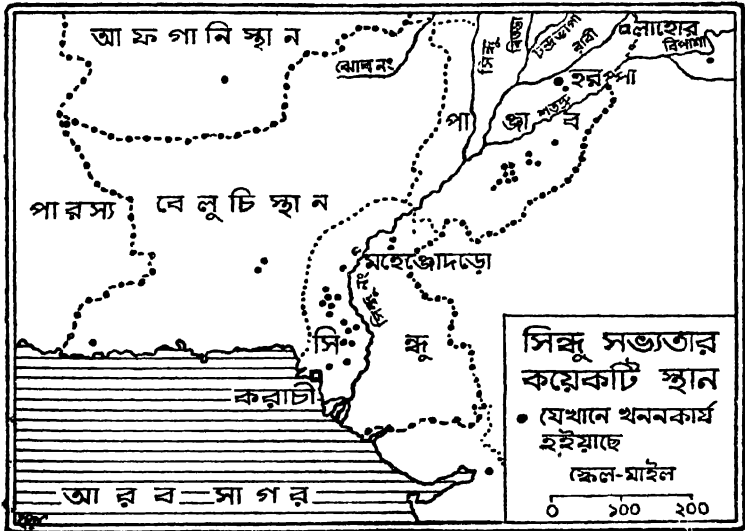
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন-জো-দড়োয় খননকার্য আরম্ভ করেন। উভয় স্থানের খননকার্যের পরিচালনা ও যোগাযোগবিধান করেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল। ১৯২৭ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক এন. জি, মজুমদার সমগ্র সিন্ধু অঞ্চলে

ব্যাপকভাবে সন্ধানকার্য চালান। এই সন্ধানকার্যে নিযুক্ত থাকার সময়েই কিরথর পর্বতমালায় দস্যুহস্তে তিনি নিহত হন এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব একজন প্রতিভাবান্ পুরুষের দান হইতে বঞ্চিত হয়।

খননকার্য

প্রত্নতাত্ত্বিক আর্নেস্ট ম্যাকে সিন্ধু প্রদেশের চন্‌হু-দড়োতে খননকার্য চালাইয়া সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতার এক পরিণততর রূপের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। হরপ্পা, মহেন-জো-দড়ো ও চন্‌হু-দড়ো ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরো অনেকগুলি স্থানেও খননকার্য চালানো হইয়াছে। খননকার্যের ফলে ঐ সকল স্থান হইতে একই ধরনের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, মৃৎপাত্র, গৃহ, খাদ্যাবশেষ, সীলমোহর, খেলনা, মূর্তি প্রভৃতি বহু জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে এই সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টেইন ১৯২৬ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ বালুচিস্থানের উপান্তবর্তী অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান। ফলে তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। সেগুলি হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, ইরান ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুপ্রাচীন সভ্যতার সহিত ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের এই সুপ্রাচীন সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল।

মহেন-জো-দড়োতে প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান খনন করা হইয়াছে। সেখানে পর পর কয়েকটি স্তরে কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শহরের চিহ্ন

উহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এখন সিন্ধু অঞ্চল শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন হইলেও, পূর্বে মৌসুমী বায়ু ঐ পথেই প্রবাহিত হইত এবং সেজন্য তখন ঐ অঞ্চল বৃষ্টিপ্রধান ছিল। ফলে নদীতে প্রায়ই বন্যা হইত। বন্যায় শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দীর্ঘকালের জন্য তাহা পরিত্যক্ত হইত। পরে নূতন করিয়া পুনরায় শহর গঠন করা হইত। ইহার ফলেই এক শহরের উপর অন্য শহরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এইভাবে বিভিন্ন স্তরে পাওয়া গিয়াছে।

এখানে সোনা, রূপা, সীসা, টিন, তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়া নির্মিত অলংকার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র বহু পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু লৌহনির্মিত কিছু পাওয়া যায় নাই। তাহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, এই সভ্যতা লৌহ যুগের পূর্বে তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগে—সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে—গড়িয়া উঠিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার উর ও কিশ নগরে কতকগুলি সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি মহেন-জো-দড়োয় প্রাপ্ত সীলমোহরের অনুরূপ। কিশে আবিষ্কৃত সীলমোহরটি

সিন্ধু সভ্যতার কাল

যে খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্তিকাগর্ভের বিভিন্ন স্তর হইতে মৃৎপাত্র বা পাত্রের টুকরা আবিষ্কার করিয়া সেগুলির তুলনামূলক বিচারের দ্বারা সুপ্রাচীন যুগের সভ্যতা-গুলির সম্পর্ক নির্ণয় একটি সুপ্রচলিত রীতি। ঐরূপ বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারাও পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসরের আগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় পর পর কয়েকটি স্তরে কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি শহর ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইতে এবং তাহার উপর নূতন শহর গড়িতে যথেষ্ট সময় লাগে। তাহাও সিন্ধু সভ্যতার সুপ্রাচীনতারই সাক্ষ্য দেয়।

এখানে ভূগর্ভ খনন করিয়া দুই-কামরাওয়ালা ছোট গৃহ হইতে প্রাসাদোপম বহু গৃহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেক গৃহে দুই বা ততোধিক তলার চিহ্নও আছে। গৃহগুলি রোদে শুকানো এবং আগুনে পোড়ানো ইঁট দিয়া তৈয়ারী। বড় বড় থামওয়ালা কতকগুলি দালানও

গৃহ

বাহির হইয়াছে। ঐসব দালান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৮০ ফুট। ঐগুলি সভাগৃহ ছিল বলিয়া মনে হয়। বহু সারি সারি ছোট ছোট বাড়ির চিহ্নও আছে।

পথ ও নর্দমা

মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার পথগুলি বেশ সোজা, চওড়া ও সমান্তরাল; কে বা কাহারা যেন সেগুলি সুনিয়মিত পরিকল্পনা অনুসারে নির্মাণ করিয়াছিল। পথের পাশে নর্দমা ছিল। গৃহের দ্বিতল হইতে মলমূত্রাদি নির্গমেরও সুব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।
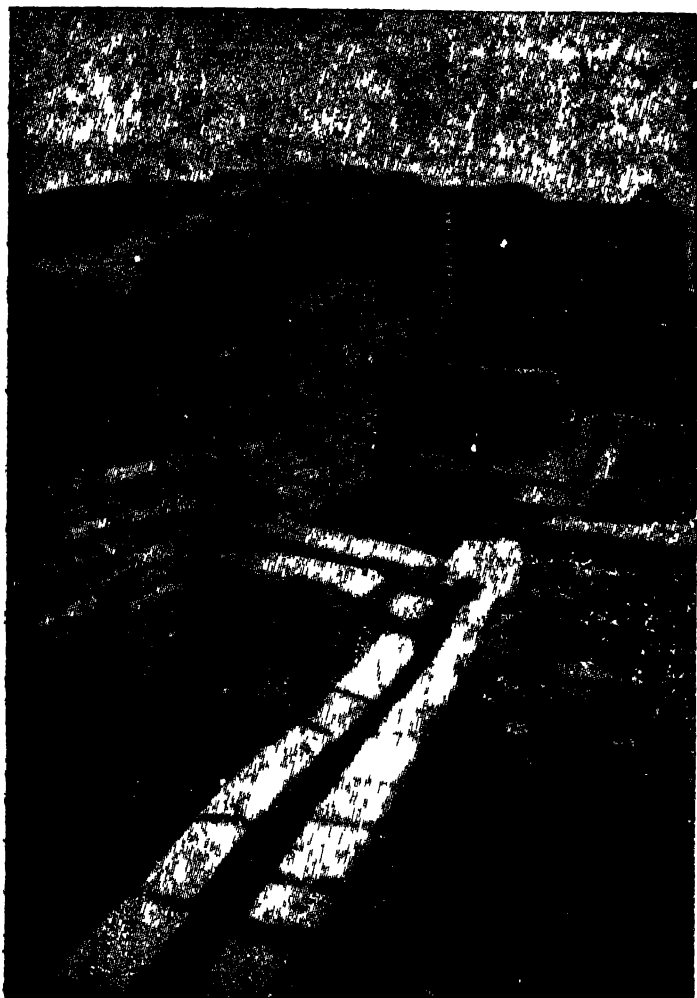
মহেন-জো-দড়োর ঢাকা নর্দমা

মহেন-জো-দড়োর বিখ্যাত স্নানাগার
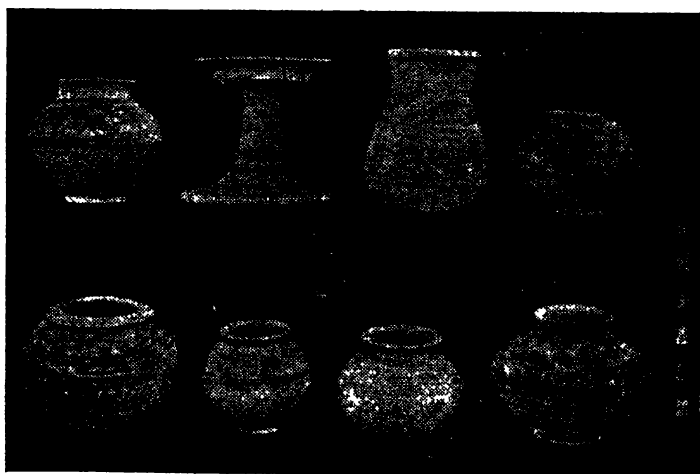
মহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত পাত্র
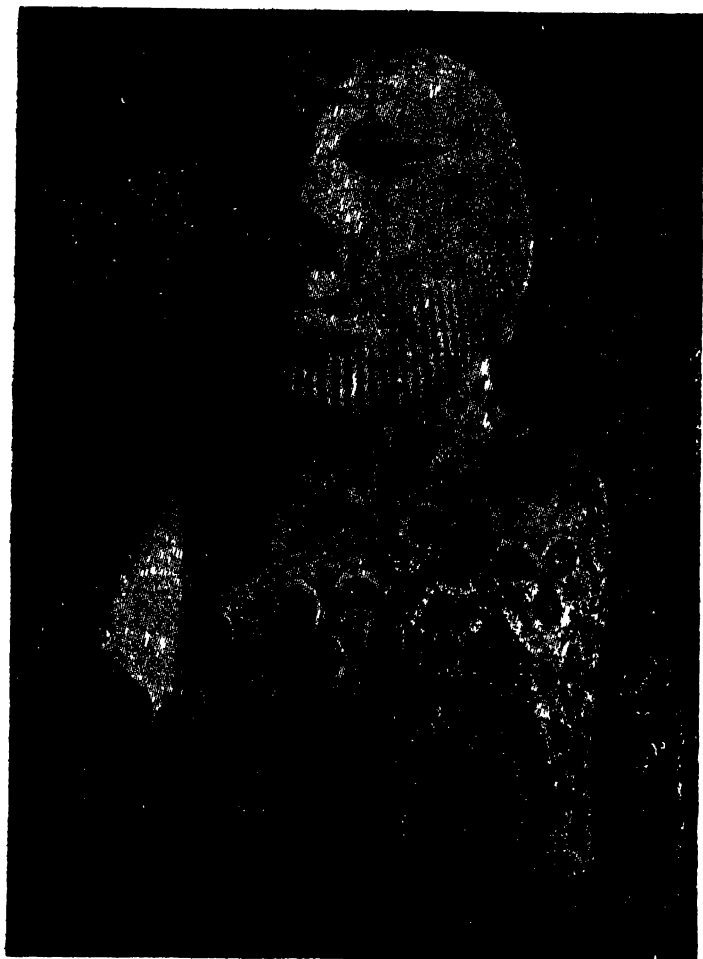
মহেন-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মূর্তি
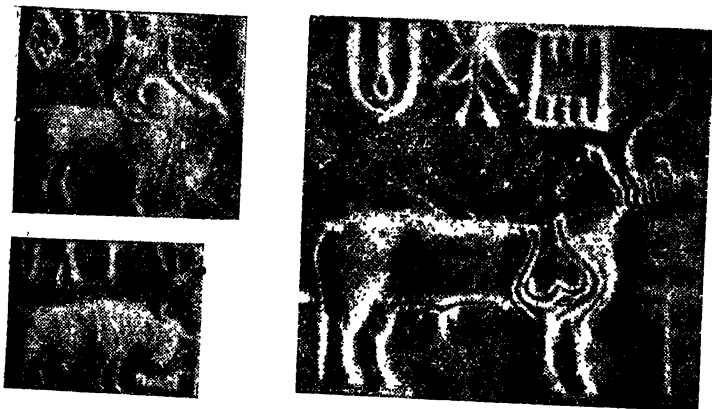
মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহর

সীলমোহরে পশুপতি যোগী মূর্তি
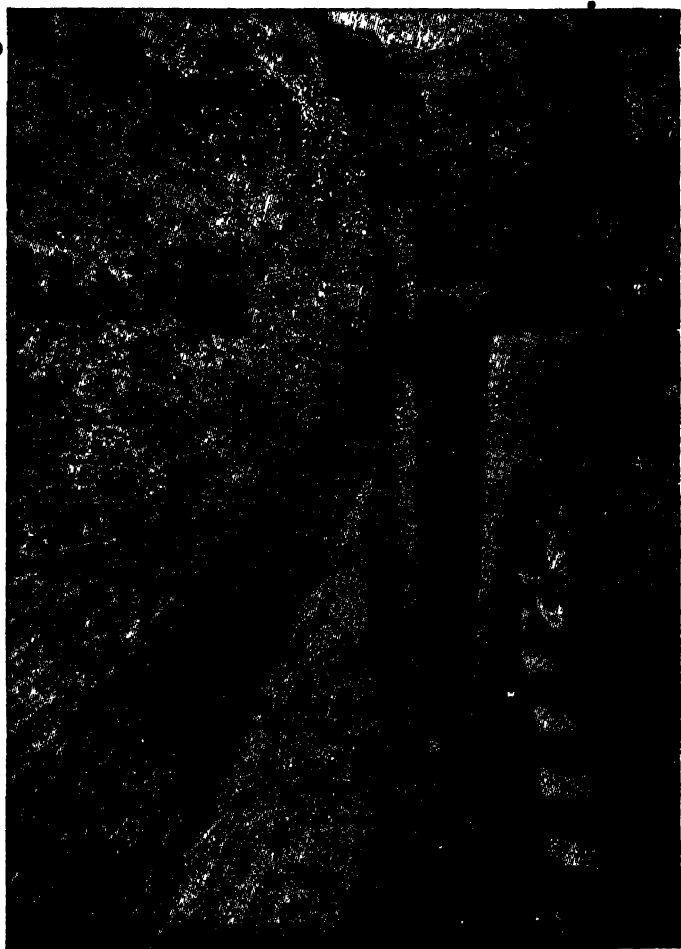
হরপ্পায় নগররক্ষার প্রাচীর

মহেন-জো-দড়োতে একটি সুবৃহৎ স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট এবং প্রস্থে ১০৮ ফুট। উহার চারিদিকে ৮ ফুট পুরু দেওয়াল ছিল। স্নানাগারের মধ্যে ৩৯ ফুট দীর্ঘ, ২৩ ফুট প্রস্থ এবং ৮ ফুট গভীর সন্তরণের উপযোগী একটা চৌবাচ্চাটি আছে। চৌবাচ্চাটির তলদেশ বেশ শক্ত করিয়া বাঁধানো। উভয় পার্শ্বে চৌবাচ্চায় নামিবার জন্য সোপানশ্রেণীও রহিয়াছে। চৌবাচ্চার চারিদিকে গ্যালারি ও গ্যালারিগুলির পিছনে বহু কামরা এবং কামরার মধ্যে কূপ আছে। কূপ হইতে চৌবাচ্চায় জল ভরিবার ব্যবস্থা ছিল। উষ্ণ বায়ুসেবনের ব্যবস্থার চিহ্নও দেখা যায়।

স্নানাগার

ভূগর্ভে যেসব খাদ্যাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে জানা যায়, এখানকার লোকে গম, যব, খেজুর, মাছ, মাংস ইত্যাদি খাইতেন। সুতী ও পশমী কাপড়েরও চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এখানকার লোকে সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত, ঝিনুক ও দামী পাথরের নানারকম সুন্দর সুন্দর গহনা পরিতেন। ঐসব গহনার মধ্যে বালা, হার, আংটি, দুল, নাকছাবি, তোড়া ইত্যাদি প্রধান।

খাদ্য ও বেশভূষা

এখানে খুব উন্নত ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও চীনামাটির সুন্দর সুন্দর বাসন পাওয়া গিয়াছে। হাড় ও হাতিদাঁতের সূচ ও চিরুনি, মাটির, চীনামাটির ও হাড়ের মাকু ও কাটিম, তামা ও ব্রোঞ্জের দা, ছুরি, কুড়াল, ক্ষুর এবং ব্রোঞ্জের আয়নাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন ওজনের চৌকো পাথরের টুকরাও অনেক রহিয়াছে। সম্ভবত সেগুলি বাটখারা হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

বহু খেলনা, পুতুল এবং মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। খেলনার মধ্যে মাটির তৈয়ারী গোরুর গাড়ি এবং চেয়ারও আছে। এগুলি হইতে ঐ সকল জিনিসের ব্যবহার যে তখন সুপ্রচলিত ছিল, তাহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। নাচার ভঙ্গিতে তৈয়ারী পুতুলগুলি দেখিয়া বোঝা যায়, এখানকার মেয়েরা নাচিতে জানিতেন, চুল

খেলনা ও পুতুল

ঘাড়ের উপর ফেলিতেন। মহেন-জো-দড়োতে প্রাপ্ত একটি মূর্তি দেখিয়া বোঝা যায়, পুরুষরা শালের মতো বহুমূল্য চাদর গায়ে দিতেন। তাঁহারা দাড়ি রাখিতেন, তবে ঠোটের উপরের চুল কামাইতেন। এখানকার লোকে ভাস্কর্যশিল্পেও যথেষ্ট উন্নত ছিলেন।

এখানে প্রায় পাঁচ শতেরও অধিক সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির উপর নানা জীবজন্তুর মূর্তি এবং দুর্বোধ্য অক্ষরে কিসব লেখা আছে। এইসব সীলমোহর সম্ভবত ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজেই ব্যবহৃত হইত। এগুলি হইতে বোঝা যায়, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সেই যুগেও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন এবং তাঁহারা অক্ষরের ব্যবহার জানিতেন। ঐ প্রকার সীলমোহর এলাম (দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে) এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে বোঝা যায়, ঐসব অঞ্চলের সহিতও সে যুগে ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত।

সীলমোহর ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

ঋগ্‌বেদ হইতে জানা যায়, আর্যগণ ভারতে আসিয়া "পণি" নামে এক শ্রেণীর অনার্যদের সহিত কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নিরুক্তকার যাস্ক এই "পণি" শ্রেণীকে ব্যবসায়ী শ্রেণী বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্‌ড্ (Gordon Childe) তাঁহার What Happened in History গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সিন্ধু অঞ্চলের নগরসমূহ হইতে নির্মিত দ্রব্যাদি এমন কি তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরবর্তী বাজারেও বিক্রয় হইত। অন্যপক্ষে, কিছু সুমেরীয় শিল্প-সামগ্রী, প্রসাধন-দ্রব্য ও বেলনাকৃতি সীলমোহর সিন্ধু অঞ্চলে অনুকৃত হইয়াছিল। বাণিজ্য কেবল কাঁচা মাল ও বিলাসদ্রব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব সমুদ্রের উপকূল হইতে আনীত মৎস্যও নিয়মিতভাবে মহেন-জো-দড়োর খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করিত।"

সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত জীবজন্তুর অস্থি ও কঙ্কাল দেখিয়া বোঝা যায়, গোরু, মহিষ, ভেড়া, হাতী ও উট গৃহপালিত পশুরূপে ব্যবহৃত হইত। ঘোড়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলা যায় না। খেলনায় খোদাইকরা মূর্তি এবং কাঁচা ইটের উপর পায়ের ছাপ হইতে বোঝা

গৃহপালিত পশু

যায়, কুকুর-বিড়ালও পোষা হইত। সীলমোহরগুলি হইতে বহু বন্য জন্তুরও পরিচয় মেলে।

মূর্তি ও বিভিন্ন সীলমোহর দেখিয়া মনে হয়, এখানকার লোকে শিব ও দুর্গার মতো কোনও দেবদেবীর পূজা করিতেন। একটি সীলমোহরে জীব-জন্তুতে পরিবেষ্টিত যোগী-মূর্তি রহিয়াছে। তাহা দেখিলে সহজেই আমাদের মহাযোগী পশুপতি শিবের কথা মনে পড়ে। সীলমোহরে বৃষ ও অশ্বত্থ জাতীয় বৃক্ষের শাখাও রহিয়াছে। তাহা হইতে মনে হয়, এখানকার লোকে বট ও অশ্বত্থ জাতীয় বৃক্ষ ও বৃষকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। শিবলিঙ্গের মতো বহু পাথরের টুকরাও পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি হইতে মনে হয়, এখানকার লোকে লিঙ্গপূজা করিতেন। কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির চক্ষু অর্ধনিমীলিত এবং দৃষ্টি নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ। অনেকে মনে করেন, এখানকার লোকে যোগাভ্যাস করিতেন। তবে এখানে কোনও দেব-মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই।

ধর্ম

এখানে কুড়াল, বর্শা, ছোরা, গদা প্রভৃতি বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তরবারি পাওয়া যায় নাই। তীরধনুকের মতো কোনও অস্ত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। তবে এখানে শিরস্ত্রাণ ও বর্মজাতীয় জিনিস পাওয়া যায় নাই। শহরের সীমান্তে যে বিরাট প্রাচীরগুলি বাহির হইয়াছে, সেগুলি সম্ভবত বন্যা ও শত্রু উভয়ের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হইত।

অস্ত্রশস্ত্র

এই অঞ্চলের সভ্যতা নগরপ্রধান ছিল। কিন্তু শহরের জন্য উদ্‌বৃত্ত শস্যের প্রয়োজন ছিল। তাই কৃষিকার্যেও এখানকার লোকে যে খুবই উন্নত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রমশিল্পেও যে তাঁহারা অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ধাতুশিল্পে তাঁহাদের অপূর্ব দক্ষতা হইতে বোঝা যায়, বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান্ তত্ত্ব তাঁহারা অধিগত করিয়াছিলেন।

কৃষি ও শ্রমশিল্প

মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জাতির লোকেরাই সম্ভবত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরে আর্যদের ভারত আগমনের

ফলে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। এখানে আবিষ্কৃত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইলে ভারতের এক অজ্ঞাত অতীত যে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতার গুরুত্ব

মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পা সম্পর্কে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল বলিয়াছেন, "এখন হইতে ভারতকে পারস্য, মেসোপটেমিয়া ও মিশর সহ যেখানে-যেখানে সভ্যতার সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটিয়াছিল, সেই সকল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।" তিনি আরও বলেন, "কতিপয় দিক হইতে মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতা হইতেও উন্নততর ছিল।"

সমসাময়িক সভ্যতা হইতেও উন্নততর

প্রশ্নাবলী

1. Was there any civilisation in India before the coming of the Aryans? What were its main features? Name some of the contemporary civilizations and show their affinity.

আর্যগণের আগমনের পূর্বে ভারত কি সভ্য ছিল? ঐ সভ্যতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? উহার সমসাময়িক কয়েকটি সভ্যতার নাম কর এবং তাহাদের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাও।

2. Describe the social and religious life of the Indus Valley people. How does their civilization compare with other contemporary civilizations? What do you know about its date and excavation?

সিন্ধু সভ্যতার যুগে ঐ অঞ্চলের লোকের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন বর্ণনা কর। সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতাগুলির সহিত কি ভাবে তাহার তুলনা করা যায়? উহার কাল ও খননকার্য সম্পর্কে কি জান?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্যগণের ভারতে আগমন—বৈদিক যুগে আর্যগণের সভ্যতা ও সংস্কৃতি—অনার্য জাতিগুলির সহিত আর্যদের মিলন ও মিশ্রণ

Syllabus : Coming of the Aryans in India—their social life and institutions—extent of non-Aryan influence.

আযগণেব ভারতে আগমন—তাঁহাদের সমাজ-জীবন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি—অনায প্রভাব।

আর্যদের আদিভূমি।—পূর্বে আযদিগকে ভারতেরই আদিম অধিবাসী মনে করা হইত। কিন্তু কয়েকজন ইউবোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে গবেষণা কবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ইউবোপীয় ভাষাগুলির শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ সাদৃশ্যের একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, সুদূর আয়ারল্যাণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পযন্ত সুবিশাল ভূভাগের অধিবাসিগণের প্রধান অংশ মূল আর্য জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। এখন প্রশ্ন উঠে, মূল আর্য জাতি সর্বপ্রথমে কোথায় বাস করিতেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ রাশিয়ার দক্ষিণে এবং কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলকেই আর্যগণের আদি-বাসভূমি মনে করেন। সম্ভবত সংখ্যাবৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন, খাদ্যের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহারা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি এশিয়া মাইনরে বোগাজ-কোই নামক স্থানে যে সকল মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির কতকগুলিতে প্রাচীন হিটাইট জাতির রাজা এবং মিতান্নি জাতির রাজার মধ্যে সন্ধির শর্তাবলী লিখিত রহিয়াছে। ঐ সন্ধি খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে

ভাষাগত সাদৃশ্য

আদিবাসভূমি ও আগমনপথ

হইয়াছিল মনে হয়। সন্ধিপত্রে দেখা যায়, মিতান্নি রাজা মিত্র (সূর্য), বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে স্মরণ করিতেছেন। ঐরূপ কতকগুলি মৃৎফলকে লিখিত রথদৌড়ের নিয়মকানুনও পাওয়া গিয়াছে। দৌড়ের সময় রথ কতবার ঘুরিল, তাহা প্রকাশের জন্য 'একবর্তন্ন', 'তেরবর্তন্ন', 'পঞ্চবর্তন্ন', 'সত্তবর্তন্ন' ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত একবর্তন, ত্রিবর্তন, পঞ্চবর্তন, সপ্তবর্তন ইত্যাদির সহিত এইগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রাচীন ইরানীদের ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'-র ভাষার সহিতও বেদের ভাব ও ভাষার প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। পণ্ডিতগণ প্রাচীন মিতান্নি ও ইরানীদের সহিত ভারতীয় আর্যগণের নিকট সম্পর্ক অনুমান করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, পারস্যের পথেই আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আর্য-অনার্য সংঘর্ষ।—আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার অনার্য সভ্যতা বিরাজ করিতেছিল। আর্যগণের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদে অনার্যগণের সহিত যুদ্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আছে। আর্যগণ অনার্যদিগকে কৃষ্ণবর্ণ, "অনাস" (নাসিকাহীন) এবং "দাস" ও "দস্যু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে যে আর্যরা যথেষ্ট বেগ পাইয়াছিলেন, তাহা ইন্দ্রের প্রতি আর্যদের স্তবস্তুতিগুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। ইন্দ্রকে "পুরন্দর" বা পুরধ্বংসকারী বলা হইয়াছে। "পুর" শব্দের অর্থ নগর বা দুর্গ। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার অনার্যরা এই নগর ও দুর্গগুলির অধিকারী ছিলেন অনুমান করা যায়। ঋগ্‌বেদের একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, "হরিয়ুপীয়ার" অধিবাসিগণকে ইন্দ্র নিধন করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, এই "হরিয়ুপীয়া" হরপ্পারই নামান্তর মাত্র। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর উপরের স্তরগুলি হইতে বাহিরের শত্রুর আক্রমণের সুস্পষ্ট চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে। নানাস্থানে স্তূপীকৃত মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থাই যে তাহার কারণ, এমন অনুমান করা চলে। উপরের স্তরে নূতন ধরনের বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিও অন্য জাতির আগমনের সাক্ষ্য দেয়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য ও অনার্যগণের

মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল এবং শেষে যুদ্ধে আর্যগণ জয়ী হইয়াছিলেন। ইহা সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার অব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে ঘটিয়াছিল।

আর্যদের বসতিবিস্তার।—ঋগ্‌বেদ সংহিতাই আর্যদের প্রাচীনতম রচনা। তাহাতে আফগানিস্থানের কাবুল (কুভা) নদী, ভারতের সিন্ধুনদ ও তাহার উপনদীগুলি এবং সরস্বতী নদীর উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরযূর উল্লেখও কিছু কিছু আছে। তাহা হইতে বোঝা যায়, ঐ যুগে আর্যগণ আফগানিস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে বসবাস করিতেছিলেন। কিন্তু বেদের পরবর্তী অংশ "ব্রাহ্মণ" রচনার যুগে দেখা যায়, পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্ব কমিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত পূর্বদিকস্থ অঞ্চলগুলির গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িতেছে। বিন্ধ্য ও গোদাবরীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-গুলিরও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ আযগণ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি বিস্তার করিতেছেন। আযগণের এইরূপ বসতি-বিস্তার করিতে বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল। তাহা যে খুব শান্তিপূর্ণভাবে ঘটিয়াছিল, তাহাও নহে। একদিকে আর্যগণ যেমন দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতিগুলির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, পুরু, ভরত, সৃঞ্জয় প্রভৃতি আর্য উপজাতিগুলির মধ্যেও যুদ্ধ চলিতেছিল। বৈদিক সাহিত্যে নগরের নামোল্লেখ ক্রমেই বাড়িতেছিল। অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতা ক্রমেই নাগরিক হইয়া উঠিতেছিল।

বৈদিক সাহিত্য।—প্রাচীন ভারতীয় আযগণের সমাজ-সভ্যতার কথা জানিতে হইলে প্রধানত বৈদিক সাহিত্যের উপরই নির্ভর করিতে হয়। বেদ ও বেদাঙ্গ লইয়াই বৈদিক সাহিত্য। "বেদ" শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদ চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বেদগুলিকে আবার চারিভাগে ভাগ করা যায়—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

চারি বেদ

সংহিতাগুলিতে স্তব-স্তুতি ও মন্ত্রাদি রহিয়াছে। ঐগুলিকে "সূক্ত" বলা হয়। সূক্ত শব্দের মূল অর্থ সুন্দরভাবে কথিত। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় ১০২৮টি সূক্ত রহিয়াছে। ইহার ১০১৭টি ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশ মণ্ডলে এবং ১১টি বালখিল্যসূক্ত নামে সংহিতার শেষাংশে রহিয়াছে। সাম, যজুঃ ও অথর্ব

বেদের সংহিতাগুলির অধিকাংশ সূক্তই ঋগ্‌বেদ সংহিতা হইতে গৃহীত। সাম বেদ সংহিতার সূক্তগুলি যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময়ে গীত হইত। যজুর্বেদ সংহিতায় সুন্দর ছন্দোময় গদ্যও রহিয়াছে। অথর্ববেদ সংহিতায় স্তব ছাড়া মন্ত্রতন্ত্র এবং ডাকিনীবিদ্যাও আছে। সংহিতাগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদ সংহিতাকেই সর্বপ্রাচীন বলা হয়।

সংহিতা

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণগুলিতে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ আছে। বিভিন্ন বেদের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। সেগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ও শতপথ এবং অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মণ

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষে আরণ্যক রহিয়াছে। এই অংশ সংসারত্যাগী অরণ্যবাসী আর্যদের জন্যই রচিত। ঐগুলিতে সত্য ও সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা রহিয়াছে। আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইল ঐতরেয় আরণ্যক, কৌশীতকি ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইল কৌশীতকি আরণ্যক।

আরণ্যক

বেদের শেষাংশ উপনিষদ্। তাই উহা "বেদান্ত" নামেও পরিচিত। উপনিষদ্ শব্দের মূল অর্থ "নিকটে উপবেশন"। পুত্র বা শিষ্য নিকটে উপবেশন করিয়া এই সকল জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন বলিয়াই এইগুলি উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌গুলির সহিত আরণ্যকগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এগুলিও সত্য, সৃষ্টি, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদির আলোচনায় পূর্ণ। বর্তমানে শতাধিক উপনিষদ্ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি উপনিষদ্‌গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপনিষদ্

ঋগ্‌বেদ্ সংহিতা ও সর্বশেষ উপনিষদ্‌গুলির রচনাকালের মধ্যে প্রায় এক হাজার বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ঋগ্‌বেদ সংহিতা খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। অন্য পক্ষে, কোনও কোনও উপনিষদ্

বেদ রচনার কাল

বুদ্ধোত্তর যুগেও রচিত হইয়াছিল। আর্য সমাজ ঐ হাজার বৎসরে নিশ্চল ছিল না, তাহাতে দ্রুত বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটিতেছিল। বৈদিক সাহিত্যে সেই বিকাশ ও পরিবর্তন সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রাচীন আর্যগণ অক্ষরের ব্যবহার জানিতেন না। এই বিপুল সাহিত্য তাঁহারা শুনিয়া শিখিতেন ও স্মরণ রাখিতেন। তাই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'।

বেদাঙ্গ।—কিন্তু এই বিশাল সাহিত্যকে নির্ভুলভাবে স্মরণ রাখিবার জন্য কেবল শ্রবণ ও স্মৃতিশক্তিই যথেষ্ট ছিল না। সেজন্য ধ্বনি, ছন্দ, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে যথাসময়ে যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়, সে বিষয়েও আর্যদের লক্ষ্য ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁহারা গভীরভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন এবং অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই জ্ঞানের পরিচয় আমরা বেদাঙ্গগুলির মধ্যে পাই। বেদাঙ্গ ছয়ভাগে বিভক্ত—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্পসূত্র। 'শিক্ষা' হইল বিশুদ্ধ উচ্চারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী, 'নিরুক্ত' হইল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিচার ও ব্যাখ্যা এবং 'কল্পসূত্র' হইল সমাজ ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিধিনিষেধ। ব্যাকরণে পাণিনির ও নিরুক্তে যাস্কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ষড়্দর্শন।—প্রাচীন আর্যগণ আরণ্যক ও উপনিষদে সত্য, সৃষ্টি, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব চিন্তা করিয়াছিলেন, সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দর্শনশাস্ত্র ছয় ভাগে বিভক্ত—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। বিভিন্ন বিখ্যাত ঋষিকে এই সকল বিভিন্ন দর্শনের প্রবর্তক বলা হয়। সাংখ্যের সহিত কপিলের, যোগের সহিত পতঞ্জলির, ন্যায়ের সহিত গোতমের (গৌতমের), বৈশেষিকের সহিত কণাদের, পূর্বমীমাংসার সহিত জৈমিনির এবং উত্তরমীমাংসার সহিত বাদরায়ণ ব্যাসের নাম জড়িত রহিয়াছে।

প্রাচীন আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা।—প্রাচীন আর্য সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল পরিবার। পিতাই পরিবারের কর্তা ছিলেন। তাই তাঁহাকে

'গৃহপতি' বলা হইত। মাতা পিতার অধীন হইলেও তাঁহার সম্মান-মর্যাদা কম ছিল না। পিতামাতা পুত্রই কামনা করিতেন। কিন্তু কন্যার জন্ম হইলে তাহাকে স্নেহ-সুযোগ হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করা হইত না। সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ছিল অতি উচ্চে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে চিরকুমারী থাকিতে পারিতেন। তাঁহাদের লেখাপড়া শিখিবার কোনও অন্তরায় ছিল না। বৈদিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, বিশ্ববরা, অপালা প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণই তাহার প্রমাণ। বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল। পুরুষরা সাধারণত একপত্নীক ছিলেন; তবে সমাজে বহুপত্নীক পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না।

নারীর স্থান

অনার্যগণ সাধারণত সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাইতেন। আর্যগণের তুলনায় অনার্যগণ কৃষ্ণকায় ছিলেন। তাই বর্ণ দেখিয়াই প্রধানত আর্য ও অনার্যগণের মধ্যে প্রভেদ বোঝা যাইত। ফলে আর্য ও আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত অনার্যগণের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে আর্যগণ নিজেদের মধ্যেও গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বর্ণভেদের সর্বপ্রথম উল্লেখ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে, বিরাট্‌ পুরুষ (ভগবান্‌) তাঁহার দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি করেন। বর্ণভেদের প্রচার ও প্রচলনের জন্য যে এইরূপ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এইভাবে বর্ণভেদ সমস্ত আর্য সমাজে প্রসারিত হইয়াছিল। যে সকল আর্য বিদ্যাচর্চা, উপাসনা ও যাগযজ্ঞাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত রহিলেন, তাঁহারা হইলেন 'ক্ষত্রিয়'। যাঁহারা কৃষিকার্য, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিলেন, তাঁহারা হইলেন 'বৈশ্য'। আর আর্য-সমাজভুক্ত অনার্যরা সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে 'শূদ্র' রূপে স্থান পাইলেন। পরিচর্যা ও শ্রমশিল্পই তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। তবে তখনও বর্ণভেদ পরবর্তী কালের মতো সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে পূর্ণ ছিল না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তিনিই ইষ্টমন্ত্র গায়ত্রী রচনা করিয়াছিলেন।

বর্ণভেদ

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় বিদেহরাজ জনকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন উচ্চবর্ণের আর্যরা তাঁহাদের জীবনকে প্রধান চারি ভাগে বিভক্ত করিতেন। এই ভাগগুলির এক-একটিকে 'আশ্রম' বলা হয়। আর্য সন্তানগণ প্রথম জীবনে গুরুগৃহে সংযম ও শুচিতার মধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। ঐ সময়টিকে বলা হয় 'ব্রহ্মচর্য' আশ্রম। শিক্ষাশেষে তাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতেন। উহাকে বলা হয় 'গার্হস্থ্য' আশ্রম। পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁহারা অরণ্যবাসী হইয়া ধর্মানুশীলন করিতেন। উহাকে 'বানপ্রস্থ' আশ্রম বলা হয়। শেষ বয়সে তাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। উহাকে বলা হয় 'সন্ন্যাস' বা 'যতি' আশ্রম। বর্ণভেদ ও আশ্রম প্রাচীন আর্য সমাজের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্। তাই ঐ দুইটি একত্র 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' নামে পরিচিত।

আশ্রম

প্রাচীন আর্যদের ধর্ম।—প্রথম যুগে আর্যগণ দ্যৌ (আকাশ), মিত্র (সূর্য), বরুণ, ইন্দ্র, পৃথিবী, রুদ্র, মরুৎগণ, অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করিতেন। ঐ সকল দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক ছিলেন। তাই প্রাচীন আর্যরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন বলা যায়। তাঁহারা এই সকল দেবতাকে স্তবস্তুতি, নানা যাগযজ্ঞ, বলি ও নানারূপ ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। তবে তাঁহারা ক্রমেই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনাও করিতেছিলেন। উপনিষদের ঋষিদের নিকট ব্রহ্মচিন্তা একটি প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে একদিকে আর্যগণ যখন একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অন্যদিকে তাঁহারা যাগযজ্ঞ, বলিদান ও ক্রিয়াকাণ্ডের উপরও জোর দিতেছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা নূতনতর দেবদেবীরও কল্পনা করিতেছিলেন। এই নূতন দেবদেবীগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরই প্রধান। অর্থাৎ বৈদিক যুগের হাজার বৎসরে আর্য সমাজে ধর্ম নিশ্চল অবস্থায় ছিল না, তাহা বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া রূপান্তর লাভ করিতেছিল। (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) তবে তখনও মন্দির ও মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না।

অন্যান্য অভ্যাস ও আচার-ব্যবহার।—দুগ্ধ, ঘৃত, ফলমূল, যব ও গম আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল। তাঁহারা মাংসও প্রচুর পরিমাণে খাইতেন। গোমাংসও নিষিদ্ধ ছিল না। যজ্ঞকালে বা অতিথি-সৎকারের জন্য গোবধ করা হইত। তবে পরে গোরুকে তাঁহারা ক্রমেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে থাকেন। মাংসাহার সম্পর্কেও তাঁহারা ক্রমেই সংযত হইয়া উঠেন। উপনিষদে জীবহিংসা সম্পর্কে প্রচুর নিন্দা করা হইয়াছে। প্রাচীন আর্যরা সুরাপান করিতেন। তবে সুরাপান সম্পর্কেও তাঁহাদের মনোভাব ক্রমেই পরিবর্তিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে সুরাপানের প্রচুর নিন্দা রহিয়াছে। তাঁহারা ধর্মের অঙ্গরূপে সোমরস পান করিতেন। সোমলতা নামে গাছ হইতে উক্ত পানীয় প্রস্তুত হইত। কোন্ গাছকে সোমলতা বলা হইত, তাহা আজও সুনিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই।

খাদ্য

আর্যরা সুতা ও পশমের পোশাক পরিতেন। ঋষিরা বল্কল ও পশুচর্ম পরিধান করিতেন। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই অলংকার পরিতেন। স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান্ রত্নাদি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় ছিল। ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রথদৌড়, মৃগয়া, বাজি করিয়া পাশা-খেলা ও নাচ-গান খুবই প্রচলিত ছিল। সংগীতবিদ্যায় বৈদিক আর্যগণ খুবই উন্নতি করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বীণা, বংশী, দুন্দুভি, নাদী, কর্করি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সুপ্রচলিত ছিল।

বেশভূষা

আমোদ-প্রমোদ

রাজনৈতিক অবস্থা।—রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল গ্রাম। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক-একটি গ্রাম হইত। গ্রামের প্রধানকে বলা হইত ‘গ্রামণী’। কতকগুলি গ্রাম লইয়া আবার ‘বিশ্’ বা ‘জন’ গঠিত হইত। বিশ্ ও জনের প্রধানকে বলা হইত ‘বিশ্পতি’ বা ‘রাজন্’।

বৈদিক যুগে প্রধানত রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। তবে রাজারা জনসাধারণের মতামত মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ‘সভা’ ও ‘সমিতি’ নামে প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল। প্রজার সংরক্ষণ ও কল্যাণসাধনই রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি নিজে রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন। অবশ্য, সৈন্যপরিচালনার জন্য

রাজতন্ত্র

সেনাপতি বা 'সেনানী'-ও থাকিতেন। রাজার প্রধান মন্ত্রী পুরোহিত নামে অভিহিত হইতেন। রাজার অন্যান্য মন্ত্রী এবং অমাত্যও থাকিতেন। রাজারা তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিতেন এবং একরাট্, সম্রাট্ ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতেন। নিজ নিজ প্রাধান্য ঘোষণার জন্য তাঁহারা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন।

প্রজাতন্ত্র

বৈদিক যুগে প্রজাতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে 'গণ' ও 'গণজ্যেষ্ঠ' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। তবে রাজতন্ত্র ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল এবং প্রজাতন্ত্রগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছিল।

কৃষি ও পশুপালন

অর্থনৈতিক অবস্থা।—আর্যরা প্রথম যুগে নাগরিক জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রাম্য জীবনই তাঁহাদের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিল। কৃষি ও পশুপালন ছিল তাঁহাদের প্রধান জীবিকা। কৃষিকার্যের উপযোগী সেচ-ব্যবস্থার উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বন পোড়াইয়া নূতন ক্ষেত করিবার উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর মিলে। বৈদিক সাহিত্যে করীষ (গোময়) ও অন্যান্য প্রাণীর মল সাররূপে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। লাঙলগুলি আকারে ক্রমেই বাড়িতেছিল। কাঠক সংহিতায় উল্লেখ আছে যে, একটি লাঙল টানিতে চব্বিশটি বৃষ লাগিত। ব্রীহি (ধান্য), যব, মুদ্গ (মুগ), মাষ (কলাই), তিল, গোধূম (গম) প্রভৃতি প্রধান শস্য ছিল। তাঁহার মৃগয়াও করিতেন। কিন্তু প্রাচীন আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। দেশে ক্রমেই নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। নাগরিক অর্থনীতির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ ঘটিতে লাগিল। বৈদিক যুগে সম্ভবত মুদ্রার প্রচলন ছিল না।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

সাধারণত পণ্য-বিনিময়ই চলিত। তবে গোরু ও গহনা অনেক সময় মুদ্রার কাজ করিত। মুদ্রারূপে স্বর্ণালংকারের ব্যবহার হইতেই সম্ভবত 'নিষ্ক' (কণ্ঠভূষণ) নামক মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে শ্রম-বিভাগ বেশ উন্নত ছিল। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করিত। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় কৃষক, ধীবর, ক্ষৌরকার,

রঞ্জক, কর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার, কুম্ভকার ইত্যাদি বহুবিধ পেশায় নিযুক্ত লোকের তালিকা রহিয়াছে। বিভিন্ন পেশা গ্রহণের জন্য সামাজিকভাবে কেহ পতিত বা ঘৃণিত হইত না। বৈদিক যুগে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। তবে দেশে স্বাধীন কৃষক ও শ্রমিকের অভাব ছিল না। ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

শ্রমশিল্প

বৃষ ও অশ্ব সাধারণত পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইত। তবে বৈদিক যুগে আর্যগণ জলপথে যাতায়াতেও নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আর্য ও অনার্যের মিলন ও মিশ্রণ।—অনার্যদের সহিত আর্যদের সুদীর্ঘকাল সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং অনার্যগণ ধীরে ধীরে আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অনার্য সভ্যতা একেবারে হীন ছিল না। সংখ্যাতেও অনার্যগণ কম ছিলেন না। ফলে তাঁহারা একদিকে যেমন আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া আর্য সমাজে স্থান গ্রহণ করিতে-ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আর্যগণও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছিলেন। অনার্যগণ নাগরিক সভ্যতার এক উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। আর্যগণের সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের ফলে যখন নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিতেছিল, তখন আর্যগণ অনার্যগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমন অনুমান করা চলে। নগরনির্মাণ ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যে ভারতীয় অনার্যগণ সম্ভবত নবাগত আর্যগণের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন। রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদের ও লঙ্কাপুরীর যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা অযোধ্যার বর্ণনাকে ম্লান করিয়া দেয়। মহাভারতে বলা হইয়াছে, পাণ্ডবগণ রাজসূয় যজ্ঞকালে ময় দানবকেই তাঁহাদের প্রাসাদ ও মণ্ডপ রচনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল কাহিনীর মধ্যে অনার্য শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হইয়াছে। তাই আর্যগণ যে বিভিন্ন শিল্পকার্যে, বিশেষত নগর, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণে অনার্যদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাও সহজে অনুমেয়।

নাগরিক সভ্যতার বিকাশে অনার্য প্রভাব

ধর্মের দিক হইতেও অনার্যগণ আর্যগণের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিলেন। অনার্যগণ গো-জাতিকে শ্রদ্ধা করিতেন। আর্য সমাজে তাঁহাদের প্রভাবেই সম্ভবত গো-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়িতেছিল। অশ্বত্থ বা বট জাতীয় বৃক্ষকে অনার্যগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। আর্যগণও ক্রমেই সেগুলিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে থাকেন। শিব ও দুর্গার পূজাও সম্ভবত অনার্যগণের নিকট হইতেই আর্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনার্যগণ লিঙ্গ-পূজা এবং মূর্তিপূজা করিতেন। আর্যগণ তাহাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য সমাজে যোগ-সাধনা অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

আর্য ধর্মে অনার্য-প্রভাব

এক কথায় বলা চলে, আর্য ও অনার্যগণের সুদীর্ঘ কাল মিলন ও মিশ্রণের ফলেই বর্তমান হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the social, political and religious conditions of the Aryans in the Vedic Age. How did the non-Aryan culture contribute to the further development of the Hindu civilisation ?

সংক্ষেপে বৈদিকযুগের আর্যগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর। অনার্য সংস্কৃতি হিন্দু সভ্যতার আরও বিকাশের পথে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল লিখ।

2. What led us to think that Aryans came to India from abroad ? When did they come ? Whom did they face here ? What where the results of their contact with and the non-Aryan Indians ?

আর্যগণ বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, এই ধারণা আমাদের কিরূপে হইল ? তাঁহারা কখন ভারতে আসিয়াছিলেন ? এখানে তাঁহারা কাহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন ? তাঁহারা অনার্য ভারতীয়গণের সংস্পর্শে আসায় কি ফলাফল ঘটিয়াছিল ?

3. What do you mean by Vodic literature ? What does it contribute to our knowledge about the Aryans and the ancient India ?

বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝ ? আর্যগণ ও সুপ্রাচীন ভারত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভে বৈদিক সাহিত্য আমাদিগকে কিভাবে সাহায্য করিয়াছে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবধর্মের অভ্যুত্থান—মহাবীর ও বুদ্ধের জীবন ও বাণী—বৌদ্ধ ও জৈন সংগঠন—শিল্প-সাহিত্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

Syllabus : Religious movements—Buddhism and Jainism—their organization, literature and art (Buddhist art in India, Ceylon, China, Indo-China and Central Asia should be referred to).

পাঠসূচী : ধর্ম-সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলন—বৌদ্ধধম ও জৈনধর্ম—সেগুলির সংগঠন, সাহিত্য ও শিল্প (ভারত, চীন, ইন্দোচীন ও মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধশিল্প সম্পর্কে উল্লেখ থাকিবে)।

বৈদিক ধর্মের প্রতিক্রিয়া।—বৈদিক যুগের শেষের দিকে বলিদান ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কাণ্ড অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিদান ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্য ঘটায় সমাজে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য অত্যধিক বাড়িয়াছিল। বর্ণভেদও বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছিলেন। কিন্তু জীবহিংসা ও মানুষের প্রতি ঘৃণাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপনিষদের ঋষিরা ইহার বিরোধিতা করিতেছিলেন। ব্রহ্মচিন্তা এবং অহিংসভাবে সৎপথে চলাই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া তাঁহারা প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, জীব পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং স্ব স্ব কর্ম অনুসারে তাহার অধোগতি বা ঊর্ধ্বগতি হয়। বৈদিক ধর্মে বর্ণিত বহু দেবতা সম্পর্কেও তাঁহাদের মনে সংশয় জাগিয়াছিল। তাঁহারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, এই কথা প্রচার করিতেছিলেন। এইভাবে বৈদিক যুগের শেষের দিকে বৈদিক ধর্ম একদিকে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞ, বলিদান ইত্যাদিতে যেমন পূর্ণ হইয়াছিল, অন্যদিকে তাহা তেমনি ব্রহ্মচিন্তা, অহিংসা এবং কর্ম ও জন্মান্তরবাদ প্রচার করিতেছিল। বৈদিক ধর্মের এই শেষোক্ত দিকটি ধীরে ধীরে মানুষের মনে এক অভিনব ধর্মচেতনা জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। ফলে দেশে যাগযজ্ঞ

উপনিষদের শিক্ষা

ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে নানা সম্প্রদায় দেখা দিল। জৈন শাস্ত্রমতে, ঐ সময় ৩৬৩টি এবং বৌদ্ধশাস্ত্র মতে, ৬২টি পৃথক ধর্মসম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। এতোদিন ব্রাহ্মণরাই ধর্মে নেতৃত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যে সকল ধর্মসম্প্রদায় দেখা দিল, সেগুলিতে প্রধানত অব্রাহ্মণরাই নেতৃত্ব করিলেন। পার্শ্বনাথ, মহাবীর ও বুদ্ধ, সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎকালীন ঐ ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ধর্মে ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্ব

মহাবীর ও জৈনধর্ম।—মহাবীরই জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। তবে জৈনগণ মনে করেন, পর পর চব্বিশ জন ধর্মগুরু বা 'তীর্থংকর' ঐ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম জন ছিলেন ঋষভদেব এবং ত্রয়োবিংশ জন ছিলেন পার্শ্বনাথ এবং চতুর্বিংশ জন ছিলেন মহাবীর। ঐ চব্বিশ জন তীর্থংকরের মধ্যে প্রথম বাইশ জন সত্যই ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে পার্শ্বনাথ প্রকৃত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, তিনি কাশীর এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'চতুর্যাম' বা চারিপ্রকার সংযমই ছিল তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র। এই চারিপ্রকার সংযম হইল অহিংসা, অনৃত (সত্য), অস্তেয় (অচৌর), এবং অপরিগ্রহ (ত্যাগ বা সন্ন্যাস)। মহাবীর তাঁহার ধর্মের ভিত্তিরূপে এই চারিটি সংযমকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎসহ দৈহিক সংযম বা ব্রহ্মচয সংযোগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পার্শ্বনাথ পরেশনাথ (পার্শ্বনাথ) পর্বতে সিদ্ধিলাভ করেন।

পার্শ্বনাথ

মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্ধমান। তিনি বৃজি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীর নিকটবর্তী কুণ্ডপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ "জ্ঞাতৃক" নামক ক্ষত্রিয়কুলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার মাতা ত্রিশলা বৈশালীর লিচ্ছবিগণের নেতা চেটকের ভগিনী ছিলেন। চেটকের কন্যা চেল্লনা বিম্বিসারের পত্নী ছিলেন। সেদিক হইতে মগধের রাজপরিবারের সহিত বর্ধমানের আত্মীয়তা ছিল। চেল্লনার অপর চারি ভগিনী প্রভাবতী, পদ্মাবতী, মৃগাবতী ও শিবা যথাক্রমে সিন্ধু-সৌবীররাজ উদয়ন, চম্পারাজ দধিবাহন, কৌশাম্বীরাজ

শতানিক এবং অবন্তীরাজ চন্দ্র প্রদ্যোতের পত্নী ছিলেন। এই আত্মীয়তাও জৈনধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল।

যশোদা নাম্নী এক মহিলার সহিত মহাবীরের বিবাহ হয় এবং তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে। কিন্তু সংসারের প্রতি ক্রমেই বর্ধমানের বৈরাগ্য বাড়িতে থাকে। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং বারো বৎসর পর্যটন ও তপশ্চর্যা করিয়া অবশেষে পরম জ্ঞান বা "কৈবল্য" লাভ করেন। তিনি কঠোর সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম হয় "মহাবীর" ও "জিন" (জিন শব্দের অর্থ জয়ী)। তিনি সকল গ্রন্থি বা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনি ছিলেন "নির্গ্রন্থ"। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়, "জিন" শব্দ হইতে "জৈন" নামে অভিহিত হইয়াছিল। জৈনদিগকে "নির্গ্রন্থ"-ও বলা হইত। মহাবীর ত্রিশ বৎসর মগধ, কোশল, মিথিলা ও অঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহাবীর

মহাবীর

তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে তিনি যে ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নাই। কাহারও কাহারও মতে, খ্রীঃ পূঃ ৫৪৬ অব্দে এবং কাহারও কাহারও মতে, খ্রীঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার Hindu Civilization গ্রন্থে বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৬অব্দকেই অধিকতর সম্ভাব্য তারিখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

জৈন ধর্ম অনুসারে, জন্মান্তর ও কর্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভই প্রকৃত মুক্তি। এইরূপ নিষ্কৃতি কেবল "ত্রিরত্নের" দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব। এই 'ত্রিরত্ন' হইল উপযুক্ত বিশ্বাস, উপযুক্ত জ্ঞান ও উপযুক্ত আচরণ। জন্ম ও কর্মফলের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে হয়। সেজন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য (অস্তেয়), ত্যাগ (অপরিগ্রহ) ও ব্রহ্মচর্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মহাবীর বসনভূষণকেও বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি পোশাক-পরিচ্ছদও সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে বলেন। জৈনগণের মতে, বস্তুমাত্রেরই আত্মা রহিয়াছে; বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা বলিয়া কিছুই নাই; মানবাত্মার মধ্যে যে শক্তি প্রসুপ্ত রহিয়াছে, তাহারই উচ্চতম, মহত্তম ও পূর্ণতম প্রকাশই ঈশ্বর। জৈনেরা জীবহিংসাকে মহাপাপ মনে করেন। তাঁহারা বৈদিক যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা করেন। তাঁহারা বেদকে "অপৌরুষেয়" বা ভগবানের স্বমুখের বাণী বলিয়াও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, কঠোর আত্মপীড়ন এবং অহিংসাই মুক্তি বা "সিদ্ধ শীলা" লাভের প্রধান উপায়। অনশনে প্রাণত্যাগ জৈন মতে অতিশয় পুণ্য কাজ।

জৈনধর্মের মূলকথা

মহাবীর ও বুদ্ধ একই সময়ে পূর্ব ভারতে ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। গোড়ার দিকে সম্ভবত জৈন ধর্মই অধিক সাফল্যলাভ করিয়াছিল। তাহা দ্রুত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্র বা পৌত্র উদয়ী জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নন্দরাজগণ সম্ভবত জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল শক্তিশালী রাজগণের আনুকূল্য জৈনধর্মের প্রসারলাভে নিশ্চয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথমভাগে জৈনগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান। মহাবীরের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার প্রধান শিষ্য বা গণধরগণের প্রায় সকলেই (কেবল সুধর্মণ ছাড়া) পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় জৈনধর্মে মতদ্বৈধ ছিল না। পরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসময়ে জৈনধর্মে ভদ্রবাহু ও স্থূলভদ্র নামে দুইজন গুরু নেতৃত্ব করিতেছিলেন। ঐ সময় মগধে দুর্ভিক্ষ হইলে ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে

একদল জৈন দক্ষিণ ভারতে চলিয়া যান। পরে ভদ্রবাহু যখন সদলে মগধে ফিরিলেন, তখন জৈনধর্মে মতবিরোধ দেখা দিল। যাঁহারা মগধে ছিলেন, তাঁহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহারা "শ্বেতাম্বর" নামে পরিচিত হইলেন। অপর দল উলঙ্গ থাকাকে জৈনধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা "দিগম্বর" নামে পরিচিত হইলেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাটলিপুত্রে একটি জৈন মহাসভার অধিবেশন হইল। ঐ অধিবেশনে মহাবীরের উপদেশ ও জৈন ধর্মের নিয়মাবলী দ্বাদশ খণ্ডে সংকলন করা হইল। ঐ সংকলনের প্রতি খণ্ড "অঙ্গ" নামে পরিচিত। অঙ্গগুলি অর্ধমাগধী নামক একরূপ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। পরবর্তী কালে বহু জৈন শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। দ্বাদশ অঙ্গ ছাড়াও উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র প্রভৃতি জৈনদের বহু ধর্মশাস্ত্র রহিয়াছে। অনেকের মতে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের বল্লভীতে দেবর্ধি বা ক্ষমাশ্রমণের নেতৃত্বে যে জৈন মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতেই শ্বেতাম্বরগণ জৈন শাস্ত্রগুলির সংকলন করেন।

জৈন সম্প্রদায়

জৈন ধর্মশাস্ত্র

জৈনধর্ম ভারতের নানা স্থানে প্রসার লাভ করিলেও ভারতের বাহিরে কখনও প্রসার লাভ করে নাই। পরে সম্ভবত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সহিত প্রতিযোগিতায় জৈনধর্মের প্রসার অত্যন্ত ব্যাহত হইয়াছিল। এখনও গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুসংখ্যক জৈন রহিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম।—বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ গৌতম। গৌতম সম্ভবত তাঁহার গোত্র বা পারিবারিক নাম। কারণ বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার বিমাতা মহা প্রজাপতিকে 'গৌতমী' এবং বৈমাত্রেয় ভাই নন্দকে 'গৌতম' বলা হইয়াছে। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে নেপাল-তরাইয়ে প্রাচীন কালে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। কপিলাবস্তুতে শাক্য নামে একটি ক্ষত্রিয়কুলের নেতা ছিলেন শুদ্ধোদন। শুদ্ধোদনের দুই স্ত্রী, মায়া ও মহা প্রজাপতি। আসন্নপ্রসবা মায়া দেবদহে পিতৃগৃহে যাইতেছিলেন। পথে

লুম্বিনী (রুম্মিন্ দেই) নামক স্থানে তাঁহার একটি পুত্র হইল। এই পুত্রই সিদ্ধার্থ গৌতম। সিদ্ধার্থ বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলা হয়। জন্মের সপ্তাহকাল পরেই তাঁহার মাতা মায়া দেবীর মৃত্যু ঘটিল। তখন সিদ্ধার্থ তাঁহার বিমাতা ও মাতৃষ্বসা মহা প্রজাপতির নিকট লালিত হইলেন। তিনি কৈশোরে ধনুর্বিদ্যা, মল্লবিদ্যা ও অন্যান্য বহু বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। প্রথম যৌবনেই তাঁহার বিবাহ হইল। তাঁহার স্ত্রী ভদ্দা কচ্ছানা, সুভদ্রকা, বিম্বা, গোপা, যশোধরা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা। যশোধরা শুদ্ধোদনের জ্ঞাতি ভ্রাতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা ছিলেন। সিদ্ধার্থ আবাল্য ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য দেখা দিতেছিল। মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সমস্যা তাঁহাকে বিচলিত করিতেছিল। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ভাবিতেছিলেন। এই সময়ে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার একটি পুত্র হইল। তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন রাহুল। রাহুল শব্দের অর্থ অন্তরায়।

প্রথম জীবন

গৌতম বুদ্ধ

সংসারের বন্ধন ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া সিদ্ধার্থ আর বিলম্ব করা সমীচীন ভাবিলেন না, একদিন গভীর নিশীথে রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগকে বৌদ্ধগণ "মহাভিনিষ্ক্রমণ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ রাজগৃহে বিখ্যাত পণ্ডিত আলাড কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও

তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি নানাস্থানে পর্যটন করিলেন, নানাভাবে কঠোর তপশ্চর্যা করিলেন, কিন্তু শান্তি বা সত্যের সন্ধান পাইলেন না। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তাঁহার শরীর শীর্ণ ও মন দুর্বল হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি গয়ার নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা (বর্তমান লীলাজন) নদীর তীরে উরুবিল্ব নামক স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি 'বোধি' বা পরম জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন। এখন হইতে তিনি "বুদ্ধ" বা পরম জ্ঞানী নামে পরিচিত হইলেন। যেখানে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা "বোধ গয়া" বা "বুদ্ধ গয়া" এবং যে বৃক্ষের তলে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা "বোধিবৃক্ষ" বা "বোধিদ্রুম" নামে পরিচিত হইল। এই সময় সিদ্ধার্থের বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। তিনি কাশীর নিকটে সারনাথে ইসিপতন (ঋষিপত্তন) গ্রামে মৃগদাবে পাঁচজন সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহার ধর্মমত প্রথম প্রচার করিলেন। এই ঘটনাটি বৌদ্ধশাস্ত্রে "ধর্মচক্র-প্রবর্তনা" নামে পরিচিত।

সন্ন্যাসগ্রহণ ও বুদ্ধত্বলাভ

বুদ্ধদেব বলিলেন, মানুষ আপন কর্মফল অনুসারে বার বার জন্মলাভ করে। জন্মলাভ করিলেই মানুষ দুঃখ পায়। সুতরাং দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, জন্ম ও কর্মের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। এই মুক্তিলাভই "নির্বাণ"। বুদ্ধদেব এ সম্পর্কে তাঁহার শিষ্যগণকে চারিটি প্রধান সত্য (আর্য সত্য) শিক্ষা দিলেন :—(১) জগতে দুঃখ রহিয়াছে; (২) দুঃখের কারণ রহিয়াছে; (৩) দুঃখের কারণ বিনাশ করা যায়; (৪) দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে হইলে ন্যায় পথে চলিতে হয়। আটটি ন্যায় পথের বা অষ্টমার্গেরও তিনি নির্দেশ দিলেন। এই আটটি পথ হইল—(১) সম্যক্ দৃষ্টি; (২) সদ্‌বাক্য; (৩) সৎ কর্ম; (৪) সৎ সংকল্প; (৫) সৎ জীবন; (৬) সৎ চেষ্টা; (৭) সৎ স্মৃতি; ও (৮) সম্যক্ সমাধি। হিন্দুদের যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কাণ্ডের তিনি নিন্দা করিলেন। অন্যপক্ষে, তিনি জৈনদের কঠোর আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্র-সাধনের পথও ত্যাগ করিতে বলিলেন। তাই তাঁহার ধর্মমত "মধ্যপন্থা" নামে

বুদ্ধের বাণী

পরিচিত হইল। তিনি জাতিভেদ মানিলেন না। ভগবান সম্পর্কে নীরব রহিলেন।

• সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভের পর ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি মগধ (বিহার), কোশল (উত্তর প্রদেশ) প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে মগধে "জটিল" (জটাধারী) নামে পরিচিত প্রায় এক হাজার অগ্নি-উপাসক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁদের প্রধান ছিলেন কাশ্যপ। বুদ্ধদেবের নবধর্মে তাঁহারা সকলেই দীক্ষিত হইলেন। পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হিসাবে কাশ্যপের অতিশয় সুখ্যাতি ছিল। বুদ্ধদেবের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় বুদ্ধদেবেব খ্যাতি সহজেই ছড়াইয়া পড়িল। মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে রাজগৃহে (রাজগির) বেলুবণ (বেণুবন) দান করিলেন। অতঃপর বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিলেন। পুত্র নন্দ ও পৌত্র বাহুল সন্ন্যাস গ্রহণ করায় রাজা শুদ্ধোদন অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। পিতার দুঃসহ কাতরতা দেখিয়া বুদ্ধদেব এই নির্দেশ দিলেন যে, পিতামাতার অনুমতি ভিন্ন কাহাকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না। ইহার কিছুদিন পরে শ্রাবস্তীর বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী সুদত্ত শ্রাবস্তীতে জেতবন নামে একটি উপবন উপহার দিলেন। জেতবনের মালিক ছিলেন জেত নামক এক রাজা। সুদত্ত তাঁহার নিকট হইতে জেতবন ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, বণিক সুদত্ত যদি জেতবনের সমস্ত মৃত্তিকা স্বর্ণ মুদ্রায় আবৃত করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহাকে জেতবন বিক্রয় করা হইবে। সুদত্ত বহু শকটে করিয়া কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া জেতবনের মৃত্তিকা আবৃত করিয়া দিলেন এবং এইরূপে জেতবন ক্রয় করিয়া বুদ্ধকে উপহার দিলেন। এই শ্রেষ্ঠী সুদত্ত অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ (অনাথকে যিনি খাদ্য দান করেন) নামে সুপরিচিত। এইভাবে রাজগৃহে, কপিলাবস্তুতে ও শ্রাবস্তীতে প্রথম তিনটি বৌদ্ধমঠ গড়িয়া উঠিল। ধর্ম প্রচারের পঞ্চম বৎসরে বুদ্ধদেব তাঁহার

ধর্মপ্রচার

বিমাতার বারংবার কাতর প্রার্থনার ফলে স্ত্রীলোকদিগকেও সন্ন্যাস গ্রহণের ও ভিক্ষুণী হইবার অনুমতি দেন। ফলে বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী, বৈমাত্রেয়ী ভগিনী নন্দা ও বুদ্ধপত্নী যশোধরা বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজা, রাজপুত্র, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল দলে দলে আসিয়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্ত, মোগ্‌গলানা উপালি প্রভৃতি প্রধান। বুদ্ধদেব আনন্দকে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচর নিযুক্ত করেন। বুদ্ধদেব সংঘজীবনের উপর খুব জোর দেন। বুদ্ধ, সংঘ এবং ধম্ম (ধর্ম)—এই তিনটিই বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিরত্ন বলিয়া পরিচিত। আশী বৎসর বয়সে বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে (বর্তমান কুসিয়া)

মৃত্যু

বুদ্ধদেবের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকে বৌদ্ধগণ "মহাপরিনির্বাণ" বলেন। বুদ্ধের মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, খ্রীঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দে, আবার অনেকে মনে করেন, খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

বৌদ্ধ সংগীতি ও ধর্মশাস্ত্র।—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর মহাকাশ্যপই বৌদ্ধগণের প্রধান ধর্মগুরু হন। তাঁহার নেতৃত্বে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় বৌদ্ধগণের এক অধিবেশন হয়। ইহা "প্রথম সংগীতি" নামে পরিচিত। এই অধিবেশনে বুদ্ধদেবের বাণীগুলি সংকলন করা হয়। বুদ্ধদেব জনসাধারণের উদ্দেশে ধর্মোপদেশ দিতেন। তাই সেগুলি তিনি জনসাধারণের কথ্য ভাষাতেই বলিতেন। ফলে পরে সেগুলি পালি ভাষাতেই সংকলিত হয়। এই সংকলন তিন খণ্ডে রচিত। তাই ইহার নাম "ত্রিপিটক"। (ত্রিপিটক শব্দের অর্থ "তিনটি পেটিকা" বা ঝুড়ি।) ত্রিপিটকের খণ্ডগুলির নাম—(১) সূত্রপিটক, (২) বিনয়পিটক; এবং (৩) অভিধর্মপিটক। সূত্রপিটকে বুদ্ধের বাণী ও কার্যাবলীর বিবরণ আছে। সূত্রপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগকে "নিকায়" বলা হয়। পঞ্চম নিকায়ে জাতকের বিখ্যাত কাহিনীগুলি রহিয়াছে। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাদি আছে। অভিধর্মপিটকে আছে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত দার্শনিক তত্ত্বাদি।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর বাদে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয় পাটলিপুত্রে অশোকের রাজত্বকালে। চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সংগীতি কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে বা জালন্ধরে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের বিকাশের দিক হইতে সংগীতিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দুধর্মের সহিত জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা।—হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়ারূপেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল, একথা সত্য, কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ যে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার সহিত জৈন ও বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উপনিষদের ঋষিগণ যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করিতেছিলেন। তাঁহারা বহু দেবতার স্থলে একেশ্বরবাদকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম ও জন্মান্তরবাদ তাঁহাদের চিন্তার মূল ভিত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। মানুষ ভালো-মন্দ কর্ম করে এবং পরজন্মে তদনুসারে ফলভোগ করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মও যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডকে অধর্মীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মচিন্তাকে গ্রহণ না করিলেও কর্ম ও জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। মিসেস রিস্ ডেভিডস্, পিসেল, গার্বে, জাকোবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সাংখ্য ও পতঞ্জলির দর্শনের সহিত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বহুল সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।

সৌসাদৃশ্য

বৌদ্ধগণ মধ্যপন্থাবলম্বী ছিলেন। বুদ্ধদেব ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রতা সাধন, উভয়কে এড়াইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই শিক্ষার সহিত হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত গীতার উপদেশের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, "হে অর্জুন, অতি-ভোজনকারী ও উপবাসশীল বা অতি-জাগরণশীল ও অতিশয় নিদ্রালু ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না।"

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের এইরূপ বহু সাদৃশ্য থাকিলেও বহু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে বেদকে অপৌরুষেয়

বা ভগবানের বাণী বলিয়া স্বীকার করা হয় না। হিন্দুধর্মের দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, বলিদান ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে অস্বীকার করা হয়। বুদ্ধদেব ভগবান সম্পর্কে নীরব ছিলেন এবং জৈনগণ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত মানব-সত্তাকেই ভগবানের মূর্ত প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। হিন্দুধর্মে যে বর্ণভেদকে সমাজ-জীবনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে তাহাকে অস্বীকার করা হয়।

বৈসাদৃশ্য

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা।—বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মেই জন্ম ও কর্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভকেই মুক্তি বা নির্বাণ মনে করা হয়। উভয় ধর্মেই হিন্দুধর্মের যাগযজ্ঞ, বলিদান ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডকে নিন্দা করা হইয়াছে। উভয় ধর্মই বেদকে অপৌরুষেয় বা ভগবানের মুখের বাণী বলিয়া স্বীকার করে না। উভয় ধর্মেই জীবহিংসার নিন্দা করা হইয়াছে।

সৌসাদৃশ্য

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এইরূপ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গভীর বৈসাদৃশ্যও রহিয়াছে। জৈনগণ আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধনকেই ধর্মের প্রধান অঙ্গ মনে করেন। তাঁহারা নানাভাবে দেহকে কষ্ট দেন, অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্য মনে করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্মপীড়নকে ধর্মের অঙ্গ মনে করিতেন না। তাঁহার মতে, দেহকে দুর্বল করিলে মনও দুর্বল হয়, তাহাতে আত্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। তিনি ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সংযতভাবে সৎপথে থাকিতেই উপদেশ দেন। অনশনে আত্মহত্যাকে তিনি মহাপাপ মনে করিতেন। বস্তু মাত্রেরই আত্মা রহিয়াছে, জৈনগণ এইরূপ মত পোষণ করেন। ফলে অহিংসার উপর তাঁহারা অসম্ভব রকম জোর দেন। কিন্তু বুদ্ধদেব জীবহিংসার নিন্দা করিলেও "মধ্যপন্থা" অবলম্বন করিতে বলেন এবং মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি সকল কিছুরই আত্মা আছে, একথা স্বীকার করেন না। জৈনগণ উলঙ্গ থাকাকে ধর্মসাধনের অন্যতম উপায় মনে করেন। বুদ্ধদেব সকলপ্রকার বন্ধন ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেও উলঙ্গ

বৈসাদৃশ্য

থাকাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বসনভূষণের বিলাসিতা ও প্রাচুর্য ত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে বলেন। জৈনগণ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ভগবান সম্পর্কে নীরব থাকেন। বৌদ্ধধর্মের এই মধ্যপন্থিতা বৌদ্ধধর্মকে জনসাধারণের নিকট সহজেই গ্রহণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। অন্যপক্ষে জৈন ধর্মের চরমপন্থিতা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই বৌদ্ধধর্ম যখন সমগ্র এশিয়ার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল, তখন জৈনধর্ম ভারতের কতকাংশে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধধর্মের সংগঠন।—বৌদ্ধধর্ম যে একদা অধিকাংশ এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল তাহার সাংগঠনিক শক্তি। বুদ্ধ নিজেই এই সংগঠনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। গোড়ার দিকে বুদ্ধের শিষ্যরা ছিন্নকন্থা পরিধান করিয়া, গুহায় ও অরণ্যে বাস করিয়া ভিক্ষালব্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজকের জীবন যাপন করিতেন। তাই তাঁহারা "ভিক্ষু" (ভিক্ষুক) নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব মধ্যপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অতিশয় কৃচ্ছ্র সাধন বা বিলাস-ব্যসন কোনটাই পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে মঠে বাস করিয়া ভক্তের নিকট হইতে আহার ও পরিচ্ছদ এবং চিকিৎসকের নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। এইভাবে মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধদের জীবনে সংঘ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ সংঘজীবন যাপনের জন্য কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন। সেগুলিকে প্রধানত সাত ভাগে ভাগ করা যায়—(১) দীক্ষা; (২) মঠ; (৩) পরিচ্ছদ, খাদ্য ও ঔষধ; (৪) পাক্ষিক সমাবেশ; (৫) বর্ষাবাস; (৬) ভিক্ষুণী সংক্রান্ত নিয়মাবলী; ও (৭) ধর্মসংস্থা সংক্রান্ত সংবিধান।

সংঘ-জীবনের প্রারম্ভে সর্বাগ্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দীক্ষা গ্রহণের জন্য পিতামাতার অনুমতি, অন্ততঃপক্ষে পনের বৎসর বয়ঃক্রম এবং কাহাকেও গুরুরূপে বরণ একান্ত প্রয়োজন ছিল। দীক্ষাপ্রার্থীকে মস্তক ও

গুম্ফ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া পীতবস্ত্র পরিধান করিতে হইত। তখন অন্যূন দশজন সন্ন্যাসী লইয়া গঠিত এক সভায় তাঁহাকে উপস্থিত করা হইত। সন্ন্যাসীরা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমতি দিলে ঐ দীক্ষাপ্রার্থী "শ্রমণ" বা ব্রহ্মচারীরূপে সংঘে গৃহীত হইতেন। যখন তাঁহাকে কতিপয় নিয়ম পালন করিতে হইত। অতঃপর বিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে এবং যোগ্য বিবেচিত হইলে তাঁহাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা হইত। কতিপয় নিয়ম অনুসারে মঠের জন্য স্থান নির্বাচন ও মঠের ভবন নির্মাণ করা হইত। মঠ সংঘের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। মঠগুলি সংঘারাম বা বিহার নামে পরিচিত ছিল। সেগুলি ছিল বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধ সন্নাসীরা তিনখণ্ড পীতবস্ত্রকে তাঁহাদের "চীবর" বা পরিচ্ছদরূপে ব্যবহার করিতেন। ভিক্ষার দ্বারা প্রধানত খাদ্য সংগৃহীত হইত। তবে ভক্তের গৃহে খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না। ঔষধ সম্পর্কে কোনও নিষেধ ছিল না। কিন্তু চিকিৎসা বা ঔষধ গ্রহণের নামে সন্ন্যাসীরা যাহাতে বাড়াবাড়ি কিছু না করেন, সে সম্পর্কে নির্দেশ ছিল। পনেরো দিন অন্তর সন্ন্যাসীরা সভায় সমবেত হইতেন। সভায় "ধর্ম" ও "বিনয়" (নিয়মাবলী) সম্পর্কে আলোচনা হইত। বিগত পক্ষকালের মধ্যে কেহ কোনও অপরাধ অথবা বিধিবহির্ভূত কাজ করিয়াছেন কিনা প্রশ্ন করা হইত। অপরাধ সাধারণ হইলে সভায় মার্জনা ঘোষণা করা হইত এবং অপরাধ গুরুতর হইলে অপরাধীকে কয়েকজন সন্ন্যাসী লইয়া গঠিত একটি সমিতির নিকট উপস্থিত করা হইত। বর্ষাকাল আরম্ভ হইলে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন হইতে সন্ন্যাসিগণ স্থায়ী বাসভবনে থাকিয়া প্রতিবেশীর নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণের জন্য নির্দেশ পাইতেন। কোনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাসকারী সন্ন্যাসিগণ ভোটের দ্বারাই তাঁহাদের পরিচালক (সংঘেশ্বর বা সংঘপরিণায়ক) নির্বাচন করিতেন। সংঘের অন্যান্য কর্মীরাও ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। এইভাবে বৌদ্ধ সংঘ ও সংঘারামগুলি সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষুগণ "থেরা" (স্থবির) এবং বয়োবৃদ্ধা বা জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুণীগণ "থেরী" (স্থবিরা) নামে অভিহিত হইতেন। সংঘগুলি

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও ভিক্ষুণীদের স্থান ভিক্ষুদের সমান ছিল না। ভিক্ষুণী-সংঘ ভিক্ষু-সংঘের অধীনে ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষময় অসংখ্য সংঘারাম বা বিহার ছড়াইয়া ছিল। কথিত আছে, একা অশোকই ৮৪০০০ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

জৈন সংগঠন।—জৈন ধর্মেও বৌদ্ধধর্মের মতোই সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। মহাবীর তাঁহার জীবদ্দশাতেই জৈন সন্ন্যাসীদের লইয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন। সন্ন্যাসীদের লইয়া গঠিত সংঘগুলিই বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈন সংগঠনেরও ভিত্তিস্বরূপ ছিল। জৈনগণ দেশে বহু জৈন বিহার বা সংঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। সংঘারামগুলি কেবল জৈন সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল ছিল না; সেগুলি শিক্ষা-সংস্কৃতিরও কেন্দ্র ছিল। বুদ্ধদেব বিমাতা মহা-প্রজাপতির বার বার কাতর প্রার্থনায় এবং অনুচর আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধেই স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাসিনী হইবার ও সংঘে বাস করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবীর প্রথম হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে ভিক্ষুণী হইবার অধিকার দেন এবং ভিক্ষুণীদের সংঘ গড়িয়া তোলেন। পরে দিগম্বর সম্প্রদায় স্ত্রীলোকদিগের এই অধিকার অস্বীকার করিলেও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় স্ত্রীলোকদিগকে ভিক্ষুণীরূপে সংঘে সমান অধিকার দেন। মহাবীর জৈনধর্মের সাধনার অঙ্গরূপে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটি ব্রত পালনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণকে এই ব্রতগুলি পরিপূর্ণরূপে —কায়িক, বাচিক ও মানসিক, তিনভাবেই—পালন করিতে হইত। ইহাকে "মহাব্রত" বলা হইত। গৃহী ভক্তদের সঙ্গেও সংঘের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিত। তাঁহারা ঐসব ব্রত আংশিকভাবে পালন করিতেন। উহাকে "অনুব্রত" বলা হইত। স্ত্রীলোকগণ মহাব্রত ও অনুব্রত উভয়ই পালন করিতে পারিতেন।

ভারতীয় শিল্পসাহিত্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব।—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন, উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ লৌকিক কথ্য ভাষায় ধর্মপ্রচার ও পুস্তকাদি রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে পালি, মাগধী ও অন্যান্য কথ্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ

ত্রিপিটকের অন্যতম খণ্ড "সূত্রপিটক" বৌদ্ধ সাহিত্যের এক গৌরবময় নিদর্শন। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহার পঞ্চম নিকায়ে যে জাতকের (বুদ্ধের বহু পূর্বজন্মের) গল্পগুলি আছে, তাহা ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের গৌরবের স্থল। জাতকের গল্পগুলির সংখ্যা পাঁচ শতেরও অধিক। পরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও টিকাটিপ্পনী সংক্রান্ত যে সকল পুস্তক রচিত হয়, সেগুলিও প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। পরবর্তিকালে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে থাকে। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সংস্কৃত সাহিত্যকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ কেবল বুদ্ধদেবের জীবনচরিত নহে, বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বহু নাটকও রচনা করেন। বৌদ্ধ ও জৈন লেখকগণ দর্শন, অলংকার, অভিধান, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়েও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। জৈন সাধু হেমচন্দ্র (১০৮৯-১১৭২) অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি জৈন ধর্মশাস্ত্রের ভাষ্য ছাড়াও ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য বহু গ্রন্থ ও অভিধান রচনা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলারও অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন, উভয় সম্প্রদায়ই দেশে অসংখ্য সংঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ-বিহার বা সংঘারামে সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল। এই সকল বিহার বা সংঘারামের যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। দক্ষিণ ভারতের অজন্তা, কার্লে (বোম্বাই) প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ গুহা-গৃহগুলি স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময়কর উদাহরণ। বিহারগুলির মতোই অসংখ্য স্তূপ ও স্তম্ভও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষে নির্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের পূতাস্থি বা পবিত্র দেহাবশেষ সংরক্ষণের জন্যে স্তূপগুলি নির্মিত হইত। ভারহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত স্তূপগুলি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরে সাঁচী স্তূপের চারিদিকে যে "বেদিকা" (রেলিং) ও তোরণ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন স্থাপত্য ও তক্ষণশিল্পের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ঐ বেদিকা ও তোরণগুলিতে বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম

স্থাপত্য

সংক্রান্ত অন্যান্য উপাখ্যান অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে রচিত অশোকস্তম্ভগুলি আজও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। জৈন ধর্মের প্রভাবেও স্থাপত্যশিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ে এবং ইলোরায় রহিয়াছে। এ বিষয়ে রাজপুতানার আবু পর্বতে অবস্থিত দিলওয়ারা মন্দির এবং গুজরাটে জুনাগড়ের (গিরনারের) মন্দিরগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নহে।

স্থাপত্যের মতো ভাস্কর্য বা মূর্তিশিল্পেও বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব অপরিসীম। অশোক স্তম্ভের শীর্ষে রচিত পশুমূর্তিগুলি ইহার অপূর্ব নিদর্শন। পরবর্তিকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যে মূর্তিশিল্পধারা প্রবর্তিত হয়, গান্ধার শিল্পে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। গান্ধার, মথুরা, বরাণসী প্রভৃতি স্থানে যেসব বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অপূর্ব মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির তুলনা মেলে না। মূর্তিশিল্পে জৈনধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। হাতিগুম্ফায় উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায়, কোনও নন্দরাজা কলিঙ্গ হইতে একটি জৈনমূর্তি মগধে লইয়া গিয়াছিলেন। জৈনগণ তীর্থংকরদের মূর্তির স্থাপনা ও উপাসনা করিতেন। তাহা মূর্তিশিল্প-রচনার ক্ষেত্রে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ভাস্কর্য

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে প্রাচীনকালে চিত্রকলারও যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অনুমান মাত্র নহে। চিত্রকলা প্রাচীন স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের মতো সহজে কালজয়ী হইতে পারে নাই। তাহা সত্ত্বেও অজন্তায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে রচিত চিত্রাবলী আজও ভারতীয় চিত্রকলার অপূর্ব উৎকর্ষের অমর নিদর্শন হইয়া আছে। কুমারস্বামীর মতে, ভারতবর্ষে কাগজের উপর অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মধ্যে জৈন চিত্রশিল্পই

চিত্রকলা

বৈদেশিক শিল্পসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব।—জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে বিস্তারলাভ করে নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অধিকাংশ এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ফলে সিংহল, চীন, তিব্বত, মধ্য-এশিয়া, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার শিল্পসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অনিবার্য।

সিংহলের রাজা, অমাত্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণ দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সিংহলে বহু গুহাগৃহও নির্মিত হইয়াছিল। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেগুলির মধ্যে "মহাবংশ" ও "দীপাবংশ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পসংস্কৃতিতেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপরিসীম। এ-বিষয়ে যবদ্বীপের বরবুদুরের স্তূপটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুপম উদাহরণ। ইহা একটি পাহাড়ের চূড়ায় পর পর নয়টি মঞ্চের উপর স্থাপিত। মঞ্চগুলির আয়তন ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে হ্রাস পাইয়াছে। সর্বোচ্চ মঞ্চের মধ্যস্থলে ঘণ্টাকৃতি স্তূপটি অবস্থিত। সর্বনিম্ন মঞ্চটির দীর্ঘতম পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ১৩১ গজ। নিম্নবর্তী পাঁচটি মঞ্চের চতুর্দিক গ্যালারির আকারে নির্মিত প্রাচীর ও আলিসা দিয়া বেষ্টিত। উপরের মঞ্চ তিনটির চারিদিকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন স্তূপ রহিয়াছে। প্রত্যেক স্তূপের মধ্যে রহিয়াছে এক-একটি বুদ্ধমূর্তি। মঞ্চের চারিদিকে অবস্থিত গ্যালারিগুলিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত বহু কাহিনী ক্ষোদিত রহিয়াছে। আলিসাগুলির গায়ে কুলুঙ্গির আকারে নির্মিত অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির আছে এবং সেগুলির প্রত্যেকটিতেই বুদ্ধমূর্তি আছে। সমগ্র মন্দিরটির আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গফুট। এই মন্দিরের আয়তন, গঠন ও শিল্পকার্য মানুষকে স্তম্ভিত করে। ইহাকে বিশ্বের অষ্টম বিস্ময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরবুদুরের বুদ্ধমন্দিরটি সম্ভবত ভারতীয় নির্মাণশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানকার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বরবুদুরের স্তূপ ছাড়াও বহু স্তূপ ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ায় স্যার অরেল স্টেইন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলি হইতে ঐ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র অনূদিত ও রচিত হইয়াছিল। ফা-হিয়েন এবং ইউয়ান চোয়াং-এর রচনা হইতে জানা যায়, মধ্য-এশিয়ায় বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলির ধ্বংসাবশেষ এখন আবিষ্কৃত হইতেছে।

বরবুদুরের স্তূপ

চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে অসংখ্য গুহা-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল গুহাগৃহের সহিত অজন্তার গুহাগৃহগুলির সাদৃশ্য অতীব সুস্পষ্ট। চীনদেশে বহু বুদ্ধমূর্তি রচিত হইয়াছিল ও গুহাগৃহগুলির প্রাচীরগাত্রে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু কাহিনী চিত্রের মধ্য দিয়া নিপুণহস্তে ফোটাইয়া তোলা হইয়াছিল। চীন দেশের বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধার ও মথুরা অঞ্চলের মূর্তিনির্মাণশিল্প চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই প্রসারিত হইয়াছিল। শাক্যবুদ্ধ, বুদ্ধকীর্তি ও কুমারবোধি নামে তিনজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী যে চীনদেশে গিয়া চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চীনা ভাষায় অসংখ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র অনূদিত ও রচিত হইয়াছিল। একা ভিক্ষু লোকোত্তম (চীনা নাম আন-শে-কাও) ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে ১৭৯ খানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের ৫৫ খানি এখনও পাওয়া যায়।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কারণ।—বুদ্ধের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেও আজ এশিয়ার চীন, জাপান, ব্রহ্ম, সিয়াম, সিংহল প্রভৃতি বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিলেও চলে। ইহা খুবই আশ্চর্য মনে হয়। ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কতকগুলি কারণ আছে। অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজগণের প্রভাবে ভারতে তথা ভারতের বাহিরে একদা বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল। কিন্তু শক্তিশালী হিন্দু রাজগণের অভ্যুত্থানের ফলে তাহা বারে বারে ব্যাহত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে "মহাযান" ও "হীনযান" নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ও মূর্তিপূজা প্রবেশ করিয়াছিল এবং বুদ্ধদেব অন্যতম অবতাররূপে হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র-গুলি জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইতেছিল। হীনযান

হিন্দু রাজগণের অভ্যুত্থান

বৌদ্ধধর্মের অবনতি

সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের মূল রূপটিকে কিছুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই বিকৃত আকার ধারণ করিয়া নানা তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে পূর্ণ হইতেছিল এবং জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি শক্তিশালী হিন্দুধর্মপ্রচারকগণের আবির্ভাব ঘটায় বৌদ্ধধর্ম কঠিন আঘাত পাইয়াছিল। তথাপি ভারতে বৌদ্ধধর্মের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, মুসলমানগণের আগমনের ফলে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছিল।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারকগণ

প্রশ্নাবলী

1. What led to the development of Buddhism in India? What were the main teachings of Gautam Buddha? What were the causes of the rise and downfall of Buddhism in India?

কি কি কারণে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল? গৌতম বুদ্ধের প্রধান বাণীগুলি কি? কি কি কারণে ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও পরে পতন হইয়াছিল?

2. Briefly describe the rise and spread of Buddhism in India. What are the main contributions to the social and cultural life of India?

সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তার বর্ণনা কর। ভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উহার প্রধান অবদানগুলি সম্পর্কে লিখ।

3. What do you know about the rise of Jainism and Buddhism? Compare and contrast the doctrines of these two religions. Write what you know about the organisation of Jainism and Buddhism?

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কি জান লিখ। ঐ দুই ধর্মের মতবাদের মধ্যে তুলনা করিয়া পার্থক্য ও সাদৃশ্য দেখাও। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের সংগঠন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

4. Describe the influence of Jainism and Buddhism on art and literature in India and abroad.

ভারতীয় ও বিদেশীয় শিল্পসাহিত্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মগধের অভ্যুত্থান—পারসিক ও গ্রীক আক্রমণ—মৌর্য সাম্রাজ্য—মৌর্য যুগে সমাজ-সভ্যতা

Syllabus : Growth of Magadha : Maurya Empire.

Political conditions in the sixth century B. C.—the sixteen Mahajanapadas—monarchy and republic—growth of Magadha—the Nandas—Alexandar's invasion of North-Western India—the Maurya Empire—international relations—Chandragupta—Bindusara. Asoka, his Dhamma—his character and place in history. Mauryan adminis.ration—Megasthenes—evidence of Kautilya. Central and Provincial Governments. Maurya Art—Persian influence (with suitable illustrations).

পাঠসূচী ঃ মগধের অভ্যুত্থান ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অবস্থা—ষোড়শ মহাজনপদ—রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র—মগধের অভ্যুত্থান—নন্দ বংশ—উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের অভিযান—মৌর্য সাম্রাজ্য—আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—চন্দ্রগুপ্ত—বিন্দুসার। অশোক, তাঁহার "ধম্ম"—তাঁহার চরিত্র ও ইতিহাসে তাঁহার স্থান। মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা—মেগাস্থিনিস—কৌটিল্যের রচনা হইতে গৃহীত প্রমাণ। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার। মৌর্য শিল্প—পারসিক প্রভাব (উপযুক্ত উদাহরণ সহ)।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা।—খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ক্রমেই স্পষ্টতর হইতে থাকে। সমসাময়িক পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে ভারতে ষোলটি প্রধান রাজ্য বা মহাজনপদ ছিল। এই ষোড়শ মহাজনপদের নাম—অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী (বারাণসী), কোশল (অযোধ্যা), বৃজি (উত্তর বিহার), মল্ল (গোরখপুর), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), বৎস (এলাহাবাদ), কুরু (দিল্লী ও মীরাট), পাঞ্চাল (যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল), মৎস্য (জয়পুর),

শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরী-তীরবর্তী অঞ্চল), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডি) এবং কম্বোজ (দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফিরিস্থান)। ঐ মহাজনপদগুলির কতকগুলিতে রাজতন্ত্র এবং কতকগুলিতে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্রগুলিতে শাসনভার জননায়কগণের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত। জননায়কগণকে লইয়া গঠিত শাসন-পরিষদ্‌গুলিকে 'সংঘ' ও 'গণ' বলা হইত। যেখানে শাসন-পরিষদের সভা বসিত, তাহাকে বলা হইত 'সংস্থাগার'। জননায়কগণ 'গণজ্যেষ্ঠ', 'সংঘমুখ্য' এবং অনেক সময়ে 'গণরাজ' নামে অভিহিত হইতেন। প্রজাতন্ত্রী মহাজনপদগুলিকে 'গণরাজ্য' বলা হইত।

ষোড়শ মহাজনপদ

গণরাজ্যগুলির মধ্যে বৃজিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বৃজি গণরাজ্যটি উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল। উহার রাজধানী ছিল বৈশালী (বর্তমান মজফ্‌ফরপুর জেলার বসড়)। বৃজি, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক প্রভৃতি আটটি ক্ষত্রিয়কুল-শাসিত জনপদ লইয়া এই গণরাজ্যটি গঠিত ছিল। লিচ্ছবিগণের নায়কত্বে এই গণরাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

বৃজি গণরাজ্য ও লিচ্ছবিগণ

কপিলাবস্তুর শাক্য গণরাজ্যটিও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। কপিলাবস্তু ছিল উহার রাজধানী। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায়, এই গণরাজ্যের জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। কোশলের সহিত যখন শাক্যগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন বিরূঢ়ক ৭৭০০০ শাক্যকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক হইতেও এই গণরাজ্যটি অত্যন্ত উন্নত ছিল। কিন্তু গণরাজ্যগুলি একে একে পার্শ্ববর্তী রাজতন্ত্রগুলির পদানত হইতেছিল। ঐ সময়ে কোশল, অবন্তী, বৎস ও মগধ, এই চারিটি রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কোশল রাজ্যটি বর্তমান উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ছিল। প্রথমে অযোধ্যা ও সাকেত এবং পরে শ্রাবস্তী উহার রাজধানী ছিল। পার্শ্ববর্তী কাশী রাজ্যটি কোশলের পদানত হওয়ায় কোশল খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধদেবের আমলে রাজা প্রসেনজিৎ এখানে রাজত্ব-

শাক্য গণরাজ্য

কোশল

করিতেছিলেন। পরে শাক্য গণরাজ্যও কোশলের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু মগধের অভ্যুত্থানের ফলে কোশল রাজ্যটি শেষে মগধের অধীন হইয়া পড়ে।

ঐ সময়ে অবন্তী রাজ্যটিও খুব শক্তিশালী ছিল। উহা সম্ভবত বর্তমান মালব এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। উহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। বুদ্ধদেবের সময়ে অবন্তীতে রাজা প্রদ্যোৎ রাজত্ব করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী বৎস রাজ্যের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। বৎসরাজ উদয়ন তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

অবন্তী

অবন্তীর উত্তর-পূর্বে ও কোশলের দক্ষিণে বৎস রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। উহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী (বর্তমান এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোসম)। বুদ্ধদেবের আমলে বৎসে উদয়ন রাজত্ব করিতেছিলেন। উদয়ন সম্পর্কে মহাকবি ভাস তাঁহার "স্বপ্নবাসবদত্তা" এবং মহারাজ হর্ষবর্ধন তাঁহার "প্রিয়দর্শিকা" ও "রত্নাবলী" নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মগধের সহিত বৎস রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অবশেষে মগধরাজ অজাতশত্রু বৎস অধিকার করিয়াছিলেন।

বৎস

মগধ রাজ্যটি বিহারের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছিল। মগধের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। মগধের অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ মগধের ইতিহাসই দীর্ঘ কালের জন্য প্রকৃতপক্ষে ভারতের ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল।

মগধ

মগধের অভ্যুত্থান।—বুদ্ধদেবের সময়ে মগধে বিম্বিসার রাজত্ব করিতেন। বিম্বিসারের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে মগধের অভ্যুত্থান শুরু হয়। পুরাণে বিম্বিসারকে শিশুনাগবংশীয় এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে 'হর্যঙ্ককুলোদ্ভব' বলা হইয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে, শিশুনাগ পরবর্তী কালের লোক। সুতরাং বলা চলে, বিম্বিসার হর্যঙ্কবংশীয় ছিলেন। যাহাই হউক, বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য (বর্তমান ভাগলপুর) অধিকার করেন। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া কাশী রাজ্যের কতকাংশ যৌতুকরূপে পান। তিনি

মদ্রদেশের এক রাজকন্যাকে এবং লিচ্ছবিরাজ চেটকের কন্যা চেল্লনাকেও বিবাহ করেন। ফলে মগধের সম্মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিম্বিসার রাজগৃহে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। মহাবীর ও বুদ্ধের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করেন এবং স্বামীর শোকে কোশলরাজকন্যার মৃত্যু ঘটে। ইহাতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে প্রসেনজিৎ পরাজিত হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে অজাতশত্রু সমগ্র কাশীরাজ্য লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত প্রসেনজিতের কন্যার বিবাহ হয়। বৃজি গণরাজ্যের সহিতও মগধের যুদ্ধ বাধে। অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের বিরুদ্ধে পাটলিপুত্রে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রায় ষোল বৎসর যুদ্ধের পর বৃজি মগধের অধিকারে আসে। অজাতশত্রুর আমলে মগধরাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে ছোটনাগপুর পযন্ত বিস্তৃত হয়। অজাতশত্রুর পুত্র (মতান্তরে পৌত্র) উদয়ীভদ্র গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে কুসুমপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ কুসুমপুরই পরে ভারতের ইতিহাসে পাটলিপুত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

বিম্বিসার

অজাতশত্রু

শিশুনাগবংশ।—উদয়ীভদ্রের বংশধরগণ সম্পর্কে স্থিরভাবে কিছুই জানা যায় না। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, তাঁহারা সকলেই পিতৃহন্তা ছিলেন। তাঁহাদের শেষজনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের রাজা হন। শিশুনাগ অবন্তী অধিকার করিয়া মগধের রাজ্যসীমা আরও প্রসারিত করেন। শিশুনাগবংশীয়দের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শিশুনাগ বংশের শেষ রাজা কাকবর্ণী এক আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই আততায়ীই নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ।

নন্দবংশ।—মহাপদ্ম নন্দকে পুরাণে একরাট্ (সম্রাট) এবং "সর্বক্ষত্রান্তক" (ক্ষত্রিয়গণের নিধনকারী) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জৈন সাহিত্যে তাঁহাকে এক বারবিলাসিনীর পুত্র বলা হইয়াছে। রোমক লেখক কার্টিয়াসের

মতে, আলেকজাণ্ডারের সমকালীন নন্দরাজ (ধন নন্দ) নাপিতের পুত্র ছিলেন; উক্ত নাপিত মগধের রানীর প্রণয়ী ছিলেন এবং মগধের রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ যে খুবই বুদ্ধিমান্ ও শক্তিমান্ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহাপদ্ম নন্দ

তিনি পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা প্রসারিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতেব কলিঙ্গ এবং অন্যান্য অনেক স্থানও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আট পুত্র পর পর মগধের রাজা হন। শেষ পুত্র ধন নন্দের আমলেই গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ধন নন্দের সৈন্যবাহিনীতে দুই লক্ষ পদাতিক, বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র রথ এবং তিন সহস্র হস্তী ছিল। ধন নন্দ সম্ভবত জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

ধন নন্দ

পারসিক আক্রমণ।—উত্তর ভারতে মগধ যখন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, তখন ভারতের পশ্চিমে পারস্য অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্য-সম্রাট কুরুষ্ বা সাইরাস (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮—৫৩০) এশিয়া মাইনরস্থ গ্রীক রাজ্য লিডিয়া এবং বেবিলন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরে বল্‌খ রাজ্যও সম্ভবত তাঁহার পদানত হইয়াছিল। পূর্বদিকে ভারতের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র দরয়বৌস্ বা দরায়ুস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) গান্ধার (কাশ্মীর ও রাওলপিণ্ডি) এবং সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা হইতে জানা যায়; গান্ধার অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের সপ্তম প্রদেশ এবং সিন্ধুতীরবর্তী অঞ্চল বিংশ প্রদেশ ছিল। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নাকি ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতেই সংগৃহীত হইত।

কুরুষ্

দরয়বৌস

দরয়বৌসের পরবর্তী সম্রাট ক্ষয়ার্ষ বা জেরেক্‌সেসের আমল পর্যন্ত ভারতীয় অঞ্চলগুলি সম্ভবত পারস্যের অধিকারে ছিল। গ্রীকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

স্কন্দার্ব ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গ্রীকগণের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধে পারস্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সুযোগেই সম্ভবত ভারতীয় অঞ্চল দেশীয় রাজা ও দলপতিগণের নেতৃত্বে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল।

স্কন্দার্ব

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।—পারস্য সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, তখন মাসিডনের নেতৃত্বে গ্রীকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। মাসিডনের রাজা ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার তরুণ পুত্র আলেকজাণ্ডার রাজা হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৬)। পারস্যের সহিত গ্রীসের দীর্ঘকালীন শত্রুতা ছিল। তাই রাজা হইবার অল্পদিনের মধ্যেই আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তখন তৃতীয় দরয়বৌস্ পারস্যের সম্রাট ছিলেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের হস্তে খ্রীঃ পূঃ ৩৩৩ ও ৩৩১ অব্দের দুইটি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ফলে পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি দীর্ঘকাল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন আলেকজাণ্ডার সেগুলিকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু এককভাবে আলেকজাণ্ডারের দুর্ধর্ষ বাহিনীকে বাধা দিবার শক্তি ঐ রাজ্যগুলির ছিল না। তাহারা বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধা দিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতেও পারিল না। খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। সিন্ধু ও বিতস্তা (ঝিলাম) নদীর মধ্যবর্তী তক্ষশিলা রাজ্যের রাজা আম্ভি সহজেই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

আলেকজাণ্ডার

পারস্যের পতন

ঝিলামের পূর্বতীরে ঐ সময় আর একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যে পুরু নামক প্রাচীন আর্য উপজাতির লোকেরা বাস করিত। ঐ রাজ্যের রাজার নাম ঠিক জানা যায় নাই। গ্রীকরা তাঁহাকে পোরস (Poros) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পোরস্ বা পৌরব কিন্তু সহজে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। আলেকজাণ্ডার ঝিলাম পার হইলে তাঁহার সহিত পৌরব বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিল। গ্রীকগণ বিতস্তা বা ঝিলাম নদীকে হিদাস্পিস্ নামে অভিহিত করিতেন। তাই ঝিলামের এই যুদ্ধ প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে "হিদাস্পিসের যুদ্ধ" নামে পরিচিত। হিদাস্পিসের যুদ্ধে পৌরব আহত ও বন্দী হইলেন। পৌরবের শৌর্য ও সাহস দেখিয়া আলেকজাণ্ডার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার হস্তেই পুরুরাজ্যের শাসনভার দিলেন। অতঃপর আলেকজাণ্ডার চেনাব ও রাবী অতিক্রম করিয়া বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ঐ অঞ্চলের সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

ঝিলামের যুদ্ধ

আলেকজাণ্ডারের আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সৈন্যগণ তাহাতে রাজী হইল না। তাহারা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। সম্ভবত মগধের নন্দরাজগণের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সংবাদও তাহারা পাইয়াছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারকে বিপাশার তীর হইতেই ফিরিতে হইল। গ্রীক বাহিনীর একাংশ ঝিলাম ও সিন্ধু দিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিল এবং অপরাংশ আলেকজাণ্ডারের অধীনে ঝিলাম ও চেনাবের তীর ধরিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইল। ফিরিবার পথে আলেকজাণ্ডারকে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি বহু ভারতীয় উপজাতির বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কয়েকবার তাঁহার জীবন বিপন্নও হইয়াছিল। অবশেষে তিনি সিন্ধু অঞ্চল পার হইয়া বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া বেবিলনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে জ্বররোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে)।

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলাফল।—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের প্রত্যক্ষ ফলাফল শুভ হয় নাই। সকল বৈদেশিক

আক্রমণকারীর ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। ইহা রক্তপাত, মৃত্যু ও ধ্বংসই আনিয়াছিল। অসংখ্য ভারতবাসী রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিল এবং ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত হইয়াছিল। বহু নগর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়াছিল। বহু গ্রাম-জনপদ নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। ভারতের এক সুবিস্তৃত অঞ্চল স্বাধীনতা হারাইয়াছিল।

প্রত্যক্ষ ফল

কিন্তু আলেকজাণ্ডারের এই অভিযানের পরোক্ষ ফল যে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য। এই অভিযানের ফলে ভারতের সহিত পাশ্চাত্যের যোগাযোগ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশগুলি স্থাপিত হওয়ায়, তাহা পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলেই ভারতের পশ্চিমে সিরিয়া হইতে বাহ্লীক (বল্‌খ্‌) পর্যন্ত অঞ্চলে গ্রীক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাহ্লীক অঞ্চলের গ্রীকগণ কয়েক শতাব্দী পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পুনরায় প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বাহ্লীক গ্রীকগণের প্রভাবেই ভারতীয় ভাস্কর্য গান্ধার-শিল্পরূপে এক অপরূপ মহিমালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রাগুলি গঠন ও সৌন্দর্যের দিক হইতে উন্নততর হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সাহিত্যের উপরও গ্রীক প্রভাব বিশেষভাবে পতিত হইয়াছিল। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের পশ্চাতে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান বলিয়া অনেকে মনে করেন। "যবনিকা" শব্দটি যবন (গ্রীক) হইতেই উদ্ভূত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকের ধারণা। ভারতীয় পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা সম্ভবত গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবেই সুপ্রচলিত হইয়াছিল।

পরোক্ষ ফলাফল

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত।—গ্রীক লেখকগণের মতে, আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক ভারতীয় যুবক তাঁহার শিবিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং ঐ যুবকের উদ্ধত কথাবার্তায় আলেকজাণ্ডার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তখন ঐ যুবক সুকৌশলে পলায়ন

করিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই যুবকই ভাবী মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। "মৌর্য" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা বা মাতামহীর নাম ছিল মুরা। তাহা হইতেই চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার বংশধরগণ "মৌর্য" নামে পরিচিত হন। প্রবাদ অনুসারে, মুরা নন্দরাজার স্ত্রী ছিলেন। নন্দরাজারা শূদ্র ছিলেন। কিন্তু প্রাপ্ত লিপি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাই ঐ প্রবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অন্যপক্ষে, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে "মোরীয়" নামে একটি ক্ষত্রিয় উপজাতি হইতেই "মৌর্য" শব্দের উৎপত্তি।

মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্তের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বাল্যকালে তিনি ব্যাধ, মেষপালক ও পক্ষিপালকদের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বিশাখদত্ত-রচিত "মুদ্রারাক্ষস" নামক একটি প্রাচীন নাটক এবং গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে চন্দ্রগুপ্তের জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের শিবির হইতে পলায়ন করিয়া কোনও পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় লন। তথায় বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য নামে তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। চাণক্য "কৌটিল্য" নামেও পরিচিত। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত ধন নন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এই ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে উহা খ্রীঃ পূঃ ৩২৪ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটিয়াছিল মনে হয়।

প্রথম জীবন

চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী হন। চাণক্য প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ বলিয়া পরিচিত। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" নামে একটি সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। সাধারণত উহাকে চাণক্যের রচনা বলা হয়। কিন্তু উহার ভাষা ও উহাতে চীনপট্ট ইত্যাদির উল্লেখ লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ উহাকে পরবর্তী কালের রচনা মনে করেন। মৌর্য আমলে রাজসভার ভাষা সংস্কৃত ছিল না। তখন ভারতের সহিত চীনদেশের ব্যবসায়ও চলিত না। যাহাই হউক, "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" হইতে মৌর্যযুগ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা গিয়াছে।

চাণক্য

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ফলে তাঁহার সেনাপতিগণ বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্য লইয়া নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-শাসিত উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করিলেন। অতঃপর দক্ষিণ ভারতেও তাঁহার বিজয়-বাহিনী অগ্রসর হইল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য-হইতে জানা যায়, তিনি বর্তমান মাদ্রাজের তিনেভেল্লী জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহীশূরে প্রাপ্ত পরবর্তী কালের একটি লিপি হইতে জানা যায়, উত্তর মহীশূরও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। শকরাজ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি হইতে জানা যায়, সুরাষ্ট্র বা কাঠিয়াবাড়ও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার

দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিবার পর আলেকজাণ্ডারের তিনজন প্রধান সেনাপতি, সেলুকাস, টোলেমি ও এণ্টিগোনাস, গ্রীক সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। গ্রীক সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ সেলুকাসের ভাগে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক-শাসিত অঞ্চল চন্দ্রগুপ্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। এখন সেলুকাস তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০৫)। ফলে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলুকাসের যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে কে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে সন্ধির শর্ত দেখিয়া মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তই জয়ী হইয়াছিলেন। কারণ চন্দ্রগুপ্তকে সেলুকাস হীরাট, বেলুচিস্থান ও কান্দাহার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হস্তী দিয়াছিলেন। সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বিবাহগত সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে একজন রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল মৌর্য রাজসভায় ছিলেন। তিনি "ইণ্ডিকা" নামে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি পাওয়া যায় নাই। তবে পরবর্তী কালের গ্রীক ও রোমক লেখকগণ ঐ পুস্তক হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেগুলি হইতে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

সেলুকাসের সহিত যুদ্ধ

মেগাস্থিনিস

এই সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ও রক্ষা করিতে চন্দ্রগুপ্তকে প্রধানত সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইত। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে ছয় লক্ষ পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী এবং নয় হাজার হস্তী ছিল। রথের সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে নন্দরাজার রথের সংখ্যার অনুপাতে তাহা সম্ভবত আট হাজারেরও অধিক ছিল।

সামরিক শক্তি
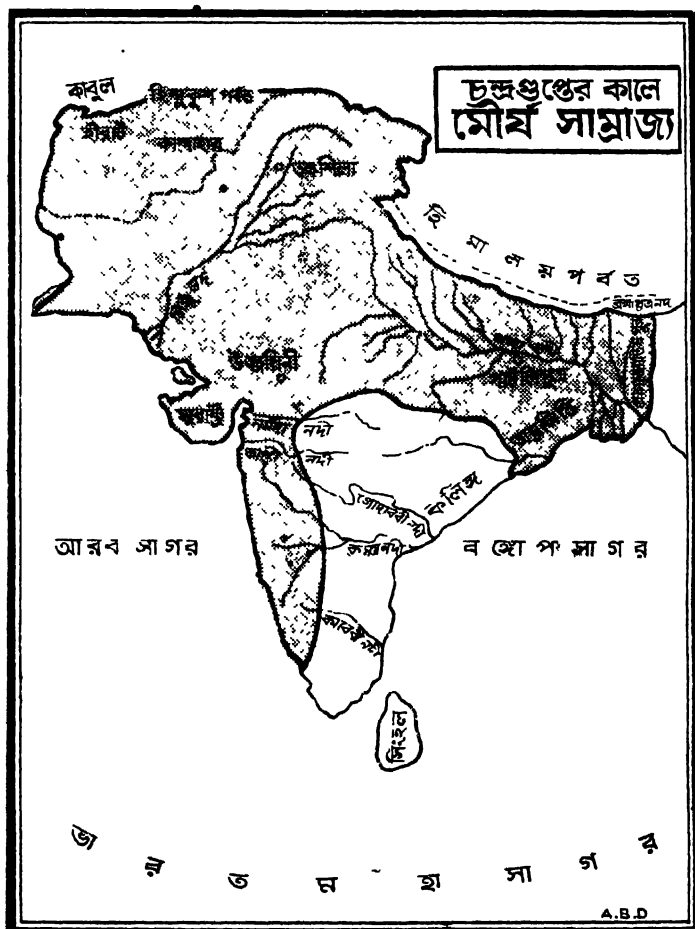
জৈন শাস্ত্র অনুসারে জানা গিয়াছে যে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জৈন ধর্মের প্রচলিত প্রথা অনুসারে অনাহারে থাকিয়া মহীশূরের শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০০)।

বিন্দুসার।—চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার রাজা হন। তিনি সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৩০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি "অমিত্রঘাত" বা শত্রুহন্তা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যকে আরো বর্ধিত করিয়াছিলেন। বৈদেশিক রাজাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেলুকাসের পুত্র প্রথম অ্যান্টিওকাস এবং মিশরের গ্রীক রাজা টোলেমি তাঁহার সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলায় একটি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। রাজকুমার অশোক ঐ বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক শক্তি

অশোক।—বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক রাজা হন। অশোক পিতার জীবদ্দশায় তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি রাজধানীতে আসেন এবং মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সাহায্যে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর বাদে অশোকের অভিষেক হয়। এই বিলম্বের কারণ হিসাবে অনেকে অনুমান করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীমকে হত্যা করিয়া অশোক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাই প্রতিপক্ষকে দমন করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিগুলিতে "দেবানাম্ পিয়, পিয়দসী" (দেবতাদের প্রিয়, প্রিয়দর্শী) এই নাম দেখা যায়। সম্ভবত রাজ্যলাভের পর অশোক এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহলের বৌদ্ধ পালি সাহিত্যেও অশোক পিয়দসী নামেই পরিচিত। সিংহলের বৌদ্ধ পালি সাহিত্য ও অশোক লিপিগুলি হইতেই অশোকের জীবনবৃত্তান্ত ও ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐগুলিতে অশোকের স্থলে "পিয়দসী" নাম থাকায় অশোক ও পিয়দসী এক ব্যক্তি, কি না,

রাজ্যলাভ

সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে মাস্কিতে প্রাপ্ত একটি লিপিতে অশোক ও পিয়দসী উভয় নামের উল্লেখ থাকায় এই সংশয় দূর হইয়াছে।

মহারাজ অশোক

চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী

অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের নাম কলিঙ্গ। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর বাদে অশোক কলিঙ্গ অধিকারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কলিঙ্গ নিতান্ত দুর্বল ছিল না। তাই উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। কলিঙ্গ রক্তস্রোতে ভাসিয়া গেল। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি হইতে জানা যায়, ঐ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিহত ও প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হয়। সম্ভবত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে উহার বহুগুণ লোকের মৃত্যু ঘটে। অবশেষে অশোকই জয়ী হন। কিন্তু কলিঙ্গ-যুদ্ধে অসংখ্য মৃত্যু ও মানুষের দুঃসহ বেদনা দুঃখ-দুর্দশা তাঁহার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায়। ফলে তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সম্ভবত কিছুদিন বৌদ্ধ সংঘে যোগদানও করেন।

কলিঙ্গের যুদ্ধ

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন অশোক তাহাকে অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি কয়েকটি প্রধান উপায় অবলম্বন করেন। সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বুদ্ধ ও অশোকের মধ্যে প্রায় তিন শত বৎসরের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘ কালে বৌদ্ধদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য এই মতভেদ দূর করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই অশোক পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ মহাসভা বা সংগীতি আহ্বান করিলেন। এই সংগীতিতে নেতৃত্ব করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও রাজগুরু মৌদ্গল্যপুত্র তিষ্য। এই সংগীতি তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি নামে পরিচিত।

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি

জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির জন্য অশোক বহু পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে নানারকম বাণী উৎকীর্ণ করিয়া দেন। ঐ সকল শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি "ধর্মলিপি" নামে পরিচিত। ঐ সকল লিপিতে পিতামাতা ও গুরুজনকে ভক্তি করিতে, আত্মীয়স্বজনকে যথোচিত সম্মান দিতে, জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে এবং সর্বদা সত্যকথা

ধর্মলিপি

বলিতে বলা হয়। অশোকের ব্যক্তিগত জীবন ও শাসন এবং সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কেও অনেক তথ্য ঐ সকল লিপি হইতে জানা যায়।
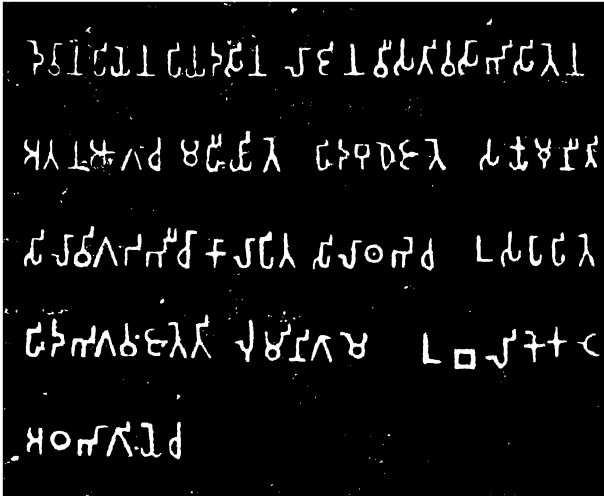
অশোকের একটি ধর্মলিপি

অশোকের পূর্বে রাজারা মৃগয়ায় বা বিহার-যাত্রায় (প্রমোদভ্রমণে) বাহির হইতেন। অশোক তাহা বন্ধ করিয়া ধর্মপ্রচারের জন্য রাজ্যময় ভ্রমণ করিতে থাকেন। উহা "ধর্মযাত্রা" নামে পরিচিত হয়।

ধর্মযাত্রা

ধর্মযাত্রাকালে অশোক সাধারণ কৃষক-মজুরকেও ধর্মের কথা বুঝাইতেন। এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তিনি যেভাবে সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতেন, তাহা অন্য কোনও নৃপতির ক্ষেত্রে দেখা যায় নাই।

বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যও তিনি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, এপিরাস, সাইরিনি প্রভৃতি স্থানে বহু ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজকুমার মহেন্দ্র এবং কুমারী সংঘমিত্রাকে তিনি সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ভারতের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি স্বাধীন

ধর্মবিজয়

রাজ্যগুলিতেও বহু ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোক দেশে দেশে এই শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী প্রচারের নাম দিয়াছিলেন "ধর্মবিজয়"। ধর্মপ্রচারের সুব্যবস্থার জন্য তিনি "ধর্মমহামাত্র" নামে উচ্চশ্রেণীর রাজ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হইলেও অন্য ধর্মের প্রতি কখনও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কখনও ব্রাহ্মণের অসম্মান করেন নাই; তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকেও সাহায্য করিতেন।

উদারতা

অশোকের শাসন-ব্যবস্থা।—অশোকের কালেই মৌর্য সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পশ্চিমে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও কাশ্মীর তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তরে নেপালও যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে তাঁহার স্তম্ভ হইতে বোঝা যায়। তাঁহার রাজ্য সম্ভবত পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যে প্রজাদের যাহাতে মঙ্গল সাধন করা যায়, সেদিকে অশোকের দৃষ্টি ছিল। তাই তিনি শাসনব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে রাজকর্মচারীরা অনেক সময় প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিত। অশোক তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজুক, যুত, মহামাত্র, প্রাদেশিক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজ্যময় ঘুরিয়া শাসনের ত্রুটি ও অব্যবস্থা দূর করিতেন। অহিংস নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দণ্ডের কঠোরতাও অত্যন্ত হ্রাস করা হইয়াছিল। অশোক রাজ্যের চারিদিকে কূপ, পথঘাট ও সেচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পথের দুই দিকে পথিককে ছায়া ও ফল দানের উপযোগী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। দরিদ্র প্রজাগণকে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের বহুস্থানে আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঔষধ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় গাছপালা চাষেরও সরকারী ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য প্রাণীর দুঃখ দূর করিবার জন্যও অশোক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ নম্বর স্তম্ভলিপিতে তিনি জীবহত্যার বিরুদ্ধে আদেশ দিয়াছিলেন। পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় ছিল।

সাম্রাজ্য-সীমা

শাসনের সুব্যবস্থা

জনহিত

খ্রীঃ পূঃ ২৩২ অব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে অশোকের মৃত্যু হয়।

অশোকের অসাধারণত্ব।—পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের মতো
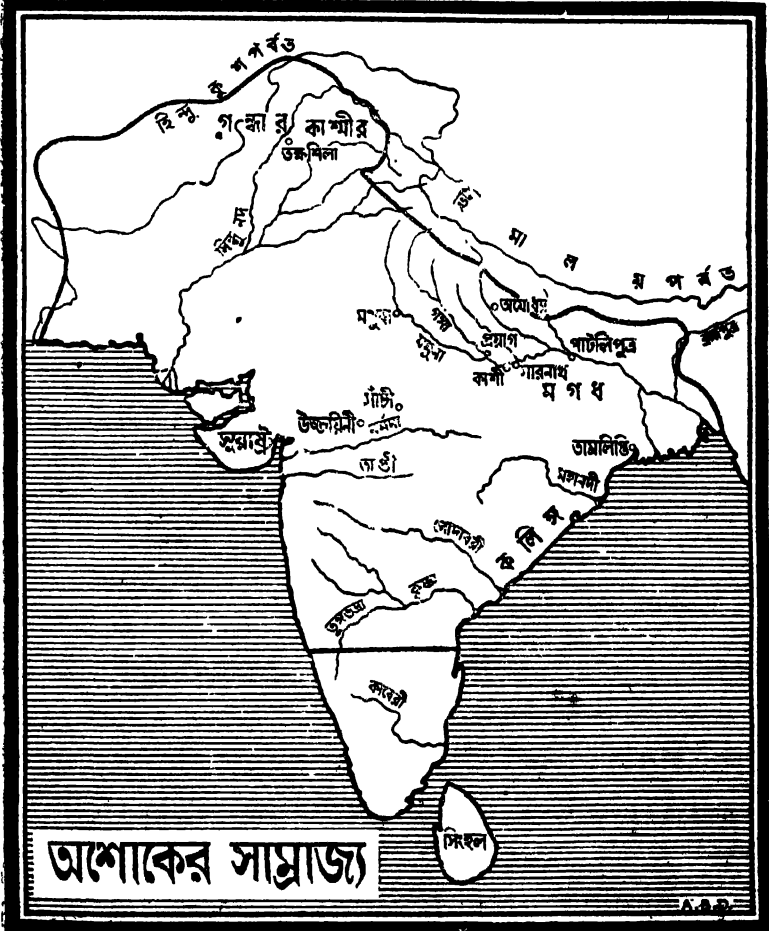
রাজার তুলনা মেলে না। তিনি পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে যে বিশাল সাম্রাজ্য ও দুর্জয় সৈন্যবাহিনীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে

তিনি দরয়বৌস, ক্ষয়ার্ষ, (জেরেক্সাস), আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, এটিলা, চেঙ্গিস খান বা তৈমুরলঙ্গের মতো পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু ধনদৌলত অর্জনে এবং সাম্রাজ্য স্থাপনে যে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না, উহা যে মানব জাতির কল্যাণের পথ নহে, তাহা তিনিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণের মধ্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি এমন উপায়ে বিশ্বজয় করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে হিংসা, রক্তক্ষয়, মৃত্যু ও রোদন নাই, যাহাতে ত্যাগ, প্রেম ও অহিংসাই একমাত্র পথ। অশোকের এই বিজয়-অভিযান সার্থকও হইয়াছিল। অশোক যে ধর্মবিজয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী সম্রাট ও মনীষিগণের চেষ্টায় তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তাই আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্রে দীক্ষিত। অশোকের ধর্মবিজয় অশোককে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী করিয়াছে, তাহা কোনও আলেকজাণ্ডার, কোনও জুলিয়াস সীজার, কোনও চেঙ্গিস খানের ভাগ্যে ঘটে নাই।

দিগ্‌বিজয়ী অশোক

অশোক বৌদ্ধধর্মকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরণ প্রায় সন্ন্যাসীর মতোই তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া যান নাই। রাষ্ট্র-শক্তিকেই তিনি মানব কল্যাণের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি এ কথা ভালো করিয়াই জানিতেন যে, ধর্মাচরণ কখনও ব্যক্তিগত হইতে পারে না, সমগ্রের কল্যাণেই প্রকৃত ধর্মাচরণ হয়। সেজন্য সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রজার, প্রতিটি জীবের, কল্যাণ সাধনকেই তিনি প্রকৃত ধর্মাচরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি কেবল মহারাজ ছিলেন না, ছিলেন মহারাজর্ষি।

রাজর্ষি অশোক

রাষ্ট্রব্যবস্থায় অশোক ধর্মকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছিলেন, ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মের গোঁড়ামি বা ধর্মপ্রচারকের উগ্রতা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী এবং বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি

তাঁহার শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ন ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহার নিকট অকৃপণ স্নেহ লাভ করিত, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে অশোক কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। শক্তিশালী খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্রাটগণ ধর্মপ্রচারের জন্য যে অনুদার, এমন কি অনেক সময় নিষ্ঠুর মনোভাব দেখাইতেন, তাহা কখনই অশোকের সুমহৎ চরিত্রকে স্পর্শ করে নাই। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও পৃথিবীর ইতিহাস-রচয়িতা এস. জি. ওয়েল্‌স্‌ যে অশোককে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নহে।

পরমধর্মসহিষ্ণু অশোক

মৌর্য যুগে শাসনব্যবস্থা।—মৌর্য যুগের ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা মেগাস্থিনিস প্রভৃতি বৈদেশিক লেখকগণের রচনা, "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" প্রভৃতি সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক ভারতীয় রচনা এবং বিভিন্ন লিপি হইতে সংগ্রহ করিতে পারি।

মৌর্য সাম্রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য রক্ষার জন্য মৌর্য সম্রাটগণ এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" হইতে জানা যায়, সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। রাজবংশীয়রাই সাধারণত প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। প্রদেশগুলি জেলায় এবং জেলাগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। জেলাগুলির শাসনভার "স্থানিক" এবং গ্রামগুলির শাসনভার "গ্রামিক" নামে রাজকর্মচারিগণের উপর ন্যস্ত থাকিত। গ্রামিকগণ শাসনকার্যে গ্রামবৃদ্ধদের পরামর্শ লইতেন।

আঞ্চলিক বিভাগ

শাসন বিষয়ে সম্রাটই ছিলেন সর্বময় কর্তা। তবে তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না। তিনি মন্ত্রী ও অমাত্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। "মন্ত্রিপরিষদ্‌" নামে একটি সভাও থাকিত। জরুরী অবস্থায় সম্রাট মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইতেন। মৌর্য যুগে রাজতন্ত্র খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিলেও প্রজাপুঞ্জকে অস্বীকার করা হইত না। রাজ্যশাসন বিষয়ে সম্রাট প্রচলিত প্রথা, নিয়ম ও জনমত

সম্রাটের অধিকার ও কর্তব্য

মানিয়া চলিতেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার চালানো কাহারও একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিভিন্ন বিভাগের কর্মভার এক-একজন প্রধান পরিচালক বা অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ২৮ জন অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। সমর বিভাগের অধ্যক্ষকে "বলাধ্যক্ষ" এবং রাজধানীর শাসনভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষকে "নগরাধ্যক্ষ" বলা হইত। মেগাস্থিনিসও অধ্যক্ষদের উল্লেখ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের শাসনকার্য ঠিকমতো চলিতেছে কিনা দেখিবার জন্য "মহামাত্র" এবং "রাজুক" নামক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্রাটকে জানাইবার জন্য "প্রতিবেদক" নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। রাজ্যময় অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিত। সম্রাটের একদল নারী প্রহরীও ছিল।

রাজকর্মচারিগণ

গ্রীক ও রোমক লেখকগণের রচনা হইতে জানা যায়, মৌর্য সম্রাটগণের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। সম্রাটগণ নিজেরাই যুদ্ধে যাইতেন। তবে সৈন্য-পরিচালনার জন্য সেনাপতিও থাকিতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীর ভার ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার উপর ন্যস্ত থাকিত। পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতি গঠিত হইত এবং ঐ ছয়টি সমিতির উপর পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী, হস্তী ও নৌ-বাহিনী এবং রসদ ও যানবাহনের ভার থাকিত। অশোকের সময়ে সৈন্য-বাহিনীর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল।

সামরিক বিভাগ

বিধান ও বিচার বিভাগেরও সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট। তাঁহার আদেশই সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান ছিল। শহরে মহামাত্রগণের উপর এবং গ্রামাঞ্চলে রাজুকগণের উপর বিচারের ভার ছিল। গ্রামিকগণও গ্রামবৃদ্ধদের সাহায্যে মামলার বিচার করিতেন। বিচারকার্যে রাজুকগণের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে অবিচারও ঘটিত। বিচারকগণের এইরূপ যথেচ্ছাচার দূর করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সাম্রাজ্যময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বিচার ব্যবস্থা

মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্তের আমলে অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর ছিল। কেহ অপরের অঙ্গচ্ছেদ করিলে অপরাধীর সেই অঙ্গ এবং তৎসহ একটি হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। শুল্ক বা বিক্রয় কর সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দিলে প্রাণদণ্ড হইত। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। কেহ শ্রমিকের হস্ত বা চক্ষু নষ্ট করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইত। শাস্তির কঠোরতা থাকায় দেশে অপরাধের সংখ্যা খুব কম ছিল। তবে অহিংসার পূজারী অশোক দণ্ডের এই কঠোরতা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিলেন।

শাস্তির কঠোরতা

মৌর্য আমলে পৌর শাসন ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, রাজধানী পাটলিপুত্রই সাম্রাজ্যের বৃহত্তম নগর ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থ পৌনে দুই মাইল। উহার চারিদিকে প্রশস্ত পরিখা ও প্রাচীর ছিল। পরিখাটি দুই শত গজ প্রশস্ত এবং পনের গজ গভীর ছিল। প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ এবং ৫৭০টি শিখর ছিল। রাজধানীর পৌরব্যবস্থা ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার উপর ন্যস্ত থাকিত। পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতি গঠিত হইত। বিভিন্ন সমিতির উপর পৌরব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের ভার থাকিত। রাজধানীর শাসনকার্য "নগরাধ্যক্ষ" নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পরিচালনা করিতেন। সাম্রাজ্যে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি আরও অনেক বড় শহর ছিল। সেগুলিতেও সম্ভবত রাজধানীর মতো পৌরসভা ছিল। সেগুলির শাসনভার "নগরক" নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত।

পৌরশাসন-ব্যবস্থা

এই সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। ঐ অর্থের একটি মোটা অংশ রাজস্ব হইতেই আসিত। রাজস্বকে "ভাগ" (রাজার অংশ) বলা হইত। কৃষকরা সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ "ভাগ" হিসাবে দিত। প্রয়োজন হইলে উহার পরিমাণ বাড়াইয়া এক-চতুর্থাংশ বা কমাইয়া এক-অষ্টমাংশও করা হইত। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শুল্ক ও বিক্রয় কর আদায় করা হইত।

রাজস্ব ও কর

মৌর্য যুগে সমাজ-ব্যবস্থা।—মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, মৌর্য যুগে জনসাধারণ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :—(১) দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ); (২) কৃষক; (৩) শিকারী ও পশুপালক; (৪) শ্রমশিল্পী ও ব্যবসায়ী; (৫) সৈনিক; (৬) গুপ্তচর ও (৭) আমাত্য।

কৃষক শ্রমিক ও শিকারী

পেশার দিক হইতে এই বিভাগকে অনেকখানি নির্ভুল বলিয়া ধরা যায়। দেশে কৃষকের সংখ্যাই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। মৌর্য যুগে কৃষকদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যের অতি প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে গণ্য করা হইত। তাঁহারা যুদ্ধ এবং অন্যান্য কার্য করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত ছিলেন। পশুপালন এবং শিকারকেও অতি প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গণ্য করা হইত। কৃষিক্ষেত্রে ও লোকালয়ে বন্য জন্তুরা আসিয়া যাহাতে উপদ্রব না করে, শিকারীরা সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। সেজন্য তাঁহারা সরকার হইতে অর্থ-সাহায্য পাইতেন। তবে অশোক শিকার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সকল শ্রমশিল্পী কৃষকদের যন্ত্রপাতি এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, সরকার হইতে তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত। সমাজে স্বাধীন কৃষক ও স্বাধীন শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল অধিক।

ক্রীতদাস প্রথা

মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছিলেন যে, তৎকালীন ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল না। একথা সত্য নহে। অশোক তাহার লিপিতে ক্রীতদাসের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। বিন্দুসার সিরিয়ার গ্রীক রাজাকে একজন দার্শনিক ক্রয় করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তবে গ্রীসের মতো প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা অমন ব্যাপক ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নাই বলিয়াই মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন।

মৌর্য যুগে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্ম পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। আজীবিক প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়গুলির প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে হিন্দুধর্মের যাগযজ্ঞ, বলিদান ইত্যাদি অনেকাংশে হ্রাস

ধর্মসম্প্রদায়

পাইয়াছিল। বর্ণভেদের কঠোরতাও ছিল না। ব্রাহ্মণরাও যুদ্ধ করিতেন। মৌর্য সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে ভারতীয়দের খুবই প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ভারতবাসীরা অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেন, যজ্ঞের সময়ে ভিন্ন মদ্যপান করিতেন না, মিথ্যাকথা বলিতেন না, চুরি-ডাকাতি করিতেন না। এই উক্তি কিছুটা অতিরঞ্জিত হইলেও অনেকাংশে সত্য ছিল। কৃষকগণ পরিশ্রমী, সংযমী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। ভারতবাসিগণ শৌখিন ও অলংকারপ্রিয় ছিলেন। নাগরিকগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজপথে বাহির হইতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেব সঙ্গে ছত্রধারী অনুচর থাকিত।

ভারতীযদের চরিত্র

কোনও কোনও গ্রীক লেখক বলিয়াছেন যে, তৎকালীন ভারতীয়গণ অক্ষরের ব্যবহার জানিতেন না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভারতীয় জনসাধারণ যদি অক্ষরের ব্যবহার না জানিতেন, তবে অশোক কাহাদের জন্য তাঁহার অসংখ্য ধর্মলিপি রচনা করাইয়াছিলেন? লিপিগুলি পাঠ করিবার উপযোগী শিক্ষা নিশ্চয় জনসাধারণের ছিল। অর্থাৎ দেশে ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষা ও লিপিব ব্যবহাব

অশোকের লিপি হইতে জানা যায়, জনসাধারণের মধ্যে "সমাজ" নামে উৎসব প্রচলিত ছিল। সমাজগুলি ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইত। সেগুলির প্রধান আকর্ষণ ছিল নৃত্য-গীত। কোনও কোনও "সমাজে" মানুষ ও জীবজন্তুর লড়াই দর্শকদের আনন্দবর্ধন করিত। সম্ভবত তাহাতে প্রচুর রক্তপাত ঘটিত। তাই অশোক তাঁহার লিপিতে কয়েক ধরনের "সমাজ" নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পতঞ্জলির রচনা হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে এক ধরনের অভিনয়ও প্রচলিত ছিল। অভিনেতারা "শৌভিক" ও "শৌভনিক" নামে পরিচিত ছিলেন। রথদৌড়, হাতীর লড়াই, পাশা খেলা ও দাবা খেলা (অষ্টপদ) সুপ্রচলিত ছিল।

উৎসব ও আমোদ-প্রমোদ

মৌর্য যুগে শিল্প-কলা।—মৌর্য যুগে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ঐ সময়ে গৃহাদি প্রায়ই কাষ্ঠনির্মিত হইত। তাই সেগুলির ধ্বংসাবশেষ এখন বর্তমান নাই। চন্দ্রগুপ্তের কাষ্ঠনির্মিত বিরাট প্রাসাদ দেখিয়া মেগাস্থিনিস বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাটনার নিকটবর্তী কুমরাহরে যে রাজপ্রাসাদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদেরই ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ঐ ধ্বংসাবশেষ হইতে জানা যায়, উহাতে সারি সারি সু-উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ ছিল এবং মেঝেগুলি ঠাসাঠাসি কাঠ দিয়া প্রস্তুত ছিল। অনেক ঐতিহাসিক উহাতে পারসিক স্থাপত্যরীতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেকে মৌর্য যুগের স্তম্ভময় এই প্রাসাদকে প্রাচীন পারস্যের রাজধানী পার্সেপোলিসের বিখ্যাত শতস্তম্ভ প্রাসাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অশোকের যুগে স্থাপত্যশিল্পে প্রস্তরের ব্যবহার

স্থাপত্য
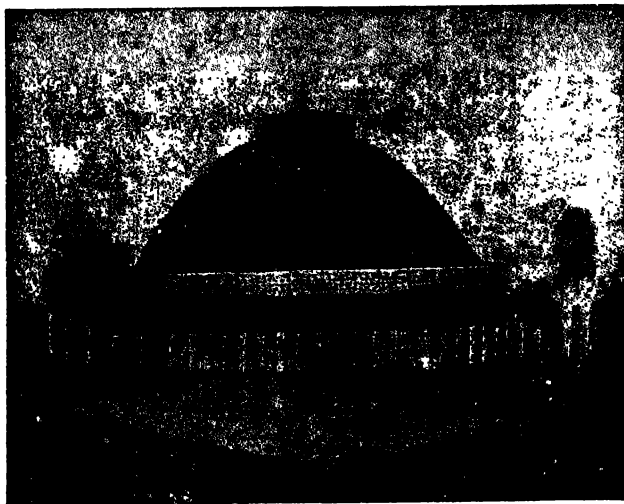
অশোক-নির্মিত সাঁচী স্তূপ

অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছিল। তাঁহার প্রাসাদটি প্রস্তরনির্মিত ছিল। প্রায় ছয় শতাব্দী বাদে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ঐ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "ইহা মনুষ্যনির্মিত নহে, ইহা

দানবের রচনা।" মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা আগেই বলা হইয়াছে।
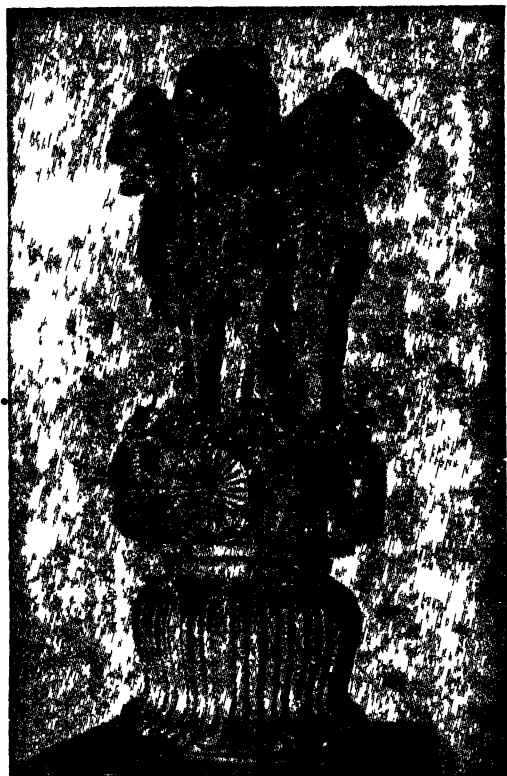
সারনাথের অশোকস্তম্ভের শীর্ষ

ঐ সময় কেবল পাটলিপুত্র নহে, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী ও কৌশাম্বীর মতো বহু সুবৃহৎ শহর দেশে বর্তমান ছিল। মৌর্য যুগে স্থাপত্যশিল্প যে খুবই উন্নত হইয়াছিল, তাহা এই শহরগুলি হইতেই বোঝা যায়।

নগরনির্মাণ

অশোক কেবল পাটলিপুত্রেরই শ্রীবৃদ্ধি করেন নাই, তিনি কাশ্মীরের শ্রীনগর এবং নেপালের দেবপত্তন শহরও প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। তিনি দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার (প্রবাদ অনুসারে, সংখ্যায় ৮৪০০০) নির্মাণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরেই তিনি পাঁচশত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। প্রায় আট শত বৎসর পরে, চীনা

লৌরিয়া নন্দনগড়ের অশোক স্তম্ভ

পরিব্রাজক ইউয়ান চোযাং ভারতে আসিয়া কাশ্মীরে অশোক-নির্মিত প্রায় একশত বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সকল নগর, প্রাসাদ ও বিহার নির্মাণ যে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অশোক-স্তম্ভগুলি ঐ যুগের শিল্প-কীর্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ঐগুলি এক-একটি আস্ত পাথর দিয়া নির্মিত। ঐগুলির অলংকরণ ও মসৃণতা অত্যন্ত

উচ্চশ্রেণীর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মৌর্যযুগের শিল্পিগণ যে কিরূপে প্রস্তরের এই মসৃণতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক ইউরোপীয় স্থপতিরাও ভাবিয়া পান না। এই সকল স্তম্ভের মসৃণতা এমনই বিস্ময়কর যে, অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ঐগুলিকে প্রস্তর-নির্মিত বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ঐগুলিকে টম কোরিয়েট ও হুইটটেকার তাম্র-নির্মিত, টেরি মর্মর-নির্মিত এবং বিশপ হেবার ধাতু-নির্মিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ভাস্কর্য

একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে এই বিশাল স্তম্ভগুলি যে কিভাবে নির্মিত হইয়া যথাস্থানে স্থাপিত হইত, তাহা আজও রহস্যময় রহিয়াছে। এগুলির উচ্চতা প্রায় বিশ ফুট এবং ওজন প্রায় ৫০ টন। লৌরিয়া নন্দনগড়, এলাহাবাদ, রুম্মিন দেই, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে বহু স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলির অধিকাংশ ভগ্ন হইলেও সেগুলির নির্মাণ-কৌশল ও কারুকার্য দেখিয়া আজও বিস্মিত হইতে হয়। স্তম্ভ-শীর্ষে নির্মিত জীবজন্তুর মূর্তিগুলিও ঐ যুগের উন্নত ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অন্যান্য নকশা ও কারুকার্যগুলিও অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অশোক যে সকল স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর দিয়া নির্মিত ছিল। সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপটি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্তূপগুলির গঠন ও অলংকরণ আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মৌর্য যুগে শিল্পকলা যে অসামান্য উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশ্নাবলী

1. When did Alexander invade India ? What do you know of his invasion ? Who gave him a bold resistance in India ? What were the direct and indirect results of his invasion in the history of India ?

আলেকজাণ্ডার কখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ? তাঁহার ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান ? ভারতে কে তাঁহাকে দুঃসাহসের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ?

2. Give a short account of the administrative system of the Mauryas and mention the sources from which we derive our informations. Describe the social and cultural condition of India under the Mauryas.

মৌর্যগণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং যে সকল সূত্র হইতে তাহা জানা যায়, সেগুলির উল্লেখ কর। মৌর্য যুগে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

3. Who was the founder of the Maurya dynasty? From what sources can you derive informations about him? What do know of his achievements?

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? কি কি সূত্র হইতে তাঁহার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়? তাঁহার কীর্তি সম্পর্কে কি জান?

4. Describe the event that turned the attention of Asoka from territorial conquest to religious conquest. What did Asoka do for the propagation of Buddhism in and outside India? Why has he been called the greatest monarch of all times? Was he responsible to any extent for the downfall of Maurya Empire?

যে ঘটনা রাজ্যজয় ত্যাগ করিয়া ধর্মীয় জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে অশোককে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর। ভারতে ও ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য অশোক কি করিয়াছিলেন? তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন? মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি কি কিছু পরিমাণে দায়ী ছিলেন?

মৌর্যগণের বংশতালিকা

কালরেখা (আনুমানিক)
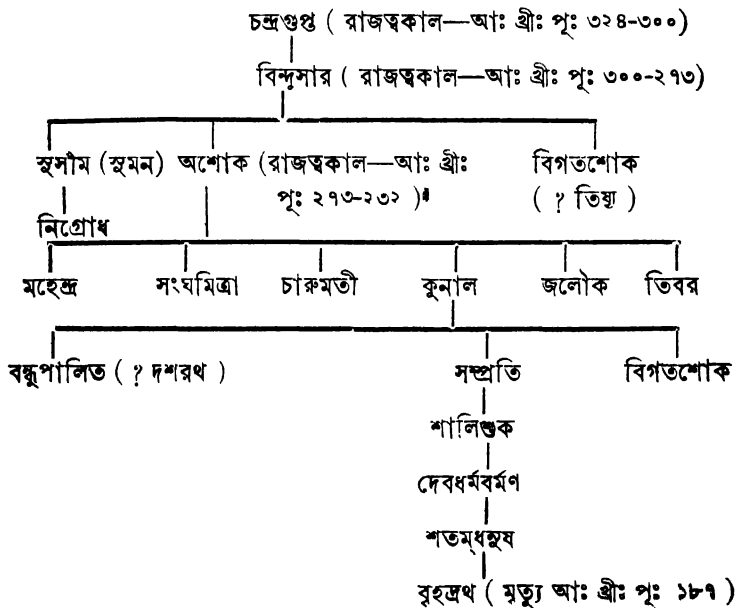
মহেন্-জো-দড়ো হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত

খ্রীঃ পূঃ ৩০০০——সিন্ধু সভ্যতা

খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—
—আর্যদেব আগমন
খ্রীঃ পূঃ ২০০০—

—ঋগ্‌বেদের রচনা
থ্রীঃ পূঃ ১৫০০—

খ্রীঃ পূঃ ৫২২——দবাযুসেব সিংহাসন লাভ

খ্রীঃ পূঃ ৫০০—
খ্রীঃ পূঃ ৪০০—
মহাবীর, বুদ্ধ, বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অজাতশত্রু

খ্রীঃ পূঃ ৩২৭-৩২৬—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

খ্রীঃ পূঃ ৩২৪——মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত

মৌর্য যুগ

খ্রীঃ পূঃ ৩২৪—চন্দ্রগুপ্তের

খ্রীঃ পূঃ ৩০৫——সেলুকাসের পরাজয়

খ্রীঃ পূঃ ২৭৩——অশোকের সিংহাসন লাভ

খ্রীঃ পূঃ ২৬১—কলিঙ্গ-বিজয়

খ্রীঃ পূঃ ২৩২—অশোকের মৃত্যু

খ্রীঃ পূঃ ২০০——সাতবাহনগণের অভ্যুত্থান

খ্রীঃ পূঃ ১৮৭——বৃহদ্রথের মৃত্যু ও শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৌর্যোত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য—
পুনরায় বৈদেশিক আক্রমণ

Syllabus : *Foreign invasions and cultural impact.*

Fall of the Maurya Empire—the Sungas and Kanvas in the North and the Satavahanas in Central and South India—beginning of Puranic Hinduism.

Foreign invaders—Bactrian Greeks—the new cultural impact—Gandhara art—Greek influence on coins. The Parthians—the Sakas—the Kusanas.

The Kusan Dynasty—Kanishka—emergence of Mahayana Buddhism—The Buddhist Council—Asvaghosa, Jivaka, Panini, Patanjali, Gunadhya, Charaka, etc. Taxila University. Relations with the neighbouring countries, specially China.

Missionary activities abroad—export of art forms to China and Central Asia—Social changes—deterioration of the status of woman.

Expansion of trade in the Mauryan and Post-Mauryan Periods—beginning of trade with Rome—some routes and ports.

পাঠসূচী : বৈদেশিক আক্রমণ এবং সাংস্কৃতিক সংঘাত। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন—উত্তর ভারতে শুঙ্গ ও কাণ্বগণ এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনগণ—পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ—বাহ্লীক গ্রীকগণ—নূতন সাংস্কৃতিক সংঘাত—গান্ধার শিল্প—মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব। পহ্লবগণ—শকগণ—কুষাণগণ।

কুষাণ রাজবংশ—কণিষ্ক—মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান—বৌদ্ধ সংগীতি—অশ্বঘোষ, জীবক, পাণিনি, পতঞ্জলি, গুণাঢ্য, চরক প্রভৃতি। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত, বিশেষত চীনদেশের সহিত, সম্পর্ক। বিদেশে ধর্মপ্রচারকার্য—চীন ও মধ্য এশিয়ায় শিল্পরীতির প্রসার—সামাজিক পরিবর্তন—সমাজে নারীর স্থান, অধিকার ও মর্যাদা হ্রাস।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ—রোমের সহিত বাণিজ্যের সূত্রপাত—কতিপয় পথ ও বন্দর।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন।—অশোকের মৃত্যু হইলে সম্ভবত তাঁহার পুত্র কুনাল পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, অশোকের পর জলৌক নামে তাঁহার এক পুত্র কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন, অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জলৌকের অধিকারে গিয়াছিল। সম্ভবত অল্পদিনের মধ্যে দক্ষিণ ভারতও পাটলিপুত্রের শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছিল। কলিঙ্গে চেতবংশীয় এবং মহারাষ্ট্রে অন্ধ্র-সাতবাহনবংশীয় রাজগণ স্বাধীন ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদর্ভও (বর্তমান বেরার) স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। এইভাবে অশোকের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের আয়তন ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

মগধ সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস

অশোকের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই অযোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িতেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীকগণ আসিয়া পুনরায় হানা দিতেছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যগুলিও মগধ সাম্রাজ্যের উপর চাপ দিতেছিল। এই সুযোগে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সৈন্যদের সাক্ষাতেই অশোকের শেষ বংশধর রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ১৮৭)। এইভাবে অশোকের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ বৎসরের মধ্যেই মৌর্য শাসনের অবসান হইল।

অশোকের বংশধরগণের অযোগ্যতা

মৌর্যবংশের অবসান

শুঙ্গ বংশ।—শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সম্ভবত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে পাঞ্জাবের জালন্ধর ও শিয়ালকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাটলিপুত্রে তাঁহার প্রধান রাজধানী থাকিলেও পূর্ব মালবের বিদিশা নগর (বর্তমান বেসনগর) দ্বিতীয় রাজধানীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেখানে তাঁহার পুত্র যুবরাজ অগ্নিমিত্র থাকিতেন। এই

অগ্নিমিত্রই মহাকবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকের নায়করূপে অমর হইয়াছেন। শেষ মৌর্য রাজগণের আমলে বিদর্ভ (বেরার) স্বাধীন হইয়াছিল। অগ্নিমিত্র বিদর্ভকে মগধের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এই সময়ে সিরীয় ও বাহ্লীক (Bactrian) গ্রীকগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিতেছিল। বাহ্লীক গ্রীকরাজ দিমিত্রিয়সের (মতান্তরে মিনন্দরের) বিজয়-বাহিনী ঐ সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। গ্রীকগণ অযোধ্যা এবং মধ্যমিকা (বর্তমান চিতোরের নিকটবর্তী নগরী) অবরোধ করিয়াছিল। এমন কি রাজধানী পাটলিপুত্রও বিপন্ন হইয়াছিল। এই সংকট-মুহূর্তে যুবরাজ অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইভাবে উত্তর ভারতে পুষ্যমিত্রের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র তাঁহার বিজয় ও একাধিপত্য ঘোষণার জন্য পর পর দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাতে উত্তর ভারতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানও সূচিত হয়। পুষ্যমিত্র প্রায় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বিখ্যাত বৈয়াকরণ পতঞ্জলি জীবিত ছিলেন। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র রাজা হন। অগ্নিমিত্রের পরবর্তীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তাহাদের কাহারও সময়ে কলিঙ্গরাজ খারবেল মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অগ্নিমিত্র

গ্রীক আক্রমণ

কাণ্ববংশ।—শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব মগধের রাজা হন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৭৫)। বাসুদেব-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কাণ্ববংশ নামে পরিচিত। কাণ্বগণের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের সাতবাহনগণের আক্রমণের ফলে কাণ্ব বংশ লোপ পাইয়াছিল (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০)।

সাতবাহনগণ।—উত্তর ভারতে মৌর্যদের পতনের সুযোগে যেমন শুঙ্গগণের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তেমনি দক্ষিণ ভারতে হইয়াছিল সাতবাহন রাজগণের। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গোদাবরী-তীরবর্তী প্রতিষ্ঠান-নগরকে (বর্তমান পৈঠান) কেন্দ্র করিয়াই সাতবাহন রাজ্যটি গড়িয়া

উঠিয়াছিল (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০)। সাতবাহনগণকে পুরাণে "অন্ধ্র" বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ্রগণের বাসস্থান ছিল দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলে—কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। তাই সাতবাহনগণ প্রকৃতপক্ষে অন্ধ্র ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাতবাহনগণ সম্ভবত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সিমুক। সিমুকের পুত্র প্রথম শাতকর্ণির রাজত্বকালে সাতবাহন রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুর পর সাতবাহনগণ সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়েন। এই সময়ে (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৭৫) শকগণ দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করায় সাতবাহন-গণের অধিকার সম্ভবত তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির (আঃ ১০৬-১৩০ খ্রীঃ অঃ) নেতৃত্বে সাতবাহনগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার হস্তেই ক্ষহরাট-বংশীয় বিখ্যাত শকরাজ নহপান পরাজিত হন। মহারাষ্ট্র, কোঙ্কান, নর্মদার তীরবর্তী অঞ্চল, সুরাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব ও রাজপুতানার কতকাংশ শাতকর্ণির সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি যে সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর উজ্জয়িনীতে রুদ্রদামনের নেতৃত্বে শকগণের অভ্যুত্থানের ফলে সাতবাহন বংশ ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে। সাতবাহনগণ প্রায় চারি শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান।—বৈদিক যুগের শেষভাগে যাগ-যজ্ঞে পূর্ণ অনুষ্ঠানসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ফলে একদিকে যেমন বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। যাগযজ্ঞ বা ব্রহ্মচিন্তা পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের মূলকথা ছিল না। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তি পূজা এবং উপাসনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। বৈদিক যুগে যেসব দেবতা প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাধান্য হারাইয়াছিলেন এবং নূতন এক শ্রেণীর দেবতা ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন। এখন বৈদিক যুগের ইন্দ্র, মিত্র (সূর্য), বরুণ,

নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) প্রভৃতি দেবতারা পিছনে সরিয়া গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকেই প্রধান দেবতার আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে অনার্য ধর্মের প্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইল শিবের অধিকতর প্রাধান্য লাভ ও দেবদেবীর মূর্তি পূজা। বৈদিক আর্যগণ দেবদেবীর মূর্তি গড়াইয়া পূজা করিতেন না। কিন্তু আর্যপূর্ব ভারতীয়গণ তাহা করিতেন। তাহার

অনার্য প্রভাব

প্রমাণ মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত অসংখ্য দেবমূর্তির মধ্যে রহিয়াছে। যোগী পশুপতির এবং দুর্গাব অনুরূপ দেবদেবীর পূজার কথাও মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা হইতে জানা গিয়াছে। পৌরাণিক যুগে শিব কেবল অন্যতম দেবতাই ছিলেন না, তিনি "মহাদেবে" পরিণত হইয়াছিলেন। সিন্ধু সভ্যতাব পশুপতি ও বৈদিক রুদ্র দেবতার মিশ্রণে মহাদেবের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। মহাদেবের স্ত্রী পার্বতী উমাও পরম আরাধ্যা আদ্যা শক্তিরূপে পূজিতা হইতেছিলেন। শিব ও পার্বতীব পুত্র গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ও দুই প্রধান দেবতারূপে স্থান পাইয়াছিলেন। পৌবাণিক ধর্মে গ্রীক প্রভাবও অনস্বীকার্য। গ্রীক প্রভাবেই মূর্তিশিল্প বিকাশলাভ করিয়াছিল।

পৌরাণিক ধর্ম অনার্য ও গ্রীক প্রভাবে প্রভাবিত হইলেও বৈদিক যাগযজ্ঞেব মধ্যেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল মনে বাখিতে হইবে। প্রাচীন রাজারা যখন রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন, তখন সেই বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানে দশদিন উক্ত রাজবংশেব পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা গীত হইত। কুরু

পুরাণ ও মহাকাব্য

ও কোশল বাজগণের যজ্ঞানুষ্ঠানে গীত কীর্তিকাহিনীই ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া "মহাভারত" ও "রামায়ণ" নামে ভাবতের প্রাচীনতম দুই মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছিল। এই মহাকাব্যগুলি প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: (১) ইতিহাস ও পুরাণ এবং (২) কাব্য। এই দুইভাগে কেবল প্রাচীন ইতিহাস, রাজরাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহ, সামাজিক রীতিনীতি ও অবস্থার কথাই বর্ণিত হইত না। ইহাতে দেবদেবীর বিবরণ ও কীর্তিকথাও থাকিত। মহাভারতে কৃষ্ণকে এবং রামায়ণে রামকে যেমন বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, তেমনি

শিবকেও একটি প্রধান আসন দেওয়া হইয়াছিল। মহাভারতে ও রামায়ণে এই সকল দেবদেবীর কীর্তিকথা থাকিলেও পরে তাহা অষ্টাদশ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছিল। তাই দেবদেবী পূজার এই ধর্ম "পৌরাণিক হিন্দুধর্ম" নামেই পরিচিত হইয়াছে।

গুপ্তযুগে মহাকাব্য ও পুরাণগুলির রচনা সমাপ্ত হইলেও তাহা যে বহু পূর্বেই শুরু হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে ডিওনিসাস ও হেরাক্লিস বলিয়া যে দুই প্রধান ভারতীয় দেবতার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে শিব ও বিষ্ণু বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। অশোকের লিপি হইতে জানা যায়, অশোকের রাজত্বকালে "সমাজ" নামে যে উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানত ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি তাঁহার "মহাভাষ্য" গ্রন্থে বলেন যে, মৌর্যগণ শিব ও স্কন্দের (কার্ত্তিকেয়ের) মূর্তি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ইহা হইতেও সহজেই বোঝা যায়, পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম মৌর্য যুগে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে পৌরাণিক ধর্ম

মহারাজ অশোক নিজেকে কেবল 'দেবানাম পিয়" বলিয়া আখ্যাত করেন নাই, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে শিবের উপাসক ছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। অশোকের বংশধর জলৌক শৈব ছিলেন। কুষাণরাজগণের মধ্যে অনেকেই যে শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহাদের শিবমূর্তি বা ত্রিশূল চিহ্নিত মুদ্রাগুলি হইতে বোঝা যায়। শিবের মতোই বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও সুপ্রচলিত ছিল।

পৌরাণিক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ। বৈদিক হিন্দুধর্মে এই দুইটি বিষয়ই অপ্রচলিত ছিল। আর্যপূর্ব ভারতীয়গণ দেবদেবীর মূর্তি রচনা করিলেও মন্দির নির্মাণ করিতেন বলিয়া জানা যায় নাই। মন্দিরময় ভারত যে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মেরই দান, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয়। গোড়ার দিকে সম্ভবত মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা

মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ

দেবদেবীর মূর্তিগুলি নির্মিত হইত, তাই সেগুলি স্বভাবত নিশ্চিহ্নভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল। তবে বেসনগর (বিদিশা), মথুরা প্রভৃতি স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব যুগের প্রস্তরনির্মিত কিছু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বেসনগরে কানিংহাম যে প্রাচীন দেবীমূর্তিটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ "শ্রী"-র (লক্ষ্মীর) মূর্তি বলিয়াই মনে করেন। মথুরা মিউজিয়ামে বলরামেরও একটি সুপ্রাচীন মূর্তি রহিয়াছে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে উৎকীর্ণ একটি প্রাচীন লিপি হইতে জানা যায় যে, তোষা নাম্নী কোনও এক মহিলা পঞ্চ যাদব বীরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া একটি সুন্দর প্রস্তরনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ঐ যুগের কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও আবিষ্কৃত না হইলেও ঐ সময়ে মন্দির নির্মাণ যে প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহা বোঝা যায়।

পৌরাণিক হিন্দুধর্মই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রভাব বৌদ্ধধর্মও এড়াইতে পারে নাই। ইহার প্রভাবেই "মহাযান" বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম শিল্প-সাহিত্যের দিক হইতেও ভারতবাসীর চিত্তে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল। ভারতের সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় ও সংগীতে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের দান অতুলনীয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইহার প্রভাব

গ্রীকগণের পুনরায় ভারত আক্রমণ।—অশোকের সময়ে পশ্চিম এশিয়াস্থ গ্রীক সাম্রাজ্যে সেলুকাসের পৌত্র দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস রাজত্ব করিতেছিলেন। সিরিয়াই এ গ্রীক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। সিরীয় গ্রীক সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে পার্থিয়া এবং তাহার পূর্বে আমু দরিয়া নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যে বাকৃট্রিয়া নামে দুইটি অঞ্চল অবস্থিত ছিল। পার্থিয়া পারদ বা পহ্লব এবং বাকৃট্রিয়া বাহ্লীক (বল্‌খ্‌) নামেও পরিচিত। সিরিয়ার সেলুকাসবংশীয়গণের দুর্বলতার সুযোগে বাকৃট্রিয়া ও পার্থিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাসের প্রপৌত্র তৃতীয় অ্যান্টিওকাস কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তীদের মতো দুর্বল ছিলেন না। তিনি সিরীয় গ্রীক সাম্রাজ্যকে

তৃতীয় অ্যান্টিওকাস

পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। পার্থিয়া তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু বাক্ট্রিয়ার স্বাধীন গ্রীক রাজা ইউথিডেমস তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তৃতীয় অ্যান্টিওকাস দুই বৎসর বল্‌খ্‌ অবরোধ করিয়া রাখিবার পর সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং ইউথিডেমসের পুত্র দিমিত্রিয়সের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিলেন। অ্যান্টিওকাস ফিরিবার পথে হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারতীয় রাজ্য আক্রমণ করিলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২০৬)। ঐ সময়ে গান্ধার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুভাগসেন নামে এক ভারতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। অ্যান্টিওকাস সুভাগসেনের নিকট হইতে পাঁচ শত হস্তী আদায় করিয়া সিরিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। এইভাবে সিরীয় গ্রীকগণের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পাইল।

কিন্তু বাহ্লীকগণ নীরব রহিলেন না। ইউথিডেমসের পুত্র দিমিত্রিয়স শীঘ্রই আফগানিস্থানের অনেকাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করিলেন। এই

দিমিত্রিয়সের মুদ্রা

সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে বাক্ট্রিয়ায় ইউক্রাটাইডিস নামে তাঁহার এক গ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বীর উদয় হইল। ইউক্রাটাইডিস ভারত সীমান্ত পর্যন্ত অনেকখানি রাজ্য জয় করিয়া লইলেন। দিমিত্রিয়সকে এখন তাঁহার নববিজিত ভারতীয় রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট রহিতে হইল। তাঁহার নূতন রাজধানী হইল শাকলে (পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে)। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, পুষ্যমিত্রের আমলে তাঁহার বিজয়বাহিনীই পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রাতেই সর্বপ্রথম একই সঙ্গে গ্রীক ও ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

দিমিত্রিয়স

প্রাচীন মুদ্রা হইতে বহু বাহ্লীক গ্রীক রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। ভারতে বাহ্লীক গ্রীক রাজাদের মধ্যে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মিনন্দর। তিনি ইউথিডেমসের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই। তাঁহার সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক লেখক স্ট্রাবো বলিয়াছিলেন যে, তিনি আলেকজাণ্ডারের অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক জাতিকে পদানত করিয়াছিলেন। গ্রীক লেখক প্লুটার্ক তাঁহাকে "বহু নগরের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বে বুন্দেলখণ্ড হইতে পশ্চিমে কাবুল পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, পুষ্যমিত্রের আমলে তিনিই পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগসেন-রচিত "মিলিন্দ পঞ্হো" (মিলিন্দ-প্রশ্ন) নামে একটি পালি পুস্তক রহিয়াছে। ঐ পুস্তকে নাগসেন মিলিন্দ নামে এক গ্রীক রাজার কতকগুলি জটিল প্রশ্নের উত্তররূপে বৌদ্ধ দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, মিনন্দরই উক্ত গ্রীক রাজা মিলিন্দ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে মিনন্দর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা চলে। তাঁহারও রাজধানী ছিল শাকলে।

মিনন্দর

মিনন্দরের পর ভারতে আর কোনও শক্তিশালী গ্রীক রাজার অভ্যুদয় হয় নাই। গ্রীকগণ আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির আগমনের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।

ভারতে বাহ্লীক গ্রীকগণের আগমনের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছিল। ফলে এই যুগে গ্রীক ও রোমক প্রভাব ভারতীয় শিল্পে, বিশেষত ভাস্কর্যে ও মুদ্রা-রচনায়, প্রতিফলিত হইয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের দেশময় বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভের ফলে মূর্তিশিল্প নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। দেশে দেবদেবীর এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তির চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাহ্লীক গ্রীকগণের আগমনের ফলে ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পে গ্রীক রীতিও

গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্য রীতি

প্রবর্তিত হইল। এইভাবে ভারতে এক অভিনব গ্রীক-ভারতীয় মূর্তিশিল্প বিকাশ লাভ করিল। গান্ধার ও মথুরা অঞ্চলে এই শিল্পধারায় নির্মিত বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গান্ধার অঞ্চলেই এই রীতিতে নির্মিত মূর্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা "গান্ধার শিল্পরীতি" নামে পরিচিত। :বাহ্লীক গ্রীক রাজগণের ভারতে রাজ্যবিস্তার গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যরীতির উদ্ভবের মূলে থাকিলেও, এই ভাস্কর্যরীতি কুষাণ ও শক রাজগণের কালেই ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। (কুষাণরাজ কণিষ্কের প্রসঙ্গে গান্ধার শিল্প সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে মুদ্রা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেগুলি শিল্পের দিক হইতে যথেষ্ট উন্নত ছিল না। এই সকল মুদ্রা সাধারণত তাম্র ও রৌপ্য নির্মিত হইত। ঐ সময়ের কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহ্লীক গ্রীকগণের আগমনের ফলে গ্রীক ও রোমক প্রভাবে ভারতীয় মুদ্রাগুলি গঠন ও শিল্প-সৌন্দর্যের দিক হইতে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীক রাজগণের আমলে মুদ্রাগুলি কেবল গঠন-সৌষ্ঠবেই উন্নত হয় না, সেগুলিতে রাজা এবং তাঁহার পিতা ও পূর্বপুরুষগণের নাম ও পরিচয় মুদ্রিত হইতে থাকে। ঐ সকল মুদ্রায় মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতীক দেখিয়া বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। শক ও কুষাণ রাজগণও মুদ্রাগুলির শিল্পসৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শক রাজগণ মুদ্রায় মুদ্রা-প্রচলনের অব্দও মুদ্রিত করিতেন। তাহা হইতে সহজেই তাঁহাদের শাসনকাল নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে।

মুদ্রা

শকগণ।— সির দরিয়া নদীর উত্তরে শক জাতীয় লোকেরা বাস করিতেন। ইউয়ে-চি নামে আর একটি জাতির তাড়নায় তাঁহারা ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বাধ্য হন এবং আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ক্রমেই ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুরাষ্ট্র, রাজপুতানা ও পাঞ্জাব অধিকার করেন। মালবে এবং পাঞ্জাবেও তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাঁহাদের অধিকার কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

ঐ সকল রাজ্যের রাজারা ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ নামে পরিচিত। ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপগণের অনেকে খুবই শক্তিশালী ছিলেন। পহ্লব ও কুষাণগণের আগমনের ফলে শক রাজ্যগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে।

কিন্তু কুষাণগণের পতনের পরে আবার একাধিক শক্তিশালী শক রাজার অভ্যুদয় হয়। ইহাদের মধ্যে ভৃগুকচ্ছের নহপান (১১৯-১২৪ খ্রীঃ অঃ) ও উজ্জয়িনীর রুদ্রদামনের (১৩০-১৫০ খ্রীঃ অঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নহপান ও রুদ্রদামন

চতুর্থ শতকেও দেখা যায়, পশ্চিম ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে শকগণ আধিপত্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকগণকে পরাজিত করিয়া "শকারি" উপাধি পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তখনও ভারতে শক-শাসন বর্তমান ছিল।

পহ্লবগণ।—পহ্লবগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে শকগণকে বিতাড়িত করিয়া গান্ধার অঞ্চলের কিয়দংশ অধিকার করেন। পূর্বদিকেও তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হইতে থাকে। ভারতীয় পহ্লব রাজগণের মধ্যে

গণ্ডফার্নিস

গণ্ডফার্নিসই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন। খ্রীষ্টান কিংবদন্তী অনুসারে, তাঁহার আমলে যিশু খ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেণ্ট টমাস ভারতে আসিয়াছিলেন এবং গণ্ডফার্নিস তাঁহার নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুষাণগণের আগমন ও অভ্যুত্থানের ফলেই সম্ভবত পহ্লবগণের পতন ঘটিয়াছিল।

কুষাণগণ।—খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইউয়ে-চি নামে একটি জাতি উত্তর-পশ্চিম চীনে বাস করিতেছিলেন। হিউং-নু (হূণ) নামে একটি জাতির হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহারা ক্রমেই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে সির দরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে শকগণ বাস করিতেছিলেন। শকগণ ইউয়ে-চিদের দ্বারা ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হন এবং ইউয়ে-চিরা ঐ অঞ্চলে বসবাস করেন। খ্রীঃ পূঃ ১৪০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহারা আবার ঐ অঞ্চল হইতে অপর একদল শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হন এবং দক্ষিণে আমু দরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সরিয়া আসেন। শীঘ্রই

বাহ্লীক অঞ্চল তাঁহাদের করতলগত হয় এবং সেখানে তাঁহারা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে ইউয়ে-চিরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ক্রমেই কুষাণ নামে একটি শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ঐ শাখার কুযুল (প্রথম) কদফিসিসের অধীনে ইউয়ে-চি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রথম কদফিসিস বাহ্লীক গ্রীকদের বিতাড়িত করিয়া কাবুল নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। পহ্লবগণও তাঁহার হস্তে পরাজিত হয়। সম্ভবত গান্ধার এবং দক্ষিণ আফগানিস্থান তাঁহার অধিকারে আসে। প্রথম কদফিসিস তাঁহার মুদ্রায় নিজেকে "বুদ্ধের চির-অনুরক্ত ভক্ত" বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার মুদ্রাগুলিতে রোমক প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রথম কদফিসিস

ভারতীয় ইতিহাসে ইউয়ে-চি জাতির লোকেরা কুষাণ নামে পরিচিত হইলেও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে তাঁহারা "তুষার" নামে অভিহিত হইয়াছেন। মধ্য-এশিয়ায় তাঁহারা "তোখার" নামে পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর প্রবোধকুমার বাগচী মহাশয়ের মতে, "তুষার" ও "তোখার" একই শব্দের বিভিন্ন রূপ।

কুযুল কদফিসিসের পরে তাঁহার পুত্র বিম (দ্বিতীয়) কদফিসিস রাজা হন। তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যকে ভারতের অভ্যন্তরে সম্ভবত বর্তমান উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তাঁহার মুদ্রাগুলিতে বৃষবাহন শিবের মূর্তি দেখা যায়। তাঁহার পিতা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হইলেও তিনি সম্ভবত শৈব ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তাঁহার সময়েই ভৃগুকচ্ছের ক্ষত্রপ নহপান ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শকাব্দ গণনা প্রবর্তন করেন। তবে এই মত ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়।

দ্বিতীয় কদফিসিস

কুষাণগণ ভারতে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। কুষাণদের আমলেই বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়েই ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ (আঃ খ্রীঃ অঃ ৬১—৬৭) চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

কণিষ্ক।—কণিষ্কই যে কুষাণগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, তিনি কুযুল কদফিসিস ও বিম কদফিসিসের আগে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দ হইতে বিক্রমাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। বিভিন্ন লিপি ও মুদ্রা হইতে জানা গিয়াছে, গান্ধার কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু চীনদেশীয় প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধেও ঐ অঞ্চল কুষাণদের শাসনাধীন ছিল না। অন্যপক্ষে, আর একদল পণ্ডিত মনে করেন, কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে জানা যায়, কণিষ্কের সময় হইতে একটি কাল-গণনা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কোনও কাল-গণনা শুরু হয় নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে "শকাব্দ" গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ অব্দ গণনা সম্ভবত কণিষ্কই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরে শক ক্ষত্রপগণ ব্যবহার করায় উহা "শকাব্দ" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই মত অনুসারে বলা চলে, কণিষ্ক বিম কদফিসিসের পরবর্তী কালের লোক এবং তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কণিষ্কের কাল

কণিষ্ক বাহুবলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পশ্চিমে পার্থিয়া বা পহ্লব রাজ্য হইতে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি চীনা সেনাপতি পান চাওয়ের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু

কণিষ্কের সাম্রাজ্য
স্কেল - মাইল
০ ২০০ ৪০০ ৬০০
আরব সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
সিরিয়া
পা র স্য
চী ন
তি ব্ব ত
পহ্লব দেশ
(পার্থিয়া)
বোখারা
বাহ্লীক দেশ
কাশগড়
ইয়ারখন্দ
খোটান
আমুদরিয়া নং
কাশ্মীর
পুরুষপুর
(পেশোয়ার)
সিন্ধু নং
অযোধ্যা
পাটলিপুত্র
গঙ্গা নং
ম গ ধ
মালব
উজ্জয়িনী
নর্মদা নং
সাতবাহন
কলিঙ্গ
চোল

পরে চীনাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কাশগর, খোটান ও ইয়ারখন্দ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। চীনের এক রাজপুত্র তাঁহার সভায় জামিনরূপে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার)।

কণিষ্কের সাম্রাজ্য

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায়, কণিষ্ক তাঁহার রাজত্বের গোড়ার দিকেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিপি, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রমাণের দ্বারাও উহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার অনেক মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে। রাজধানী পুরুষপুরে তিনি একটি বিরাট মঠ ও স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই কাশ্মীরে, গান্ধারে বা জালন্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন ও অশ্বঘোষ উপস্থিত ছিলেন। কণিষ্কের মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক, ইরানীয় প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তিও দেখা যায়। তাহা হইতে বোঝা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম তাঁহার রাজত্বকালেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলিও এখন হইতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইতেছিল। কণিষ্কের সাম্রাজ্য ভারতের বাহিরে এক সুবিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত থাকায় তাহা বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল।

কণিষ্কের ধর্ম

কণিষ্কের আমলে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পূর্বে বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার পদচিহ্ন, ছত্র ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব সূচিত হইত। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মে সেরূপ কোনও বাধা রহিল না। এখন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্তি নির্মিত হইতে লাগিল। এই নূতন মূর্তিনির্মাণশিল্পে গ্রীক ভাস্কর্য-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এইসব মূর্তি অ্যাপলো, জিউস প্রভৃতি গ্রীক দেবতার মূর্তির অনুকরণে ভারতীয় দৈহিক ভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত হইত। এই শিল্পরীতিতে নির্মিত মূর্তি গান্ধার অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। তাই উহা "গান্ধার শিল্প" নামে পরিচিত হইয়াছে। উহাকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পও বলা হয়। এই শিল্পরীতি ভারতের

গান্ধার শিল্প
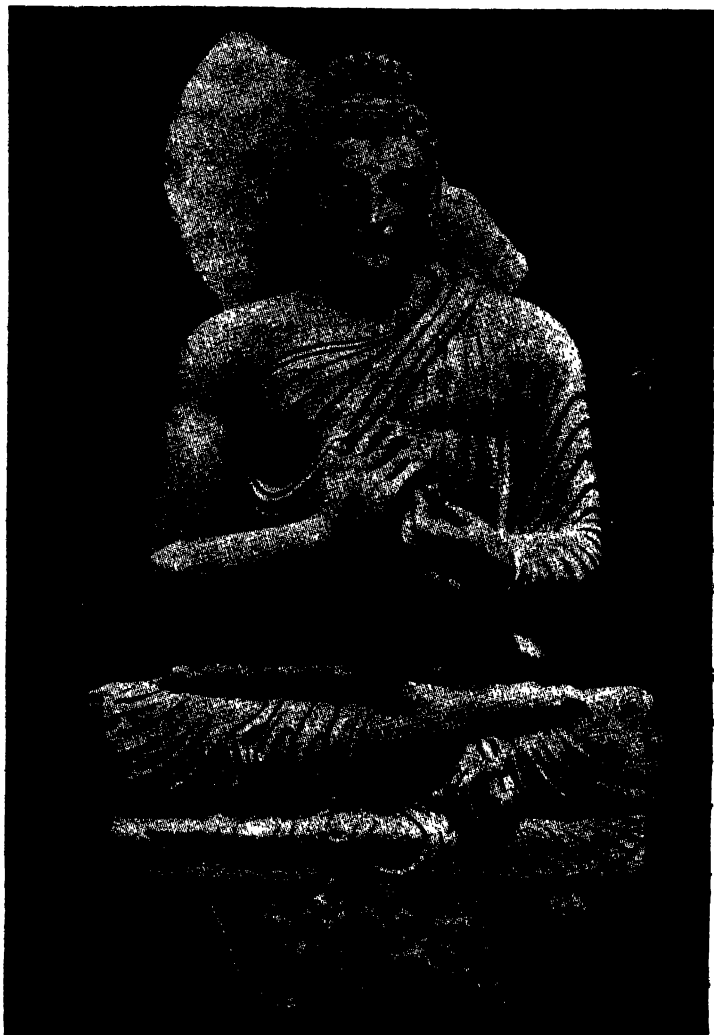
গান্ধার শিল্পরীতিতে নির্মিত বোধিসত্ত্বের মূর্তি

বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্রগুলিতে এই শিল্পরীতির নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মধ্য-এশিয়াতেও এই শিল্পরীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। কণিষ্কের সময় স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি পুরুষপুরে গ্রীক স্থপতির দ্বারা যে স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা বহু শতাব্দী পরেও চীনা ও মুসলিম পর্যটকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল।

স্থাপত্য

কণিষ্ক সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "বুদ্ধচরিত"-রচয়িতা বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় মনীষী চরক তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন।

সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

কণিষ্ক তেইশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি মস্তকহীন মূর্তি মথুরার নিকট পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক প্রভৃতি কুষাণ রাজগণ রাজত্ব করেন। পারস্যে সাসানীয় এবং ভারতে গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে কুষাণ সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে।

কুষাণ আমলে বহির্বাণিজ্য।—মিশর এবং এশিয়া মাইনর রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং কুষাণ সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় কুষাণ আমলে পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত কুষাণ রাজগণের মুদ্রাগুলি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরীয় গ্রীক নাবিক হিপলাস মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করেন। তাহার ফলে সোজা ভারত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয় এবং পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য অত্যন্ত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

রোম সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য

রোম সাম্রাজ্যের সহিত চীনের ব্যবসায় কুষাণ সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের মধ্য দিয়া চলিত। কুষাণ আমলে ঐ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায় চীন ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি

চীনের সহিত বাণিজ্য

পাইয়াছিল। ঐ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভারতীয়গণ যে অংশগ্রহণ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনের সহিত ভারতের সরাসরি বাণিজ্যও চলিত।

মহাযান-বৌদ্ধধর্ম।—মৌর্য আমল হইতেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম পাশাপাশি বর্তমান ছিল। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজা ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদকে জনসাধারণ ঠিকমতো বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। ফলে বৌদ্ধধর্মকে জনসাধারণের উপযোগী করিয়া একটি নূতন রূপে রূপায়িত করিবার প্রবণতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল এবং পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের অনুকরণে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি রচনা করিয়া সেগুলির উপাসনার রীতি চালু হইতে-ছিল। পরে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মতো বহু দেবদেবীও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আগমন ও তাঁহাদের ভারতীয় ধর্ম গ্রহণের ফলেও বৌদ্ধ ধর্মের কিছুটা রূপান্তর ঘটিয়াছিল। এইভাবে মৌর্যোত্তর যুগে বৌদ্ধধর্ম যে নবরূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাই "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত।

পৌরাণিক ও বৈদেশিক প্রভাব

"মহাযান" বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীর বা পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধরে চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম তত্ত্বের দিক হইতেও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পালি বা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত না হইয়া এখন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইতেছিল। উত্তর ও মধ্য ভারতে "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি

কিন্তু বৌদ্ধগণ সকলেই মহাযান মতবাদকে স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহাদের একাংশ বৌদ্ধধর্মের মূল রূপটিকে অপরিবর্তিত রাখিতে এবং তাহাই প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম "মহাযান" ও "হীনযান" নামে

দুইটি পৃথক মতবাদে এবং বৌদ্ধগণ দুই পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। "হীনযান" মতবাদ দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু মধ্য-এশিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি সকল স্থানে "মহাযান" বৌদ্ধধর্মই বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

বাহিরে বিস্তার লাভ

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় মনীষিগণ।—মৌর্যোত্তর যুগে ভারতে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, পতঞ্জলি, গুণাঢ্য, চরক প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর উদয় হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

নাগার্জুনকেই সাধারণত "মহাযান" বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। তিনি কণিষ্কের রাজসভায় ও চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি "মধ্যমককারিকা" নামে পুস্তকে তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎসর পরে নাগার্জুনের আবির্ভাব হইবে, বুদ্ধদেব এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা যায় নাগার্জুন বিদর্ভে (বর্তমান বেরার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি "মহাযান" মতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক হইলেও "হীনযান" মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ সংঘের পরিচালক হন। তাঁহার পরিচালনাতেই নালন্দার খ্যাতি বোধ গয়াকেও ছাড়াইয়া যায়।

নাগার্জুন

বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি "বুদ্ধচরিত" ও "সৌন্দরনন্দ" নামে দুইখানি কাব্য ও কতিপয় নাটক রচনা করেন। তাঁহার তিনখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি মধ্য-এশিয়ার তুরফান নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তিনখানি নাটকের মধ্যে "সারিপুত্র-প্রকরণ" নামে নাটকখানি যে তাঁহার রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নাটকে মৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্রের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকখানিকে অনেকে ভারতের প্রাপ্ত নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন।

অশ্বঘোষ

মৌর্যোত্তর যুগে সংস্কৃত ভাষা ক্রমেই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিলেও প্রাকৃত ভাষাতেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলির মধ্যে গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুণাঢ্য পৈশাচী প্রাকৃতে তাঁহার "বৃহৎকথা" রচনা করেন। মূল "বৃহৎকথা" গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া না গেলেও ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব সংস্কৃত ভাষায় উহার যে সকল অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায়, উহা অসংখ্য সুন্দর গল্পের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল।

•গুণাঢ্য

মৌর্যোত্তর যুগে শুঙ্গ রাজবংশের আমলে বৈয়াকরণ পতঞ্জলি জীবিত ছিলেন। পাণিনি তাঁহার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে প্রায় চার হাজার সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ "অষ্টাধ্যায়ী" রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনির প্রায় দুই শত বৎসর পরে বৈয়াকরণ কাত্যায়ন সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়া পাণিনির ব্যাখ্যা ও স্থানবিশেষে সমালোচনা করেন। পতঞ্জলি পাণিনি ও কাত্যায়ন-প্রবর্তিত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা, সমালোচনা ও টীকা রচনা করেন। পতঞ্জলি-লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "মহাভাষ্য"।

পতঞ্জলি

মৌর্যোত্তর যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রও অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক চরক কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত "চরকসংহিতা" সুবিখ্যাত গ্রন্থ। উহাতে রোগনির্ণয়, শারীরতত্ত্ব, ভেষজ, পথ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা আছে। চরকের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিদ্যা অত্যন্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। মগধরাজ বিম্বিসারের আমলে বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক জীবিত ছিলেন। তিনি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার সম্পর্কে সুন্দর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শিক্ষা-শেষে তাঁহার গুরু তাঁহার হস্তে একটি খনিত্র (শাবল) দিয়া বলেন যে, "বৎস, তক্ষশিলার কয়েক মাইলের মধ্যে যদি কোনও উদ্ভিদ্ পাও, যাহা ঔষধ তৈয়ারির কাজে লাগে না, তবে তাহা লইয়া আইস।" বহু সন্ধান ও পরিশ্রমের পর জীবক রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। গুরুকে বলিলেন, "ঔষধ তৈয়ারি

চরক

হইতে পারে না, এমন কোনও উদ্ভিদের সন্ধান পাইলাম না।" গুরুদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া জীবককে আশীর্বাদ করিলেন। জীবক সার্জারি বা শল্যবিদ্যাতেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বারাণসীতে এক বণিকপুত্রের মল্লক্রীড়াকালে নাড়িভুঁড়ি জড়াইয়া গিয়াছিল। জীবক তাহার পেট চিরিয়া নাড়িভুঁড়ি বাহির করেন এবং সেগুলিকে ঠিকমতো যথাস্থানে রাখিয়া পুনরায় তাহার উদর সেলাই করিয়া দেন। তিনি বুদ্ধদেবেরও চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ভারত সুপ্রাচীন কালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে কিরূপ উন্নত হইয়াছিল, জীবকের জীবন হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। চরক তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। জীবক ও চরকের সহিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুশ্রুতের নামও অবিস্মরণীয় হইয়া আছে।

জীবক

তক্ষশিলা।—পশ্চিম পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের তীরে রাওলপিণ্ডি হইতে অনতিদূরে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরটি অবস্থিত ছিল। শিলা (প্রস্তর) তক্ষণ (খোদাই) করিয়া এই নগরটি নির্মিত হইয়াছিল। তাই ইহার নাম তক্ষশিলা। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তক্ষশিলায় খননকার্য চালাইয়া বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের সময়েও যে তক্ষশিলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে সুবিখ্যাত ছিল, তাহা জীবকের কাহিনী হইতেই বোঝা যায়। জীবক সুদূর মগধ (বিহার) হইতে তক্ষশিলায় শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। জাতকের অসংখ্য কাহিনীতে তক্ষশিলার উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে নালন্দা ও বিক্রমশিলা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, সুপ্রাচীন কালে তক্ষশিলা তাহাই করিয়াছিল। কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নহে, চীন, গ্রীস, মিশর, ইরান, বাহ্লীকদেশ ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভের জন্য আসিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রায় সহস্র বৎসর তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ প্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানও যে ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। ছাত্রগণ শিক্ষালাভের জন্য সহস্র মুদ্রা দিত। গরীব ছাত্ররা মুদ্রাদানের পরিবর্তে

তক্ষশিলায় খননকার্যের একটি দৃশ্য

গুরুগৃহে দিনে কাজ করিয়া রাত্রিতে গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ করিত। তবে ছাত্রদের মধ্যে ধনী ও নির্ধন বলিয়া কোনরূপ পার্থক্য করা হইত না। অনেক বিবাহিত ছাত্রও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করিত। কুষাণ রাজগণের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র এই 'অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায়, ঐ যুগে তক্ষশিলা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বৈদেশিক সম্পর্ক ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার।—মৌর্য যুগে বিদেশের সহিত ভারতের যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, বাহ্লীক গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলির আগমনের ফলে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দুকুশের অপর পারে অবস্থিত অঞ্চলে ও মধ্য-এশিয়ায় অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত ও মধ্য-এশিয়ার স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহু ধর্মশাস্ত্রও এই অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে বোঝা যায়, এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের বহু পূর্বেই ভারতের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলিতে, যথা, পারস্য, আফগানিস্থান ও কাফিরিস্থানে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

পারস্য

পারস্য যে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা ভিক্ষু লোকোত্তমের জীবন হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের বাণী বহন করিলেও ভিক্ষু লোকোত্তমই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষু লোকোত্তম চীনা ইতিহাসে আন-শে-কাও নামে পরিচিত। তিনি পারস্যের "আরসকিদীয়" বংশের রাজকুমার ছিলেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কপিশ রাজ্যও (বর্তমানে কাফিরিস্থান) বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কপিশ রাজ্য একদা ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও ভারতের বাহিরে অবস্থিত বহু অঞ্চল তাহার রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং যখন এই পথে ভারতে আসেন, তখন

কপিশ বা কাফিরিস্থান

কপিশ রাজ্য খুবই শক্তিশালী ছিল। গান্ধার, নগরহার (বর্তমান জালালাবাদ), লম্পাক (বর্তমান লামঘান), উড্ডিয়ান তাহার অধীন ছিল। কপিশের রাজধানীতে তখন বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল এক শত এবং বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা ছিল অন্যূন ছয় হাজার। সেখানে দেবমন্দিরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। দিগম্বর জৈন, পাশুপত প্রভৃতি ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাও কপিশে বাস করিত। অর্থাৎ বহু শতাব্দী ধরিয়া কপিশ রাজ্য ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কপিশ হইতে বাহ্লীক রাজ্য (বল্‌খ্‌) পর্যন্ত যে তিনটি গিরিপথ ছিল, সেগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমের গিরিপথটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এই গিরিপথের নাম বামিয়েন। বামিয়েন গিরিপথ আফগানিস্থানে হিন্দুকুশ পর্বতে অবস্থিত। বামিয়েনের এই বিস্তৃত উপত্যকায় প্রাচীনকালে একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক আক্যাঁ (Hackin) অনুসন্ধান চালাইয়া এখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুপ্রাচীন কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, কোশলরাজ বিরুঢ়ক শাক্য রাজ্য আক্রমণ করিলে অহিংসার পূজারী বৌদ্ধ শাক্যবীরগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন না।

বামিয়েন

কিন্তু চারিজন শাক্য রাজকুমার বৌদ্ধধর্মের অহিংস নীতি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই চারিজনের মধ্যে একজন বামিয়েনের রাজা নির্বাচিত হন। অতঃপর বামিয়েন বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও ইউয়ান চোয়াংয়ের ভারত আগমন-কালে শাক্যবংশীয়গণই বামিয়েনের রাজা ছিলেন। বামিয়েনে তখনও অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল। বামিয়েন উপত্যকার পূর্ব হইতে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতের গাত্র খোদিত করিয়া বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলির দুই-একটি প্রায় দেড়শত ফুট উচ্চ ছিল। এই পর্বতের ধারে অজন্তার অনুকরণে বহু গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বামিয়েনে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি লোপ পাইবার পরে বহু শতাব্দী কাল এইসকল গুহামন্দির

সম্পর্কে মানুষ খোঁজখবর রাখিত না। সম্প্রতি ফরাসী পুরাতাত্ত্বিকগণ এইগুলির পুনরাবিষ্কার করিয়া ভারতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এইসব গুহামন্দিরে নানা যুগের সংস্কৃত পুঁথির খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। এইসকল পুঁথি বৌদ্ধশাস্ত্রের এবং ইহাদের লিপি ও ভাষা ভারতীয়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথিখানি কুষাণ আমলের বলিয়া মনে হয়। পাহাড়ের পাশ কাটিয়া যেসব বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি এখন হতশ্রী হইলেও দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গুহামন্দিরের যেসব প্রাচীরচিত্রের নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনারীতি সম্পূর্ণরূপে অজন্তার অনুরূপ।

বাহ্লীকদেশ

বামিয়েন হইতে বিভিন্ন গিরিপথে হিন্দুকুশ পর্বত পার হইলে বাহ্লীকদেশে (বল্‌খে) পৌঁছানো যাইত। বাহ্লীকদেশও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, তৎকালেও ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল "রাজগৃহপুর"। রাজগৃহপুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে বিরাট বৌদ্ধ বিহার ছিল, তাহার নাম ছিল "নবসংঘারাম"। ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, এই নবসংঘারামে অসংখ্য অপরূপ বুদ্ধমূর্তি এবং নবসংঘারামের উত্তরে প্রায় দুই শত ফুট উচ্চ একটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে আরবগণ যখন নবসংঘারাম আক্রমণ করে, তখন উহাতে তিনশত প্রকোষ্ঠ ছিল এবং উহার ভূসম্পত্তি প্রায় ৮০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। খোটান, কাশগর, কয়াশর, কুচা প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি প্রবাদ হইতে জানা যায়, অশোকের অন্যতম পুত্র কুণাল মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত খোটানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ কতো দূর সত্য, তাহা নির্ধারিত না হইলেও খোটান যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সাম্রাজ্য ভারত ও মধ্য-এশিয়ার যোগাযোগ

স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। খোটানের "গোশৃঙ্গ" ও "গোমতী" বিহার বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। বহু ভারতীয় পণ্ডিত সেখানে বাস করিতেন এবং এশিয়ার অন্যান্য স্থান ও চীন হইতে বহু বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসী সেখানে আসিতেন। চীনা পবিত্রাজক ফা-হিয়েন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে গোমতী বিহারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন গোমতী বিহারে ভিক্ষুর সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক ছিল। এই তিন সহস্রাধিক ভিক্ষুকে আহারের সময় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া আহ্বান করা হইত এবং ভিক্ষুগণ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিহারে প্রবেশ করিয়া নীরবে আসনগ্রহণ করিতেন। আহার্যগ্রহণ নিঃশব্দে সমাপ্ত হইত। প্রতি বৎসর এখানে বুদ্ধের রথযাত্রা হইত। গোমতী বিহার বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র আলোচনা ও শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

• খোটান

গোমতী-বিহার

মধ্য-এশিয়ার কুচী (আধুনিক কুচা) রাজ্যটিও বৌদ্ধধর্মের একটি প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। এখানকার রাজারা সকলেই স্থবর্ণপুষ্প, হরিপুষ্প, হরদেব, স্থবর্ণদেব ইত্যাদি ভারতীয় নাম বহন করিতেন। এখানে বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। কুচীতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, কুচী রাজ্যের রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধ বিহার ছিল ও পঞ্চসহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধবিহারটির নাম ছিল "আশ্চয বিহার"।

কুচী

কাশগর, কারাশর (অগ্নিদেশ), ইয়ারকন্দ (চোক্কুক), নিয়া, ইয়াক-আরিক (ভরুক), তুরফান প্রভৃতি স্থানও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায়, বিজিতধর্ম নামে এক রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া কাশগরে বসবাস করিতে থাকেন। ফলে কাশগর বৌদ্ধধর্মের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। নিয়া অঞ্চলে বালুকাস্তূপের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত যে সকল রাজকীয় দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি অশোক লিপির অনুজ্ঞার অনুরূপ। চোকুক রাজ্যের দুই রাজকুমার সূর্যসোম ও সূর্যভদ্র কুচীর বিখ্যাত বৌদ্ধ

পণ্ডিত কুমারজীবের নিকট মহাযান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইউয়ান চোয়াংয়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, ঐ সময় চোকুক (ইয়ারকন্দ) বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইয়ারকন্দের নিকটবর্তী কিজিল দরিয়া ও তারিম নদী প্রাচীনকালে 'সীতা" নদী নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণীতে ঐ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থানগুলির মধ্যে দান্দান উইলিক, মিরান ও তুন্-হোয়াং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দান্দান উইলিকের প্রাচীর-চিত্রে যেসকল নাগী ও বোধিসত্ত্বের রূপ দেখা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে অজন্তার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে রেশমের উপর চিত্রিত বজ্রপাণি মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিরানে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাচীন কালের যে সকল শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলিতে ইন্দো-গ্রীক বা গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। চীনদেশের সীমান্তে তুন্-হোয়াং নামক স্থানটি অবস্থিত। এখানে একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে অনুচ্চ পর্বতমালার গাত্রে অজন্তার অনুকরণে অসংখ্য গুহাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। তুন্-হোয়াংয়ে অন্যূন পাঁচশত গুহাগৃহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩০০ গুহাগৃহ অনুপম চিত্র ও ভাস্কর্যে সুশোভিত। এখানে সর্বসমেত এক হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। তুন্-হোয়াং বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি বিশাল কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণের আক্রমণের কালে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিগুলিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে একটি গুহায় নিক্ষেপ করিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া চীনদেশে পলায়ন করেন। এখন ঐসকল পুঁথি অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুঁথির সংখ্যা বিশ হাজারের উপর।

মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থান

তুন্-হোয়াং

মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্তান ও কিরঘিজিয়া অঞ্চলে সম্প্রতি সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুসন্ধান চালাইয়া কিছু বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। উজবেকিস্থানের তেরমেজে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহারটি কুষাণ যুগে

নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উহা সম্ভবত ভূমিকম্পের ফলে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এখানে একজনের বাসোপযোগী একটি কক্ষে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। তিনি প্রস্তর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে কয়েকটি মৃৎপাত্র ও একটি প্রদীপ ছিল। সম্ভবত ভূমিকম্পের সময়ে ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সম্প্রতি কিরঘিজিয়ার প্রাচীন শহর আক্-বেশিমে সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে বৌদ্ধ মন্দিরটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার ভগ্ন মূর্তিগুলিতে অজন্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

উজবেকিস্তান ও কিরঘিজিয়া

পশ্চিমে মধ্য-এশিযার পথে এবং পূর্বে স্থল ও জলপথে ভারত ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গডিয়া উঠিযাছিল। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১২৭ অব্দে চীন রাজদূত চ্যাং কিয়েন যখন বাহ্লীক বাজ্যে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তথায় দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে আনীত বাঁশ ও কাপড বিক্রয় হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইযাছিলেন এবং জানিতে পারিযাছিলেন যে, এই সকল মাল ইউনান ও ব্রহ্মেব পথে ভারত ও আফগানিস্থান দিয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত চীনা পুঁথি হইতে জানা যায়, সমুদ্রপথে চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চলিত। চীনা পুথিতে হোয়াংচে নামে যে ভারতীয় শহরের উল্লেখ আছে, তাহাকে অনেকে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী বলিয়া মনে করেন। যখন কোনও দুইটি দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠে, তখন তাহাদের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটাও স্বাভাবিক। চীন ও ভারতেব মধ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। চীনা ঐতিহ্য অনুসারে, খ্রীষ্টপূর্ব ২১৭ অব্দেই কয়েকজন ভারতীয় বৌদ্ধধর্মপ্রচারক চীনদেশে গিয়াছিলেন। অপব একটি বিবরণ হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ১২১ অব্দে জনৈক চীনা সেনাপতি মধ্য-এশিয়ায় অভিযান কালে একটি স্বর্ণ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাইয়াছিলেন। এই বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সকল প্রবাদকাহিনী কতখানি সত্য, তাহা জানা যায় নাই। তবে আঃ ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম যে চীনদেশে সুনিশ্চিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীন-সম্রাট মিং-তির আমন্ত্রণে ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে

দুইজন বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনদেশে যান। চীন-সম্রাটের আনুকূল্যে চীনদেশে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশের পথেও যে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ আছে। ভারতীয় ধর্মের সহিত ভারতীয় শিল্পরীতিও চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। চীনদেশের ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। (এই প্রসঙ্গে ৮৯ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।) চীনদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও তংকিনে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

চীনদেশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপসমূহের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রাচীনকাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ জাতকের বিভিন্ন কাহিনী এবং "বৃহৎকথা" প্রভৃতি কাহিনীগ্রন্থ হইতে এই অঞ্চলের সহিত ভারতীয়গণের সম্পর্কের কথা জানিতে পারা যায়। মসলা, সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান্ ধাতু ও খনিজ দ্রব্য ভারতীয় বণিকগণকে শত বিপদ তুচ্ছ করিয়াও এই সকল অঞ্চলেব সহিত বাণিজ্য করিতে প্রলুব্ধ করিত। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সকল দেশ ও দ্বীপগুলি ভারতীয়গণের নিকট "সুবর্ণভূমি" ও "সুবর্ণ দ্বীপ" নামে পরিচিত ছিল। সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্তি, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি বন্দর হইতে এবং স্থলপথে বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মের পথে ভারতীয়গণ এই সকল স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। বাণিজ্যের সহিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিও ঐসকল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, মহারাজ অশোক শোণ ও উত্তর নামে দুইজন ধর্মপ্রচারককে সুবর্ণভূমিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহা যদি সত্য না হয়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে এই সকল দেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কৌণ্ডিণ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ইন্দোচীনে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

মৌর্যোত্তর যুগে মিশর, গ্রীস ও রোমের সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলি

হইতে পশ্চিম এশিয়ার সেলুকসের বংশধরগণের রাজ্যে নানাবিধ দ্রব্য রপ্তানি করা হইত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারতীয় বণিকগণ আরব সাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সহজেই বাণিজ্য বিস্তার করেন। দক্ষিণ ভারতে রোম সম্রাটগণের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোমক লেখক প্লিনি রোম হইতে ভারতে বৎসরে পাঁচ কোটিরও অধিক রোমক মুদ্রা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পন্দিচেরীর নিকটে আরিকেমেডু নামক স্থানে রোমক বাণিজ্যকেন্দ্রের একটি ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীক লেখকগণ পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রকে "বারিগাজা" নামে অভিহিত করিতেন। কুষাণ যুগে রোম সাম্রাজ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মিশর, গ্রীস ও রোম

সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য ঐ যুগে দক্ষিণ ভারতে বহু বন্দর ছিল। "পেরিপ্লাস" গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক (আঃ ৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) নৌরা (কান্নানোর), টিণ্ডিস (পোন্নানি), মুজিরিস (ক্রাঙ্গানোর), নেল্‌সিন্দা (কোট্টায়মের নিকট), কল্‌চি (কর্কই), কামারা (কাবেরীপত্তম্), পডুকা (পন্দিচেরী) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। টোলেমি তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণীতে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী "মৈসলিয়া" (অন্ধ্র) অঞ্চলের বহু বন্দরের কথা বলিয়াছেন। ঐগুলি হইতে ভারতীয় বণিকগণ স্বর্ণভূমিতে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহা ছাড়া তিনি পশ্চিম উপকূলের বারিগাজা (বারোচ), সোপারা ও কল্যাণের উল্লেখও করিয়াছেন।

কতিপয় প্রাচীন বন্দর

মৌর্যোত্তর যুগে সামাজিক পরিবর্তন।—মৌর্যোত্তর যুগে বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুত্থান, বৌদ্ধধর্মের "হীনযান" ও "মহাযান" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, জৈনধর্মের বিকাশলাভ এবং বৈদেশিকগণের ভারতে আগমন ও ভারতীয় ধর্মগ্রহণের ফলে ভারতীয় সমাজে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। হিন্দু সমাজে চাতুর্বর্ণের প্রাচীন বিভাগের স্থলে এখন বহু উপবিভাগের উদ্ভব হইতেছিল। বৈদেশিক জাতিগুলি

জাতিভেদ শৈথিল্য

ভারতীয় সমাজে স্থান লাভ করিতেছিল। দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজগণ চাতুর্বর্ণের প্রাচীন বিভাগকে স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাঁহারা তাহাতে সফল হন নাই। ফলে জাতিভেদ প্রথায় যথেষ্ট পরিমাণে শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল।

ইতিহাসে দেখা যায়, বৈদেশিক আক্রমণের কালে দেশে স্ত্রীজাতিকে বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাড়া পড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে স্ত্রীলোকগণকে অন্তঃপুরবাসিনী ও পর্দানসীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ফলে স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। মৌর্যোত্তর যুগেও তাহাই হইয়াছিল। রাজকুলবধূগণের জন্য কঠোর অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অনুকরণে সাধারণ লোকেও নিজ নিজ পরিবারে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত করিতেছিল। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইতেছিল যে, "নারী সম্মানের অধিকারী, কিন্তু স্বাধীনতার অধিকারী নহেন।" পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা ছিল নিষিদ্ধ। ফলে বিধবা-বিবাহ ছিল নিন্দনীয়। সমাজে বাল্যবিবাহও প্রচলিত ছিল।

নারীর স্বাধীনতা সংকোচ

প্রশ্নাবলী

1. Write what you know about the foreign invasions into India after the decline of the Maurya Empire till the establishment of the Kushans in India and describe the effect of the cultural impact thus caused on the Indian culture.

মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর কুষাণগণের প্রতিষ্ঠালাভ পর্যন্ত ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে কি জান? উহার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল?

2. What do you know of the Kushans? Who was the greatest Kushan king in India? What was his contribution to Buddhism?

কুষাণগণ সম্পর্কে কি জান? ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ রাজা কে ছিলেন? বৌদ্ধধর্মে তাঁহার দান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

3. What do you know about the commercial and cultural expansion of India in the post-Mauryan period?

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভারতের গৌরবময় যুগ—গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ভারত

Syllabus : *The Classical age ;* Gupta expansion—Samudra Gupta—Chandra Gupta II—Skanda Gupta and the Huns—Gupta Rule in Bengal—Fa-Hien's account.

Gupta administration—Society—economy—colonial expansion—highly developed trade and industry—Vaisnavism or Bhagavata cult—literature and science—Gupta art. Political disintegration after the Gupta—Harshavardhana—struggle—for Kanauj—emergence of Bengal as a great power—Sasanka. Early history of Orissa—Kharavela—Khandagiri and Udayagiri—inscriptions and art. Emergence of Kamarupa (Assam) in history—Nidhanpur Copper Plate.—Harsha's Empire—Hiuen Tsang's account—Nalanda University—Banabhatta—Harsha's defeat in the hands of Pulakesin II Chalukya.

পাঠসূচী ঃ—ভারতের গৌরবময় যুগ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার—সমুদ্রগুপ্ত—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—স্কন্দগুপ্ত ও হূণগণ—বঙ্গদেশে গুপ্ত শাসন—ফা-হিয়েনের বিবরণ।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা সমাজ—অর্থনীতি—ঔপনিবেশিক প্রসার—অতিশয় উন্নত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প—বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম সাহিত্য ও বিজ্ঞান—গুপ্তযুগের শিল্পকলা। গুপ্ত রাজগণের পর দেশে রাজনৈতিক ভাঙন—হর্ষবর্ধন কনৌজের জন্য সংগ্রাম—অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে বাংলার অভ্যুদয়—শশাঙ্ক। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস—খারবেল খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির—উৎকীর্ণ লিপি ও শিল্পকলা। ইতিহাসে কামরূপের (আসামের) আবির্ভাব নিধানপুরের তাম্রশাসন। হর্ষের সাম্রাজ্য-ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বাণভট্ট—চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে হর্ষবর্ধনের পরাজয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও বৈদেশিকগণের আগমনের ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের পুনরভ্যুত্থানের ফলে ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনরায় অনেকাংশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই ঐক্যসাধনের মূলে ছিলেন মগধের গুপ্তরাজগণ। তাই মৌর্য যুগের মতো গুপ্ত যুগটিও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।—গুপ্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দুইজন পূর্বপুরুষের নাম লিপি হইতে জানা গিয়াছে। তাঁহার পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত এবং পিতার নাম ঘটোৎকচ। তাঁহারা সম্ভবত বিহার বা পশ্চিম বঙ্গের কোনও অঞ্চলে সামন্ত রাজরূপে রাজত্ব করিতেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। উহা সম্ভবত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর হইতেই "গুপ্ত সংবৎ" গণনা করা হয়। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির জন্য লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবী৷কে বিবাহ করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিগণ ঐ সময়ে খুব সম্ভব উত্তর বিহার ও নেপালে রাজত্ব করিতেন। লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ কবায় লিচ্ছবিদের রাজ্যও চন্দ্রগুপ্তের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। যাহাই হউক, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যে বর্তমান বিহারের অধিকাংশে এবং উত্তর প্রদেশের কতকাংশে রাজত্ব করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাটলিপুত্রেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি কতদিন রাজত্ব কবিয়াছিলেন বা কবে তাঁহার মৃত্যু হইযাছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তিনি মন্ত্রী ও আমত্যদের এক সভায় কুমারদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকেই উত্তরাধিকাবী নির্বাচিত কবিয়া গিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত।—সমুদ্রগুপ্ত কেবল তাঁহার ভ্রাতাদেব মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন না, তিনি ছিলেন গুপ্ত-রাজগণের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোনও সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত রাজা হইয়া ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সংকল্প করিলেন। এলাহাবাদে অশোক স্তম্ভের গাত্রে সমুদ্রগুপ্তেব সভাকবি হরিষেণ-রচিত একটি প্রশস্তি খোদিত রহিয়াছে। উহা হইতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী অনেকাংশে জানা যায়। প্রথমে তিনি আর্যাবর্তে রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দেন। ঐ স্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায়, রুদ্রদেব, মতিলা, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্মণ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহু রাজা তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্তম্ভলিপিতে ঐ সকল রাজার

দিগ্‌বিজয়

রাজ্যগুলির উল্লেখ না থাকায় সমুদ্রগুপ্ত কোন্ কোন্ অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে পশ্চিমে শতদ্রু হইতে পূর্বে ভাগীরথী পর্যন্ত অঞ্চল যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মালব, গুজরাট এবং সুরাষ্ট্রের শক রাজ্যগুলি তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হইলেও সেগুলি সম্ভবত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। উত্তর ভারতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিও তাঁহার সার্বভৌমতা মানিয়া লইয়াছিল। অতঃপর তিনি দক্ষিণ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয় বাহিনী দক্ষিণ ভারতে সুদূর কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের যে সকল রাজা তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্য তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। অর্থ ও বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যগুলি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। গুপ্ত রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন না। তাই হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রথা অনুসারে দিগ্‌বিজয়-শেষে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত (একটি মুদ্রা হইতে)

বহুমুখী প্রতিভা

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন না। এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়, তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া "কবিরাজ" আখ্যা পাইয়াছিলেন। অনেক মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদক মূর্তি রহিয়াছে। তাহা হইতে বোঝা যায়, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতাও করিতেন। হরিষেন লিখিয়াছেন, সমুদ্রগুপ্ত দেব-গায়ক নারদের অপেক্ষা বড় গায়ক ও দেবগুরু বৃহস্পতির অপেক্ষা বড় পণ্ডিত ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সেজন্য অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ বা বিরূপ ভাব ছিল না। কথিত আছে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুকাল জানা যায় নাই। ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ তারিখের পূর্বে কোনও সময়ে নিশ্চয় সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।—বিশাখদত্ত-রচিত "দেবী চন্দ্রগুপ্তম্" নাটক এবং বাণভট্ট-রচিত "হর্ষচরিতের" উপর নির্ভর করিয়া কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র রামগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন এবং রামগুপ্তকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার অনুজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সহজে গ্রহণ করা যায় না। গুপ্ত যুগের লিপি হইতে জানা যায়, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া গিয়াছিলেন। মথুরায় আবিষ্কৃত একটি লিপি হইতে জানা গিয়াছে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎপূর্ববর্তী কোন সময়ে যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ্যলাভ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (একটি মুদ্রা হইতে)

চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যকে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই, বর্ধিতও করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের নাগবংশীয়া রাজকন্যা কুবেরনাগাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের বাকাটক-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই দুইটি বিবাহের খুবই রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। উত্তরে নাগগণ এবং দক্ষিণে বাকাটকগণের সহিত আত্মীয়তা

থাকায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সহজেই গুজরাট ও সুরাষ্ট্র অঞ্চলের শক রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। পশ্চিম মালবও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। শকগণকে পরাজিত করিয়া তিনি "শকারি" (শকগণের নিধনকারী) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বিক্রমাদিত্য" নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

রাজ্যবিস্তার

তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। তবে পরধর্মের প্রতি তাঁহার কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা বিরূপ ভাব ছিল না। তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন শৈব এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ।

ভারতীয় কাহিনী ও কিংবদন্তীতে যে রাজা বিক্রমাদিত্য অমর হইয়া আছেন, তাঁহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, তিনি শকগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয়, তাঁহার সভায় কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির প্রভৃতি নয়জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি (নবরত্ন) উপস্থিত ছিলেন। মনে হয়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং কাহিনী-কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত উজ্জয়িনীতেও একটি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিংবদন্তীতে কথিত নয়জন পণ্ডিত যে তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, তাঁহারা সকলে একই সময়ের লোক নহেন। তবে মহাকবি কালিদাস সম্ভবত তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে বৌদ্ধ চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুকাল জানা যায় নাই। সাঁচীতে প্রাপ্ত একটি লিপি হইতে জানা গিয়াছে, ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। অন্যপক্ষে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত রাজত্ব করিতেছিলেন, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। তাই অনেকে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন

গুপ্ত যুগের মুদ্রা

গুপ্ত সাম্রাজ্য
(৪০০খ্রীষ্টাব্দ)
কাশ্মীর
পুরুষপুর
মদ্রক
কর্তৃপুর
তিব্বত
যৌধেয়
ইন্দ্রপ্রস্থ
নেপাল
অর্জুনায়ন
কনৌজ
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
কাশী
উজ্জয়িনী
সমতট
বলভী
নর্মদা নং
মহাকোশল
বাকাটক
কট্টুর
কৃষ্ণা নং
পল্লব
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
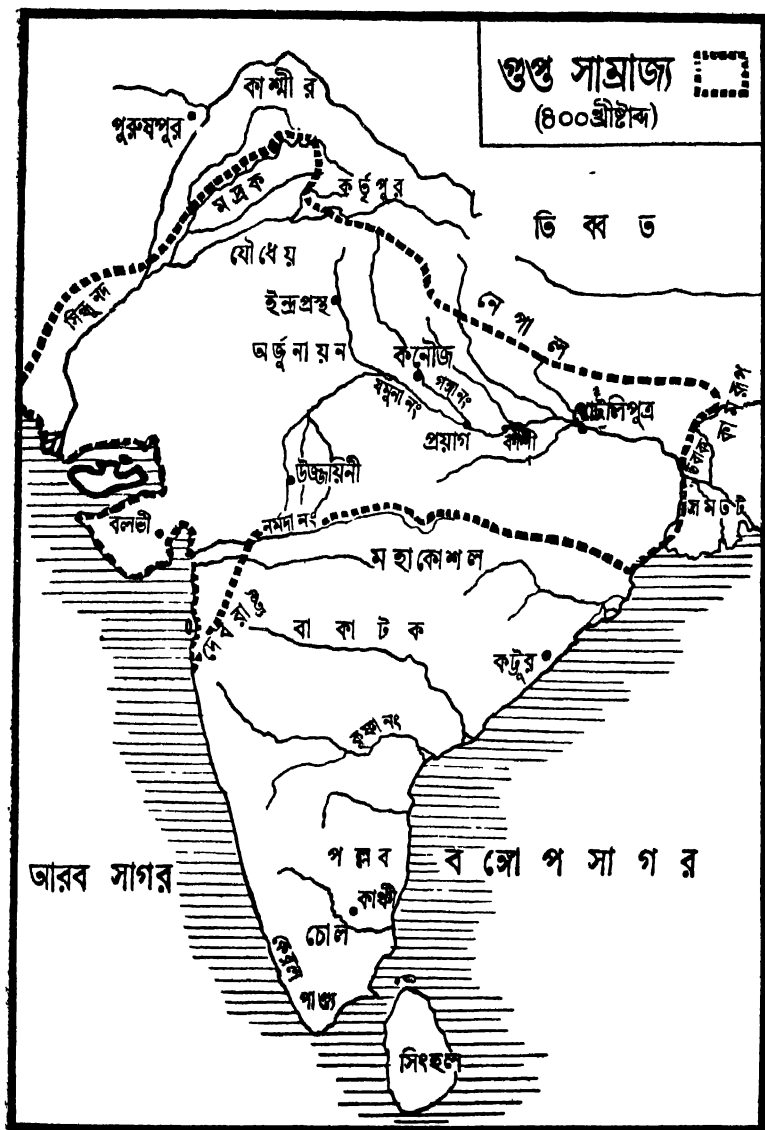
প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫—৪৫৫)।—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত রাজা হন। তিনি "মহেন্দ্রাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের মতো তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহারি আমলেও সম্ভবত গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও মর্য্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগেই পুষ্যমিত্র নামে নর্মদাতীরবাসী একটি উপজাতি প্রবল হইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পুষ্যমিত্রগণের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই সম্ভবত কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল।

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭)। কুমার গুপ্তের পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। তিনিই পুষ্যমিত্রগণকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু ইহার অল্পদিনের মধ্যেই আবার এক বিপদ দেখা দিল। হিউং-নু বা হূণ নামে এক বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হিউং-নু বা হূণ নামে একটি জাতি চীনের সীমান্তদেশে বাস করিতেছিল। এই হিউং-নু বা হূণ জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইউয়ে-চি জাতি দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং কুষাণ জাতি নামে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু হূণ জাতিও ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদেব একটি শাখা ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং এটিলার অধীনে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিল (৪৫১)। অন্য একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। এই শাখা তাহাদের শাসক পরিবারের নাম অনুসাবে "ইয়ে-থা" বা হেফাথালাইটস্ (Hephathalites) নামে পরিচিত হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগকে "শ্বেত হূণ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্কন্দগুপ্ত হূণগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন (আঃ ৪৬০)। তিনিই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট। তাঁহার সময়েও গুপ্ত সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।

হূণ আক্রমণ

হূণ আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।—স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজগণের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। এই বংশের কয়েকজন

উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্ত। বুধগুপ্ত ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্য সম্ভবত পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অতঃপর হূণগণই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে চূড়ান্ত আঘাত হানিল। ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সাসানীয় বংশীয় রাজা ফিরোজকে হত্যা করিয়া হূণগণ কাবুল ও পারস্য অধিকার করিল এবং খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল। বল্‌খে তাহাদের রাজধানী ছিল। এখন তাহারা তাহাদের রাজা তোরমানের নেতৃত্বে পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। সম্ভবত তোরমান মধ্য মালব পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

তোরমান

মালবের এরন নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপি হইতে জানা যায়, ভানুগুপ্তের সময়ে মালবে একটি ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ঐ যুদ্ধ ভানুগুপ্ত ও তোরমানের মধ্যেই হইয়াছিল। তোরমানের রাজ্য সম্ভবত ভারতবর্ষের বর্তমান উত্তর প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে বিস্তৃত ছিল। জৈন শাস্ত্র অনুসারে জানা যায়, তোরমান জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীর তীরে শেষ জীবনে বাস করিয়াছিলেন। তোরমানের পর তাঁহার পুত্র মিহিরকুল বা মিহিরগুল রাজা হন। 'রাজতরঙ্গিণী' এবং ইউয়ান চোয়াং, সুং-ইউয়ান প্রভৃতি চীনা পর্যটক ও মিশরীয়-গ্রীক কোস্মাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে দশপুরের রাজা যশোধর্মণ এবং মগধের রাজা বলাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এই বলাদিত্য ও নরসিংহগুপ্ত একই ব্যক্তি। মিহিরকুল যশোধর্মণের নিকট পরাজিত এবং বলাদিত্যের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, পরে বলাদিত্য তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলে তিনি কাশ্মীরে গিয়া আশ্রয় লন এবং আশ্রয়দাতা কাশ্মীররাজকে হত্যা করিয়া কাশ্মীর অধিকার করেন। ইউয়ান চোয়াংয়ের এই বিবরণকে অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না।

মিহিরকুল

কারণ তোরমানের আমলেও কাশ্মীর হূণ অধিকারে ছিল। যাহাই হউক, মিহিরকুল আরও প্রায় পনের বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শাকলে (শিয়ালকোটে)। যশোধর্মণের একটি লিপি হইতে জানা যায়, মিহিরকুল "স্থাণু" বা শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার পরেও হূণগণ দীর্ঘকাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে ঈশানবর্মণ, প্রভাকরবর্ধন প্রভৃতি উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণকেও হূণদেব সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

ক্রমেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি, আয়তন ও মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছিল। গুপ্তবাজগণ মালব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও উত্তর বঙ্গে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতিহাসে "পববর্তী গুপ্ত" নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে গুপ্ত রাজগণ।—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরেও গুপ্তরাজগণ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, গুপ্তবংশীয় রাজগণ ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দেও জব্বলপুর অঞ্চলে এবং ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দেও উত্তর বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলেই সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ) ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সমতটের অধিপতি গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন করদ রাজা ছিলেন। উত্তর বঙ্গ "পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি" নামে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তভু ক্ত-ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভানুগুপ্ত নামে গুপ্তবংশীয় এক রাজা উত্তর ভারতে বাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য উত্তর বঙ্গ হইতে পূর্ব মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভানুগুপ্তের সময়ে রাজপুত্রদেব নামে এক ব্যক্তি পুণ্ড্রবর্ধনের (উত্তর বঙ্গের) রাজ্যপাল ছিলেন। ভানুগুপ্তের পরে সম্ভবত তিনজন গুপ্তবংশীয় রাজা বিহার ও বঙ্গদেশে রাজত্ব কবেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কালিঘাটের নিকটবর্তী স্থানে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য নামে গুপ্তবংশীয় এক রাজার নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্য নামে গুপ্তবংশীয় এক বাজার নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রাও পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইঁহাদের শাসনকাল, পরিচয় বা কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে

গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্ত ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকের মতে, মহাবীর শশাঙ্ক প্রথমে মহাসেন গুপ্তের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। শশাঙ্কের অভ্যুত্থানের ফলেই বঙ্গদেশে গুপ্ত শাসনের অবসান হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা চলে।

ফা-হিয়েনের বিবরণ।—গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি গোবী মরুভূমি পার হইয়া, খোটানের পর্বতময় অঞ্চল অতিক্রম করিয়া, পামীরের উচ্চভূমি, সোয়াত ও গান্ধার অঞ্চল ধরিয়া ভারতে আসেন। তিনি ভারতে ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। তাঁহার পর্যটনের উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যগণের পূতাস্থি এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা। তিনি ফিরিবার সময়ে বিখ্যাত তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) বন্দর হইতে জাহাজে করিয়া সিংহল ও যবদ্বীপের পথে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়াছে।

আগমন ও অবস্থানকাল

ফা-হিয়েন তাঁহার বিবরণীতে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ না করিলেও তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি তথায় দুইটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ বিহার দেখেন। এই বিহার দুইটিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে "মহাযান" ও "হীনযান" সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা শিক্ষালাভের জন্য আসিতেন। পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "ইহা মনুষ্যনির্মিত নহে, ইহা দানবের কীর্তি।" পাটলিপুত্রে ঐ সময় সুন্দর একটি হাসপাতাল ছিল। সেখানে রোগীদের বিনাব্যয়ে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইত। লোকে খুবই দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিল। ধনীরা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দান করিতেন। অনেক বৈশ্য পরিবার

পাটলিপুত্রের বর্ণনা

দান ও দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। রাজ্যের সর্বত্র পথের ধারে এবং বড় শহরে অসংখ্য পান্থনিবাস ছিল।

মধ্য ভারতে (মধ্যদেশে) চণ্ডাল ভিন্ন অন্য সকল জাতির লোকই নিরামিষাশী ছিল। রাজা বা তাঁহার কর্মচারীরা প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিতেন না। প্রজাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। মৃত্যুদণ্ড ও শারীরিক দণ্ড প্রচলিত ছিল না। অপরাধীদের অর্থদণ্ড হইত। কেবল কেহ বার বার রাজদ্রোহ করিলে তাহার দক্ষিণ হস্তটি কাটিয়া দেওয়া হইত। রাজার দেহরক্ষী ও পরিচারকগণ নির্দিষ্ট বেতন পাইত।

সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য

পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। মথুরাতেও বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছিল। তবে মধ্য ভারতে (মধ্যদেশে) হিন্দুধর্মই ছিল প্রবল। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাদ-বিদ্বেষ ছিল না। সকলেই শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিত। (এ প্রসঙ্গে গুপ্তযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত আলোচনাও দ্রষ্টব্য।)

পরধর্মসহিষ্ণুতা

গুপ্তযুগে শাসন-ব্যবস্থা।—গুপ্তরাজগণের আমলে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রজাতন্ত্রগুলি প্রায় লোপ পাইয়াছিল এবং রাজতন্ত্রই আদর্শ রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাটিও অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" হইতে জানা যায়, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমলে রাজা নিজেকে প্রজাদের অনুগত ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে জগৎ-পালক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইতেন। কিন্তু গুপ্ত যুগে সে নিয়মেরও পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত পুত্রগণের মধ্যে যোগ্যতমকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজতন্ত্র

গুপ্ত সম্রাটগণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেগুলিতে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার সহিত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। ঐ

অংশগুলিকে 'দেশ' বা 'ভুক্তি' বলা হইত। 'দেশ' ও 'ভুক্তি'র শাসনভার 'উপরিক', 'উপরিক মহারাজ' ও 'গোপ্তৃ'-গণের উপর ন্যস্ত থাকিত। ঐ সকল পদে অনেক সময় রাজকুমারগণ নিযুক্ত হইতেন। দেশ ও ভুক্তিগুলি আবার জেলায় বিভক্ত হইত। জেলাগুলিকে 'প্রদেশ' ও 'বিষয়' বলা হইত। জেলাগুলির শাসনকার্য স্বয়ং সম্রাটের বা দেশ ও ভুক্তির শাসনকর্তাদের অধীনে রাজকর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। জেলাগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনকার্য 'গ্রামিকের' উপর ন্যস্ত থাকিত।

শাসন-ব্যবস্থা

সম্রাটই শাসন ও বিচার বিষয়ে সর্বময় কর্তা ছিলেন। যুদ্ধকালে সাধারণত তিনিই সৈন্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু শাসন, সমর ও বিচার বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে 'মন্ত্রী', 'সান্ধিবিগ্রহিক' ও 'অক্ষপটলাধিকৃতে'র পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রী গোপনে সম্রাটকে পরামর্শ দিতেন ; সান্ধিবিগ্রহিক যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করিতেন। অক্ষপটলাধিকৃতের উপর সরকারী কাগজ-পত্রের ভার থাকিত। সামরিক কার্য পরিচালনার জন্য 'মহাবলাধিকৃত' ও 'মহাদণ্ডনায়ক' নামে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থাকিতেন। 'কুমারামাত্য' নামেও এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। গুপ্ত সম্রাটগণ সামরিক শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। তাই রাজকর্মচারীদের সকলকেই প্রয়োজন হইলে সামরিক কার্য করিতে হইত। সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী বলিয়া কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। সৈন্যদল হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী, এই প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। রথের ব্যবহার ক্রমেই বন্ধ হইতেছিল।

রাজকর্মচারী

সৈন্যবাহিনী

চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। রাজকর্মচারিগণ নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন। তাঁহারা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেন না। রাজদণ্ডের কঠোরতা খুবই হ্রাস পাইয়াছিল। কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত না। কেহ বারে বারে রাজদ্রোহ করিলে তাহার কেবল দক্ষিণ

বিচার

হস্তটি কাটিয়া দেওয়া হইত। অপরাধীদের অর্থদণ্ড হইত। স্থানীয় শাসকগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন করও ধার্য করিতেন। সম্রাটের খাস জমি, খনি এবং সামন্তরাজগণের দেয় কর হইতে রাজকোষে প্রচুর অর্থ আসিত।

রাজস্ব

গুপ্তযুগে সামাজিক অবস্থা।—ফা-হিয়েন ঐ সময়কার মধ্য ভারত সম্পর্কে বলেন, দেশে অসংখ্য লোক বাস করিত। তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। তাহাদিগকে আইনের আশ্রয় লইতে হইত না। সকল সম্প্রদায়ের লোকই খাদ্য, পানীয় ও শয্যা দিয়া অতিথিসংকার করিত। দেশে দাতব্যশালা ও চিকিৎসালয়ের অভাব ছিল না। রুগ্‌ণ ও দুঃস্থের জন্য আশ্রয় ও সেবার সুব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় ধনীরা সেগুলির ব্যয় বহন করিতেন। পাটলিপুত্রে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের দুইটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার ছিল। সেগুলিতে দেশ-বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা আসিয়া সমবেত হইত।

গুপ্ত সম্রাটগণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও দেশে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অভাব ছিল না। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে বাংলাদেশে, পাঞ্জাবে ও মথুরায় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। তবে হিন্দুধর্ম ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছিল। অন্যপক্ষে কোন কোন গুপ্ত সম্রাট অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সাধারণভাবে হিন্দুধর্মে জীবহিংসাকে ঘৃণা করা হইতেছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, চণ্ডাল ব্যতীত মধ্য ভারতের লোকেরা নিরামিষাশী ছিলেন। চণ্ডালরা সম্ভবত প্রাণিবধের কাজে নিযুক্ত থাকিত বলিয়াই অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহারা শহরে প্রবেশ করিলে কাঠের দ্বারা শব্দ করিত এবং সেই শব্দ শুনিয়া লোকে সরিয়া যাইত। হিন্দু সমাজে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মমত খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। গুপ্তরাজগণ বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত "পরম ভাগবত" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলেও মৌর্যোত্তর যুগ হইতেই উহা ক্রমে প্রবল হইতেছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে যে অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনা করা হইয়াছিল, বিষ্ণুই

ধর্ম

ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, বৈদিক যুগের সূর্য এবং মহাভারতের কৃষ্ণই পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুরূপে পূজিত হন।

ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্ম

বিষ্ণুর চক্র সূর্যের প্রতীক মাত্র। বিষ্ণু ও ভগবান্ অভিন্ন। তাই বিষ্ণুর উপাসকগণ "ভাগবত" নামেও পরিচিত। ঐ সময়ে দেশে বহু ধর্ম ও ধর্মমত প্রচলিত থাকিলেও ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ ছিল না। হিন্দু সমাজে বর্ণভেদের কড়াকড়ি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই।

বর্ণভেদ

ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্ররাও সৈন্যদলে কাজ করিত, ক্ষত্রিয়রাও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। হূণগণ গুপ্তযুগেই ভারতে আসিয়াছিল। তাহারা পরে রাজপুত ক্ষত্রিয়রূপে হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিল। উহা হইতে বোঝা যায়, হিন্দুসমাজের দ্বার তখনও উন্মুক্ত ছিল।

সমাজে নারীর স্থান ক্রমেই সংকুচিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তাহা হইলেও তখনও তাঁহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন নাই। উচ্চবংশীয়া রমণীরা প্রায়ই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন। রাজ-

সমাজে নারীর স্থান

কুমারী ও রাজমহিষীরা অনেক সময় রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। তবে পুরুষের তুলনায় তাঁহাদের অধিকার অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয়াদের মধ্যে সহমরণ ও সতীদাহও প্রচলিত হইতেছিল।

গুপ্তযুগে অর্থনৈতিক অবস্থা।—স্মরণাতীত কাল হইতে কৃষিই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। গুপ্তযুগে কৃষি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভূমির চূড়ান্ত মালিকানা রাজার হস্তে থাকিলেও গ্রামবাসী স্বাধীন কৃষকগণই ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য হইতেন। গ্রামবাসিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধভাবে ভূমি ভোগ করিতেন। রাজা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব রূপে পাইতেন। শস্যোৎপাদন ও কৃষিকার্যের উপর গুপ্ত যুগে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত। শস্য, কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি চুরি করিলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। স্মৃতিকার বৃহস্পতি দশ কুম্ভের

অধিক শস্য অপহরণের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাঁধ নষ্ট করিলেও কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। পশু শস্য বা কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি করিলে পশুর মালিক ক্ষতিপূরণ ও অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকিত। কর্ষণের জন্য লাঙল ব্যবহৃত হইত। স্মৃতিকার শুক্র যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, দুই হইতে ষোল পর্যন্ত সংখ্যক বৃষ এক-একখানি লাঙল টানিবার জন্য নিয়োজিত হইত। ধান্য ও গোধূম প্রধান খাদ্যশস্য ছিল। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে প্রায়ই বাংলাদেশের ধান্যক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য ছিল গোধূম (গম)। যব, তিল এবং দালও প্রধান শস্য ছিল। অমরকোষে কৃষিক্ষেত্রকে গোধূম, ধান্য, যব, তিল ও দালের উৎপাদনের উপযোগিতার দিক হইতে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইক্ষুর চাষও প্রচুর পরিমাণে হইত। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে কৃষকবধূগণ ইক্ষুর ছায়ায় বসিয়া শালীধান্যের ক্ষেত্রে পাহারা দিতেছে, এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। তুলা ও শণের চাষও প্রচুর পরিমাণে হইত। কালিদাস দক্ষিণ ভারতে মরিচ ও এলাচ চাষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে তাল ও নারিকেলের উল্লেখও কালিদাসের রচনায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। কালিদাস ও অন্যান্য লেখকের রচনায় আম্রের উল্লেখও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। পান, সুপারি, তেঁতুল, সরিষা, রাই, লঙ্কা, আদা ও বহুবিধ মসলা এবং নীলের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত।

কৃষি

গুপ্তযুগে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইলেও দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব যে দেশে দেখা দিত না, তাহা বলা যায় না। তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরের রচনায় দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতি সম্পর্কে অসংখ্য উল্লেখ ও ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। অতিবৃষ্টি ও বন্যা, অনাবৃষ্টি ও জলাভাব, পতঙ্গাদির উপদ্রব এবং যুদ্ধ, এইগুলিই ছিল শস্যনাশের প্রধান কারণ। দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভিক্ষগুলি প্রায়ই ভয়ংকর আকার ধারণ করিত এবং দেশে মড়ক ও মহামারী দেখা দিত।

দুর্ভিক্ষ

গুপ্তযুগে দেশে প্রচুর পরিমাণে বসতিবিস্তার এবং গ্রাম ও নগরীর স্থাপনা হইলেও অরণ্যের অভাব ছিল না। অরণ্যগুলি প্রকৃত জাতীয় সম্পদ্

ছিল। অরণ্য কেবল বারিপাত ও মৃত্তিকাকে সরস রাখিবার কাজেই সাহায্য করিত না, প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ ও জ্বালানী সরবরাহ করিত। তাহা ছাড়া অরণ্যগুলি হস্তী, মৃগ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বন্য জীবের আবাসস্থল ছিল। যুদ্ধের জন্য হস্তী ছিল অপরিহার্য। হস্তিদন্ত ভারতীয় শিল্পের একটি প্রধান উপকরণ ছিল। চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যরূপে পরিগণিত হইত। কাষ্ঠসংগ্রহ ও মৃগয়ার দ্বারা বহুসংখ্যক লোকে জীবিকানির্বাহ করিত।

অরণ্য সম্পদ্

কেবল বন্য জীবজন্তু নহে, গৃহপালিত জীবজন্তুও ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিত। কৃষিকার্য ও দুগ্ধজাত খাদ্য সরবরাহের জন্য গোজাতিকে অতিশয় পবিত্র মনে করা হইত। গোপালনের জন্য রাখালগণ প্রতি আট দিনে একদিনের সমগ্র দুগ্ধ পারিশ্রমিকরূপে পাইত। তাহা ছাড়া একশত গোরু চরাইবার জন্য একটি বকনা এবং দুইশত গোরু চরাইবার জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী রাখাল প্রতি বৎসর পাইত। গোজাতি কিরূপ শ্রদ্ধা পাইত, তাহা কালিদাসের রঘুবংশে রাজা দিলীপ ও রানী সুদক্ষিণার পুত্রলাভার্থে নন্দিনী গাভীর পূজার অনুপম বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। গোবধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গো-অপহরণ অপরাধের জন্য স্মৃতিকার বৃহস্পতি অপহারকের নাসিকা ছেদন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জলে নিক্ষেপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্বতর (খচ্চর), কুকুর, হস্তী প্রভৃতিও গৃহপালিত প্রাণী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। অশ্ব প্রধানত আরব ও পারস্য হইতে আমদানী হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অশ্ব পাওয়া যাইত। কালিদাসের কাব্যে দেখা যায়, রাজা রঘুকে কম্বোজরাজ তাঁহার বশ্যতার নিদর্শনরূপে অসংখ্য সবল অশ্ব উপহার দিতেছেন।

পশুপালন

ভূমি ও অরণ্য সম্পদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতের খনিজ সম্পদ্। খনিগুলির মালিক ছিলেন রাজা। কিন্তু খনিগুলিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ সময় স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ ও অভ্রের খনিতে কাজ হইত। অমরকোষে ও বরাহমিহিরের "বৃহৎসংহিতায়" এ বিষয়ে

বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সম্ভবত ভারতে রৌপ্যের কোনও খনি ছিল না, রৌপ্য খুব সম্ভব সিংহল ও আফগানিস্থান হইতে ভারতে আমদানী করা হইত। গুপ্তযুগে খনির কাজ ও ধাতুশিল্প অত্যন্ত উন্নত হইয়াছিল; ধাতুশিল্প ৬৪ কলার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইত। পুরাতাত্ত্বিকগণ গুপ্তযুগের হাতুড়ি, কুড়াল, বাইস, সছিদ্র লৌহফলক, তালা, চামচ, দরজার কড়া, ছোরা ও কড়াই আবিষ্কার করিয়াছেন। গুপ্ত যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার নির্মাণশিল্প অত্যন্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাতাত্ত্বিকগণ আজও তাহার নিদর্শন আবিষ্কার করিতে না পারিলেও কালিদাস প্রভৃতি কবির রচনায় সেগুলির যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা হইতে সেগুলির অপরূপ রচনানৈপুণ্য কিছুটা অনুমান করা যায়। বহু মূল্যবান্ রত্নও খনি হইতে সংগৃহীত হইত। অন্যতম উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য ছিল লবণ। সমুদ্র হইতেও লবণ সংগৃহীত হইত। দক্ষিণ ভারতে নদী ও সমুদ্র হইতে ব্যাপকভাবে প্রবাল (মুক্তা) সংগৃহীত হইত। রঘুবংশে দেখা যায়, রাজা রঘুকে পাণ্ড্য দেশের রাজা তাম্রপর্ণী নদী হইতে সংগৃহীত বহুমূল্য মুক্তাবলী উপহার দিতেছেন। শঙ্খ ভারতীয়গণের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইত। সমুদ্র হইতে শঙ্খসংগ্রহ ও শঙ্খ দিয়া বিভিন্ন দ্রব্য নির্মাণ গুপ্তযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প ছিল।

খনিজ দ্রব্য

সামুদ্রিক দ্রব্য

বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প ও চর্মশিল্প গুপ্তযুগে অত্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। নানারূপ প্রসাধন দ্রব্যের উৎপাদন শিল্পও গুপ্তযুগে বিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বাৎসায়নের "কামসূত্রে", বরাহমিহিরের "বৃহৎসংহিতায়" এবং কালিদাসের রচনায় অসংখ্য প্রসাধন-দ্রব্যের এবং স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতুনির্মিত মুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্যান্য শ্রমশিল্প

দেশে স্বাধীন শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তবে বাধ্যতামূলক শ্রমনিয়োগ ও ক্রীতদাস প্রথাও প্রচলিত ছিল। স্মৃতিকার মনু সাত প্রকার ক্রীতদাসের এবং স্মৃতিকার নারদ পনের প্রকার ক্রীতদাসের বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য দেশে সুনিয়মিত ব্যবস্থা ছিল। তরুণ শিক্ষার্থীরা দক্ষ

কারিগরদের নিকট শিক্ষানবীশি করিত। শিক্ষার্থীরা "শিক্ষক" ও শিক্ষাদাতারা "আচার্য" নামে অভিহিত হইত। শিক্ষার্থী আচার্যের গৃহে থাকিয়া শিল্পশিক্ষা করিত। স্মৃতিকারগণ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন। আচার্য শিক্ষার্থীকে পুত্রের ন্যায় দেখিবে এবং শিক্ষার্থী আচার্যকে ত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনা চলিবে। পলায়িত শিক্ষার্থীর শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষাশেষে শিক্ষানবীশ নির্দিষ্ট কালের জন্য আচার্যের গৃহে থাকিত। অবশেষে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে আচার্যকে প্রচুর পরিমাণে উপহার দিয়া যাইত। বিভিন্ন শ্রমশিল্পগুলি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিত। ঐ সকল সংঘ 'শ্রেণী", "নিগম" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন বৈশালীতে খননকার্যের ফলে গুপ্তযুগের বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও শ্রমশিল্পী সংঘের সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত যুগের একটি লিপি হইতে জানা যায়, উত্তর প্রদেশে তেলীদের একটি স্থানীয় "শ্রেণী" সূর্য-মন্দিরের জন্য নিয়মিত তৈলসরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মালবের দশপুরে প্রাপ্ত একটি লিপি হইতে জানা যায়, তাঁতীদের একটি সংঘ ৪৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি সূর্য-মন্দির নির্মাণ এবং পরে ৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উহার সংস্কার করেন। "সমূহ", "বর্গ" প্রভৃতি নামে পরিচিত বহু ব্যাপকতর সংঘও প্রচলিত ছিল। সংঘের ক্ষতি হইতে পারে, এমন কার্যের জন্য সংঘের সদস্যকে স্মৃতিকারগণ শাস্তিদানের বিধান দিয়াছিলেন।

শ্রমিক ও শ্রমশিল্প শিক্ষা

শ্রেণী, নিগম ইত্যাদি

গুপ্তযুগে দেশে যেরূপ কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে উভয়তই গুপ্তযুগে ভারতীয়গণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যগুলি প্রধানত গ্রাম্য বাজারে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য বিক্রয় হইত। উদ্‌বৃত্ত দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্য শহরে যাইত। কালিদাসের রচনায় শহরের বাজার ও বেচাকেনার সুন্দর বর্ণনা আছে। দোকানগুলি প্রশস্ত রাজপথের দুই দিকে সারিবদ্ধভাবে থাকিত। উৎসবকালে বাজারগুলি যে সুসজ্জিত করা হইত, তাহা "কুমারসম্ভব" কাব্যে

শিবের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাজার সাজাইবার অনুপম বর্ণনা হইতে সহজে বোঝা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য কেবল স্থানীয় গ্রাম বা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকিত না। ভারতের এক অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্য অন্য অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রেরিত বা আনীত হইত। সেজন্য স্থলপথ ও নদীপথ ব্যবহৃত হইত। প্রধান ব্যবসায়িগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—"শ্রেষ্ঠী" বা "নগরশ্রেষ্ঠী" এবং "স্বার্থবাহ"। শ্রেষ্ঠিগণ সাধারণত শহরের ব্যবসায-বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহারা আধুনিক ব্যাঙ্কারদেব ন্যায় টাকার লেন-দেনও করিতেন। অন্যপক্ষে, স্বার্থবাহগণ দলবদ্ধভাবে পণ্যদ্রব্য লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে যাত্রা করিতেন। স্বার্থবাহগণের জীবন কিরূপ বিপদসংকুল ছিল কালিদাস তাঁহার "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকে তাহার সুন্দর একটি বিবরণ দিয়াছেন। ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ার পথে চীনদেশে ব্যবসায় চলিত, তাহার বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে কিছুটা অনুমান কবা যায়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

শ্রেষ্ঠী ও স্বার্থবাহ

গুপ্তযুগে ভাবতীযগণ স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে মিশর, গ্রীস, রোম সাম্রাজ্য, পারস্য, আরব, সিরিযা, সিংহল, কাম্বোডিযা, সিযাম, সুমাত্রা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীন প্রভৃতি দেশের সহিত ব্যবসায-বাণিজ্য করিতেন। স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য যেমন দস্যু-তস্করের জন্য বিপজ্জনক ছিল, জলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্যও তেমনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলদস্যুর জন্য নিরাপদ ছিল না। ফা-হিয়েনের রচনা হইতে তৎকালীন সমুদ্রযাত্রার ভয়াবহ বিবরণ পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন দেশে ফিরিবার পথে সমুদ্রযাত্রাকালে নিজে ঐ কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও ভারতীয়গণ বিপদ তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রে পাড়ি দিতেন, দেশ হইতে দেশান্তরে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাত্রা করিতেন। ঐ সময়ে তাম্রলিপ্তি, ভৃগুকচ্ছ (বরোচ), কালিয়ানা (কল্যাণ), চৌল, মাঙ্গালোর, মালে (মালাবার), সলপত্তন, নলপত্তন, পাণ্ডোপত্তন প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল। সিংহল ছিল ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি। নানারূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বিলাসদ্রব্য ও মসলা ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের

প্রধান পণ্য ছিল। চীনের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য এই যুগে বিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই চীনের সহিত বাণিজ্য চলিত চীনদেশ হইতে "চীনাংশুক", "চীনপট্ট" প্রভৃতি নামে অভিহিত রেশমী কাপড় ভারতে আমদানী হইলেও ভারত হইতে সূক্ষ্মবস্ত্র যে চীনদেশে রপ্তানী হইত, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বহির্বাণিজ্য

রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক কুষাণ যুগ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং গুপ্তযুগে তাহা অব্যাহত ছিল। গুপ্তযুগে ভারতীয় স্বর্ণ মুদ্রা রোমক মুদ্রার অনুকরণে "দিনার" নামে অভিহিত হইত। রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, উহা হইতে অনুমান করা যায়। গথ নেতা আলারিক যখন রোম নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি রোম নগরকে ধ্বংসের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়ার শর্ত রূপে তিন হাজার পাউণ্ড মরিচ ও ৪০০০ রেশমের পোশাক দাবী করিয়াছিলেন। মসলা ও রেশমী বস্ত্র ভারত হইতেই রোম সাম্রাজ্যে আসিত। তবে গুপ্তযুগে রোম সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল (৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) এবং পশ্চিমাংশ রোম নগরকে ও পূর্বাংশ বাইজান্তিয়ুমকে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রোমের বড়ই দুর্দিন চলিতেছিল ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে আলারিকের নেতৃত্বে গথগণ, ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার অধীনে হূণগণ এবং ৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেন্‌সেরিকের অধীনে ভাণ্ডালগণ রোমনগর বিধ্বস্ত করিয়াছিল। পরে ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দেও রোম লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সাম্রাজ্যরূপে রোমের অস্তিত্ব লোপ পায়। তাই গুপ্তযুগের শেষভাগে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের সহিতই যে ভারতীয় বাণিজ্য চলিত, তাহা অনুমান করা চলে। রোমের পতনের পর রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ বাইজান্তাইন সাম্রাজ্যের সহিত যে ভারতের ব্যাপক ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত, তাহা ভারতের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে আবিষ্কৃত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বাইজান্তাইন মুদ্রাগুলি হইতেও সহজেই প্রমাণিত হয়। বাইজান্তাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান তাঁহার বিধিসংকলনে শুল্ক

চীনের সহিত

রোম ও বাইজান্তাইন সাম্রাজ্যের সহিত

সম্পর্কে নির্দেশদান প্রসঙ্গে বহু ভারতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করেন। সেগুলির মধ্যে পশম, রেশম, কার্পাস, লৌহ, গন্ধদ্রব্য, মুক্তা, হীরক ও অন্যান্য বহুবিধ রত্ন, লঙ্কা, আদা, পান, এলাচ ও বহুবিধ মসলা, হাতীর দাঁত ইত্যাদি প্রধান।

ভারতীয়গণ আরব, পারস্য, মিশর, ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া), তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার সহিতও ব্যাপকভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন। মালয় উপদ্বীপ, সিয়াম, কাম্বোডিয়া, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলী, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানের সহিতও সমুদ্রপথে তাঁহাদের বাণিজ্য চলিত। এই সকল ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে ভারতীয়গণ বিদেশে বহু উপনিবেশ, এমন কি রাজ্য ও সাম্রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিলেন।

অন্যান্য দেশের সহিত

বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ আমদানির অপেক্ষা অধিক রপ্তানি করিত। ফলে বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতে আসিয়াছিল। গুপ্তযুগে মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থা যে অতি উন্নত হইয়াছিল, উহা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা গুপ্তযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাম্র মুদ্রাগুলি কাকণি, মাষ বা পণ নামে এবং রৌপ্যমুদ্রাগুলি "কার্ষাপণ" নামে অভিহিত হইত। ৪ কার্ষাপণে ১ ধানক এবং ১২ ধানক বা ৪৮ কার্ষাপণে এক "সুবর্ণ" (স্বর্ণমুদ্রা) হইত। 'সুবর্ণ' রোমক মুদ্রার অনুকরণে "দিনার" নামেও অভিহিত হইত। ৪ "সুবর্ণে" বা "দিনারে" এক "নিষ্ক" হইত। গুপ্তযুগের প্রায় ২৬০০ সুবর্ণমুদ্রা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

মুদ্রা

বিদেশে ভারতীয় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য।—মৌর্য যুগেই ভারতের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। বাহ্লীক গ্রীক ও কুষাণ আমলে তাহা ব্যাপকতর আকার ধারণ করিয়াছিল—দক্ষিণে মিশর, পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্য, উত্তরে মধ্য-এশিয়া ও চীন এবং পূর্বে মালয়, কাম্বোডিয়া, সিয়াম এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি বহু দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত হইয়াছিল। ঐ সকল দেশ ও দ্বীপের বহুস্থানেই ভারতীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়েই আফগানিস্থান,

মধ্য-এশিয়া, মালয় ও কাম্বোডিয়ায় তাঁহারা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। (এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনাও দ্রষ্টব্য।) গুপ্তযুগেও অনুরূপ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই যুগে ভারতীয়গণ অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কৌণ্ডিণ্য (কৌণ্ডিল্য) নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ আন্নাম ও কাম্বোডিয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ রাজ্য "ফু নান" নামে পবিচিত ছিল। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে ফু-নান রাজ্যে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ বাধে এবং অবশেষে চান্-তান্ (চন্দন বা চন্দ্র) নামে জনৈক হিন্দু ফু-নানের রাজা হন। তিনি ৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বা পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৌণ্ডিণ্য নামে অপর এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ ফু-নানের জনসাধারণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হন। সম্ভবত এই দ্বিতীয় কৌণ্ডিণ্যের অধীনে ভারতীয়গণ ফু-নানে ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ফু-নানে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফু-নান

কাম্বোডিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে কম্বুজ নামে একটি রাজ্য ছিল। উহা ফু-নানের অধীন ছিল। কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, কম্বু স্বায়ম্ভুব নামে কোনও ভারতীয় রাজা ঐ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নাম অনুসারে ঐ রাজ্যের নাম "কম্বুজ" হইয়াছিল। ঐ বংশের রাজা শ্রেষ্ঠবর্মণ ফু-নানের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং "শ্রেষ্ঠপুর" নামে রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভববর্মণ নামে এক ব্যক্তি কম্বুজের সিংহাসন অধিকার করিয়া নূতন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী হয় ভবপুর। তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্রবর্মণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশানবর্মণ সমস্ত ফু-নান রাজ্য অধিকার করেন। ঈশানবর্মণ ঈশানপুর নামক স্থানে তাঁহার নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত হিন্দু রাজারা এখানে রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে থাই জাতির আক্রমণের ফলে কম্বুজে

কম্বুজ

হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। নবম শতাব্দীর শেষভাগে (৮৮৯ খ্রীঃ অঃ) হিন্দু রাজা যশোবর্মণ এঙ্কোর ঠোমে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। উহার নূতন নাম হয় যশোধরপুর। যশোধরপুর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে।
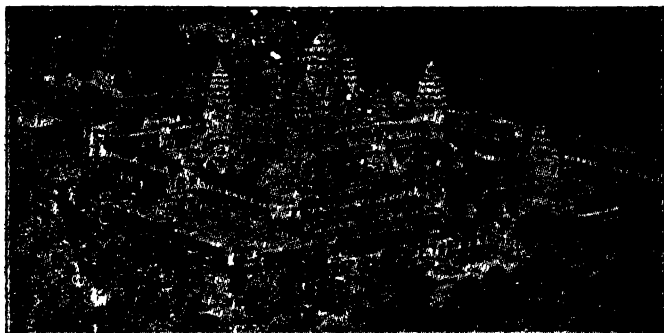
এঙ্কোর ভাটের বিষ্ণুমন্দির

কম্বুজ রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু তাহার অপূর্ব বিষ্ণু-মন্দির "এঙ্কোর ভাট"। এই মন্দিরটি পর পর সোপানশ্রেণী-পরিবেষ্টিত তিনটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর স্থাপিত। উপরের মঞ্চগুলি ক্রমান্বয়ে নিচের মঞ্চ অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। নিচের মঞ্চ হইতে উপরের মঞ্চে উঠিবার জন্য সোপানশ্রেণী রহিয়াছে। মঞ্চগুলির গাত্রে ক্ষোদিত মূর্তি ও নকশাগুলি অপূর্ব ভাস্কর্য-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দিতেছে। মন্দিরে বহু সুউচ্চ শিখর বা মিনার রহিয়াছে। এই মন্দিরটির মধ্যস্থলে যে সুউচ্চ শিখর রহিয়াছে, মাটি হইতে তাহার উচ্চতা ২১৩ ফুট। এঙ্কোর ভাট মন্দিরটি চারিদিকে প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীর দিয়া পরিবেষ্টিত। প্রাচীরেও বহু তোরণ ও গ্যালারি রহিয়াছে। প্রাচীরের বাহিরে রহিয়াছে ৭০০ ফুট প্রশস্ত একটি পরিখা। প্রাচীর হইতে নিম্নতম মঞ্চটির দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল। ইহা হইতে মন্দিরটির বিশালতা কতক পরিমাণে অনুমান করা যায়।

এঙ্কোর ভাট

কম্বুজের পূর্বে অবস্থিত ছিল চম্পা রাজ্যটি। এখানে সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেই ভারতীয়গণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে চম্পার তিনটি প্রদেশই—অমরাবতী, বিজয় ও পাণ্ডুরঙ্গ—রাজা ভদ্রবর্মণের অধীন হইয়াছিল ; ভদ্রবর্মণ মাইসনে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা সমগ্র চম্পা রাজ্যের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। চম্পা ষষ্ঠ শতকে কিছুদিন ফু-নানের অধীন ছিল, কিন্তু অত্যল্প-কালের মধ্যেই পুনরায় স্বাধীন হইয়া উঠে। চম্পা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্নামীদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে উহা মঙ্গোলগণের হস্তগত হয়।

চম্পা

মালয় উপদ্বীপটি ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল। তাই ভারতীয়গণ মালয় উপদ্বীপেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল মন্দির ও মূর্তির ধ্বংসাবশেষ, সংস্কৃত লেখমালা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। চীনা ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ভারতীয়গণ তথায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগদত্ত নামে এক রাজা আদিত্য নামে জনৈক দূতকে ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। চীনা ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ঐ রাজ্য উহার ৪০০ বৎসর পূর্বে—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে মালয় সুমাত্রার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অধীন হয়।

মালয়

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্বে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় (পালেম্বং) রাজ্যটি স্থাপিত হয়। সুমাত্রায় ইহার পূর্বেকার আর কোনও হিন্দু রাজ্যের কথা জানা যায় নাই। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ ইহার অধীন হয়। চীনা ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ৬৭০ ও ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য হইতে

সুমাত্রা

চীনের দরবারে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎ-সিং শ্রীবিজয়কে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করেন।
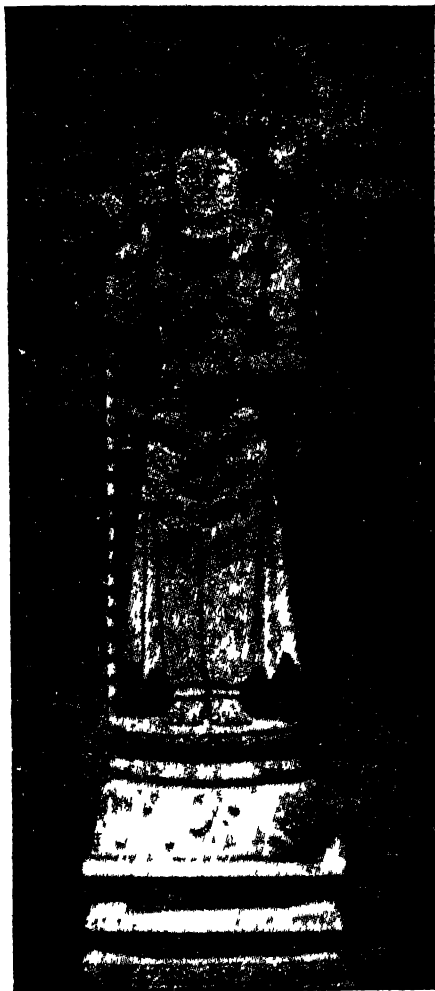
যবদ্বীপে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্তি

যবদ্বীপেও কতিপয় হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেগুলির মধ্যে দুইটি (চীনা ইতিবৃত্তে কথিত চো-পো ও হো-লো-তান) খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে নিয়মিতভাবে চীনা দরবারে দূত প্রেরণ করিত। পশ্চিম যবদ্বীপের বাতাভিয়া প্রদেশে যে চারটি সংস্কৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ণবর্মণ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা সেখানে রাজত্ব করিতেন। পরবর্তিকালে হো-লিং নামে একটি রাজ্য মধ্য-যবদ্বীপে শক্তিশালী হইয়া উঠে। হো-লিং নামটি সম্ভবত কলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর। ঐ সময় কলিঙ্গ হইতে কোনও উপনিবেশকারী আসিয়া ঐ রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন অনুমান করা চলে।

যবদ্বীপ

পূর্ব বোর্নিওর মহাকাম নদীর তীরবর্তী মুয়ারা কামানে যে সাতটি সংস্কৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বেই বোর্নিওতে হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ লিপিগুলি হইতে জানা যায়, কৌণ্ডিণ্যের পৌত্র ও অশ্ববর্মণের পুত্র রাজা মূলবর্মণ "বহুসুবর্ণক" যজ্ঞ করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে দুই লক্ষ গাভী দান করেন। কোম্বেংয়ে কতিপয় হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তযুগে বোর্নিও যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বোর্নিও

চীনা ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই বলীদ্বীপেও ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বলীদ্বীপের জনৈক রাজা চীন দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। বলীদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

বলী

অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্নিও ঐক্যবদ্ধ হইয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যরূপে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। (তাহার বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে।)

গুপ্তযুগে বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য।—গুপ্তযুগে শিল্প-সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যের পরিপূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছিল। কেবল হিন্দুশাস্ত্র নহে, বৌদ্ধ এবং জৈন শাস্ত্রগুলিও সংস্কৃত

ভাষায় লিখিত হইতেছিল। কালিদাসের ন্যায় মহাকবিও এই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্", "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" প্রভৃতি নাটক এবং "রঘুবংশম্", "মেঘদূতম্" প্রভৃতি কাব্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা দিয়াছে। "মুদ্রারাক্ষসম্"-রচয়িতা বিশাখদত্ত, "মৃচ্ছকটিকম্"-রচয়িতা শূদ্রক প্রভৃতি নাট্যকারগণও এই যুগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সাহিত্য

এই যুগেই সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত অভিধান অমরকোষের রচয়িতা অমরসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং আচার্য দিঙ্‌নাগ ও বসুবন্ধুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের উদয় হইয়াছিল। জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতেও গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬), বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭) ও ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮), এই যুগেই জন্মিয়াছিলেন। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির রচনা বহু পূর্বে আরম্ভ হইলেও গুপ্তযুগেই সেগুলি বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছিল। পুরাণের ভবিষ্যৎ রাজগণের বংশবর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি যে এই সময়েই সংযোজিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। হিন্দু সমাজের প্রয়োজন অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও বহুল পরিমাণে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলি উত্তর ভারতে ছিল এবং উত্তর ভারতেই মুসলমান আক্রমণকারীরা নির্মম হস্তে ধ্বংসকার্য চালাইয়াছিল। তাই গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলির অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সেজন্য গুপ্তযুগের শিল্পকলা সম্পর্কে অনুমান করিতে হইলে তৎকালের ও তৎপরবর্তী কালের দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার সাহায্য লইতে হয়। কারণ, সেগুলির উপর গুপ্তযুগের প্রভাব সুস্পষ্ট। উত্তর ভারতে গুপ্তযুগের যে দুই-একটি মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশের (ঝাঁসী জেলার) দেওগড়ের প্রস্তরনির্মিত মন্দির এবং কানপুর জেলার ভিতরগাঁওয়ের ইষ্টক-নির্মিত মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে হিন্দু দেবদেবী এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি

স্থাপত্য

চন্দ্ররাজ-নামাঙ্কিত দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ
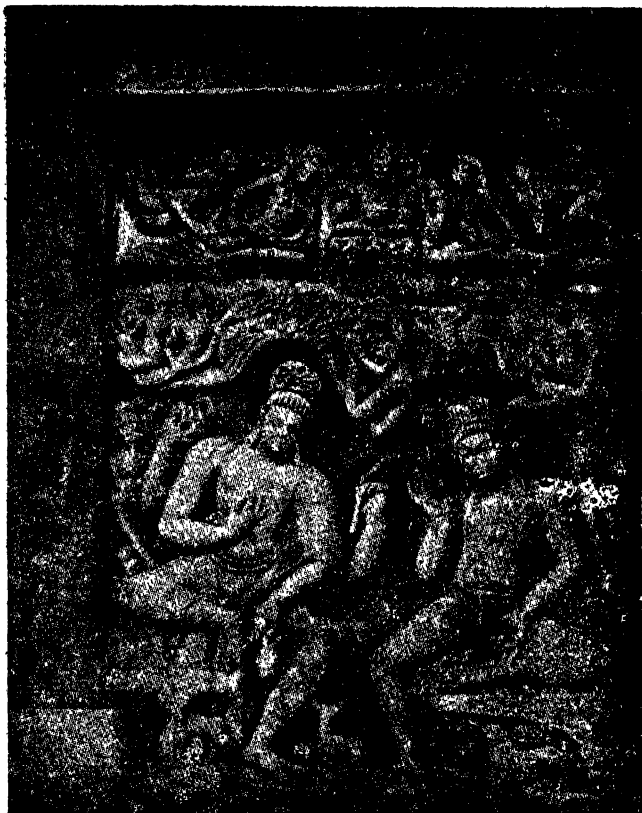
দেওগড় মন্দিরগাত্রে নরনারায়ণ মূর্তি

শিল্পের দিক হইতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। দেওগড়ের মন্দির-গাত্রে শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মূর্তি রহিয়াছে, সেগুলি অপূর্ব। সারনাথেও ঐ যুগের বহু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির একটিকে ভারতে আবিষ্কৃত সকল বুদ্ধ-মূর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। মথুরা এবং অন্যান্য অনেক স্থানেও পাথর

ভাস্কর্য
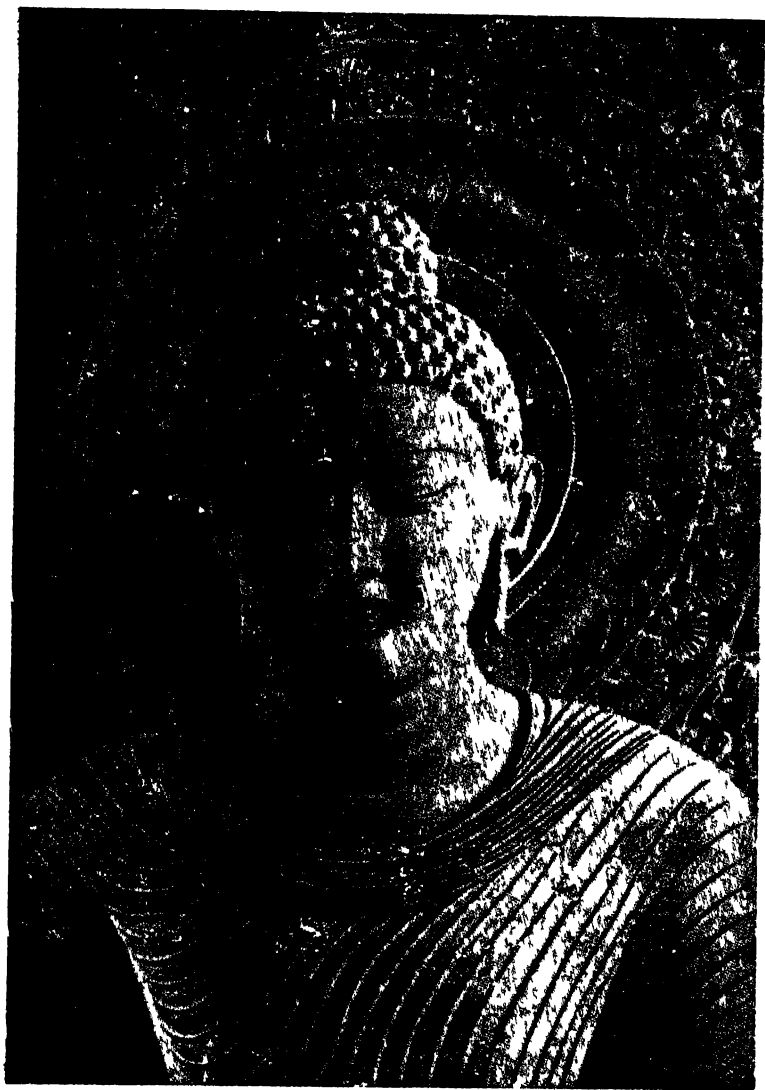
গুপ্তযুগে নির্মিত অপরূপ একটি বুদ্ধমূর্তি

ও ব্রোঞ্জের তৈয়ারী ঐ যুগের বহু বুদ্ধ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে যে শিল্পনৈপুণ্য, সুষমা ও ছন্দোময় কমনীয়তা দেখা যায়, তাহার তুলনা মেলে না।

চিত্রকলা

গুপ্তযুগের চিত্রকলার নিদর্শন উত্তর ভারতে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের বোম্বাই প্রদেশে অজন্তার গুহামন্দিরে যে সকল চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি

অজন্তার একটি প্রাচীর-চিত্র

যে গুপ্তযুগেই অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেগুলির রেখাবিন্যাস, ভাবব্যঞ্জনা ও বর্ণ-বৈচিত্র্য আজও পৃথিবীর চিত্ররসিকদিগকে বিস্মিত করে।

গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীতে কুতব-মিনারের নিকটে চন্দ্ররাজের নামাঙ্কিত যে লৌহস্তম্ভটি রহিয়াছে, তাহা গুপ্ত

যুগের গোড়ার দিকে নির্মিত হইয়াছিল। আজ ষোল-সতের শত বৎসরেও উহাতে এতটুকুও মরিচা পড়ে নাই। সেই প্রাচীনকালে এই ধরনের লৌহস্তম্ভ যে কিভাবে নির্মিত হইত, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ইউরোপে এক শত বৎসর পূর্বেও এই ধরনের লৌহ স্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। ইহা হইতে বোঝা যায়, গুপ্তযুগে ভারতীয়গণ

ধাতুশিল্প

অজন্তার আর একটি প্রাচীর-চিত্র

কেবল গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় নহে, রসায়নেও অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাম্র ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তিগুলি ধাতুশিল্পের দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগের মুদ্রাগুলিও ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তাই গুপ্ত যুগকে যে প্রাচীন ভারতের "স্বর্ণ যুগ" বলা হয়, তাহা আদৌ অকারণ বা অতিরঞ্জন নহে।

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত।—সম্রাট স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা পুষ্যমিত্র জাতি ও হূণগণের আক্রমণের ফলে ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ প্রায়ই উত্তরাধিকারসূত্রে নিযুক্ত হইতেন। কেন্দ্রীয় শাসনে শৈথিল্য আসায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তাঁহারা ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়াও গুপ্ত সম্রাটগণের বংশধরদের মধ্যে আত্মকলহ চলিতে লাগিল এবং তাঁহারা সুযোগ মতো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে শুরু করিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মালবের একাংশে দশপুরে (মান্দাসোর) যশোধর্মণ নামে এক সামন্ত রাজা স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের রচিত তাঁহার লিপি হইতে জানা যায়, তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ভারতে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন; তিনি মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত হইলেও তিনি যে একজন পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি শৈব ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, মহাকবি কালিদাস তাঁহারই সভাকবি ছিলেন। কিন্তু এই মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যশোধর্মণ "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং উজ্জয়িনীতেও তাহার রাজধানী ছিল না। তাঁহার বংশধরদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁহার সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বহু স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

দশপুরের যশোধর্মণ

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে কনৌজের মৌখরিগণ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বংশের ঈশানবর্মণ সর্বপ্রথম "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনকালের (৫৫৪ খ্রীঃ অঃ) একটি লিপি হইতে জানা

যায়, তাঁহার রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ এবং দক্ষিণে অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হূণ এবং গুপ্তবংশীয় রাজগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। পরে এই বংশের গ্রহবর্মণের সহিত থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল এবং গ্রহবর্মণ মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

কনৌজের মৌখরিগণ

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূণগণ, থানেশ্বরে পুষ্যভূতিগণ, মালবে গুপ্তগণ, কনৌজে মৌখরিগণ, বল্লভীতে মৈত্রকগণ, আসামে বর্মণগণ এবং মগধ ও গৌড়ে শশাঙ্ক নামে এক বীর রাজত্ব করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে থানেশ্বরের পুষ্যভূতিগণ ক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহাদের ইতিহাসই উত্তর ভারতের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতিগণ।—বর্তমান দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই থানেশ্বর নামে ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। পুষ্যভূতিবংশীয়গণ এখানে সম্ভবত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ত ছিলেন। হূণ আক্রমণের সুযোগে তাঁহারা ক্রমেই স্বাধীন হইয়া উঠেন। প্রভাকরবর্ধনের সময়ে থানেশ্বর খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রভাকরবর্ধন সম্ভবত গুর্জরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং গুজরাট ও কাঠিয়াবাড পর্যন্ত তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মালবের গুপ্তদের সহিত প্রথমে তাঁহার মিত্রতা এবং কনৌজের মৌখরিদের সহিত শত্রুতা ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। তিনি কনৌজ-রাজ গ্রহবর্মণের সহিত নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। মালবের গুপ্তরাজগণের সহিত মৌখরিদের দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা থাকায়, এখন থানেশ্বরের সহিত মালবের শত্রুতা হয়। ফলে মালবরাজ দেবগুপ্ত থানেশ্বর ও কনৌজের বিরুদ্ধে গৌড়ের (বঙ্গদেশ) সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। এই সময়ে গৌড়ে মহাবীর শশাঙ্ক রাজত্ব করিতেছিলেন। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বিহারের (মগধ) সুবিস্তৃত অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনিই গৌড়ের প্রথম শক্তিশালী সম্রাট। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। থানেশ্বরের দক্ষিণে ও পূর্বে যখন দুই বীর এইভাবে সংঘবদ্ধ

প্রভাকরবর্ধন

হইতেছিলেন, তখন পশ্চিমে হূণগণ নীরব ছিল না। ফলে থানেশ্বরের সহিত হূণগণের যুদ্ধ বাধিল। প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন হূণগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি থানেশ্বরে ফিরিবার পূর্বেই প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হইলেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাহায্যে কনৌজ আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ নিহত ও রানী রাজ্যশ্রী কারাগারে বন্দিনী হইলেন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন দ্রুত সসৈন্যে কনৌজে আসিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হস্তে নিহত হইলেন। রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার হইতে কোনক্রমে বিন্ধ্যারণ্যে পলাইয়া গেলেন।

রাজ্যবর্ধন

হর্ষবর্ধন।—রাজ্যবর্ধনের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। রাজ্যের মন্ত্রী ও অভিজ্ঞাতগণ হর্ষকেই থানেশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রধান অমাত্য ভণ্ডির পরামর্শক্রমে কনৌজের সম্ভ্রান্তগণও তাহাকেই কনৌজের সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন। এইভাবে থানেশ্বর ও কনৌজ সংযুক্ত হইল এবং উত্তর ভারতের ইতিহাসে আবার একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের সূচনা হইল। এই ঘটনা সম্ভবত ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর হইতেই "হর্ষাব্দ" গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সময়ে হর্ষ সম্রাটসূচক কোনও উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজেকে "রাজপুত্র শীলাদিত্য" নামেই অভিহিত করিতেন। পরে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাটসূচক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যলাভ

থানেশ্বর ও কনৌজের শাসনভার গ্রহণ করিয়া হর্ষ প্রথমেই ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজ্যশ্রী ঐ সময়ে বিন্ধ্যারণ্যে অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হর্ষবর্ধন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। কনৌজ এখন হর্ষবর্ধনের রাজধানী হইল। অতঃপর হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

লাগিলেন। একাকী শশাঙ্ককে পরাভূত করা সম্ভব নহে বুঝিয়া তিনি গৌড়ের পূর্বে অবস্থিত কামরূপের (আসামের) রাজা ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহার সামরিক শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে ষাট হাজার হস্তী এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তথাপি শশাঙ্ককে পরাভূত করা সম্ভব হইল না। খুব সম্ভব শশাঙ্কের জীবদ্দশায় গৌড়ের শক্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় কামরূপ ও কনৌজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে হর্ষ এক বিশাল ভূভাগের অধীশ্বর হন।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান

হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য

চীনা ইতিহাস হইতে জানা যায়, ৬১৮ হইতে ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অত্যন্ত গোলযোগ চলিতেছিল এবং শীলাদিত্য (হর্ষবর্ধন) দেশের রাজাদিগকে শাস্তি দিতেছিলেন। কি ধরনের গোলযোগ বা কাহারা এ রাজা, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। চালুক্যবংশীয় রাজাদের একটি লিপি

হইতে জানা যায়, ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে হর্ষবর্ধন নর্মদা নদী পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারের জন্য অগ্রসর হইলে বাতাপির চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার গতিরোধ করেন। ফলে দাক্ষিণাত্যে হর্ষবর্ধনের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বল্লভীর মৈত্রকবংশীয় রাজার সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই বল্লভীর রাজার সহিত তাঁহার সন্ধি হয় এবং তিনি বল্লভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের (ধ্রুবভট্ট) সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষ "মগধেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ

দক্ষিণে অভিযান

ধ্রুবসেন

হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর

ঐ বৎসর মগধ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাব সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি চীনদেশের সহিত দূতবিনিময় করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন উত্তরবঙ্গে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। তবে গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ তাঁহার মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষ উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার কোঙ্গোদ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

হর্ষের সাম্রাজ্য-সীমা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে! তবে পশ্চিমে থানেশ্বর হইতে পূর্বে মগধ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা ও গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য যে বিস্তৃত ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কামরূপের ভাস্করবর্মণ, বল্লভীর ধ্রুবসেন, জালন্ধরের উদিত. মালবের মাধবগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চালুক্যগণও তাঁহাকে উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

হর্ষের রাজ্যসীমা

হর্ষ কেবল বীর ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। তিনি সম্ভবত প্রথম জীবনে শিব ও সূর্যের উপাসক ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং সম্রাট অশোকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। তিনি

সাম্রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করেন, দেশে বহু আরোগ্যশালা, পান্থনিবাস ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যে প্রাণিবধ ও মাংসাহার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তিনি

সুশাসন ও জনহিত
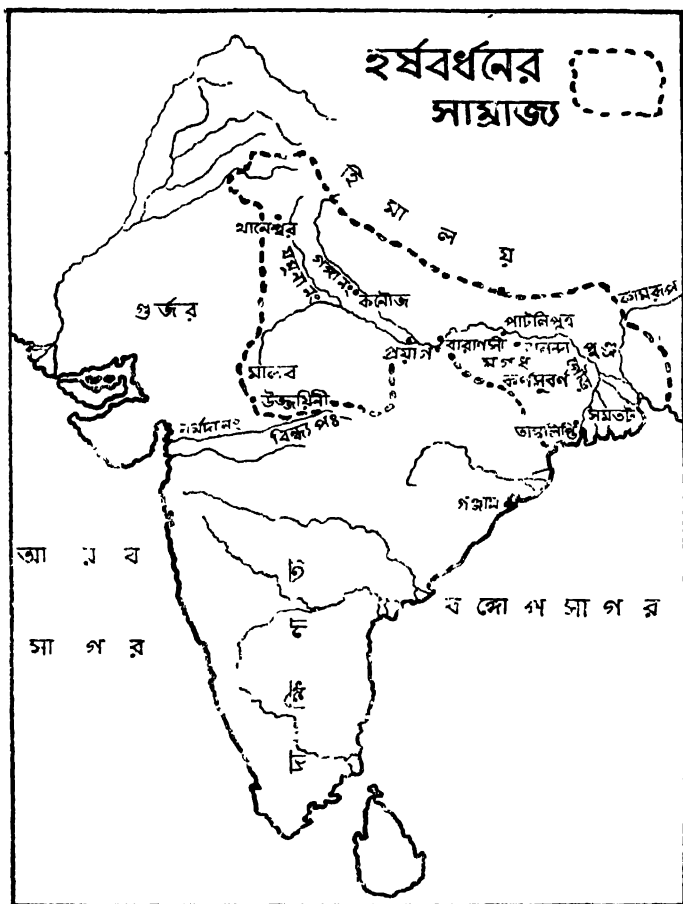
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পরেও তিনি শিব ও সূর্যের উপাসনা করিতেন।

তিনি পাঁচ বৎসর অন্তর রাজধানী কনৌজে সকল ধর্মের পণ্ডিতগণকে লইয়া একটি ধর্ম-মহাসম্মেলন করিতেন। ঐ মহাসম্মেলন "মহামোক্ষপরিষদ্" নামে পরিচিত ছিল। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগেও (এলাহাবাদে) একটি মহামেলা হইত। বিখ্যাত বৌদ্ধ চীনা পর্যটক ও ধর্মাচার্য ইউয়ান চোয়াং তাঁহার রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনৌজের মহামোক্ষপরিষদে এবং প্রয়াগের মহামেলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, ঐবার কনৌজের মহামোক্ষপরিষদে কুড়িজন রাজা এবং বহু হাজার বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন পণ্ডিত যোগদান করিয়াছিলেন। প্রয়াগের মহামেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। কুড়িজন রাজা এবং ইউয়ান চোয়াং সহ হর্ষবর্ধন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রথম দিনে বুদ্ধের, দ্বিতীয় দিনে শিবের এবং তৃতীয় দিনে সূর্যের উপাসনা করা হইত। তারপর সম্রাট কয়েক দিন ধরিয়া বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন সন্ন্যাসিগণকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। পাঁচ বৎসরে রাজকোষে যাহা সঞ্চয় হইত, তাহা সমস্তই দান করা হইত। সম্রাট তাঁহার পরিচ্ছদ ও অলংকার পর্যন্ত দান করিতেন।

মেলা ও মহামোক্ষ-পরিষদ্

হর্ষ বর্ষাকাল ভিন্ন বৎসরের অন্য সকল সময়েই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অক্লান্ত কর্মশক্তি সকলকে বিস্মিত করিত। তিনি তাঁহার রাজধানী কনৌজকে তৎকালে উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করিয়াছিলেন। তাহার শোভা পর্যটকদের বিস্মিত করিত। কনৌজের অন্য নাম ছিল "মহোদয়-শ্রী"। হর্ষের পরেও কনৌজ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণের একান্ত কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং দীর্ঘকালের জন্য পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

কনৌজ

হর্ষবর্ধন কেবল ধর্মপ্রাণ, দানশীল, বীর ও সুশাসক ছিলেন না, তিনি নিজে সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত তিনখানি নাটক—"নাগানন্দম্," "প্রিয়দর্শিকা" ও "রত্নাবলী"—সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া আছে। তিনি পণ্ডিত ও কবিদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত "কাদম্বরী"-প্রণেতা বাণভট্ট তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

বাণভট্ট

বাণভট্ট-রচিত অসম্পূর্ণ "হর্ষচরিত" হইতে হর্ষের জীবন ও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। কবি ময়ূর এবং কবি ভর্তৃহরিও সম্ভবত হর্ষবর্ধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার খাস জমির এক-চতুর্থাংশ আয় পণ্ডিত ও কবিদের জন্য ব্যয়িত হইত।

৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।

ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ।—হর্ষবধনের রাজত্ব-কালে বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ধর্মাচায ইউয়ান চোয়াং বা হিউয়েন সাং ভারতে আসেন। তিনি ২৮ বা ২৯ বৎসর বয়সে চীনদেশ হইতে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং মধ্য-এশিয়ার পথেই চীনে ফিরিয়াছিলেন। তিনি ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত ভারতবষে ছিলেন এবং কনৌজ, কামরূপ, কাঞ্চী, বাতাপি প্রভৃতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। 'সি-ইউ-কি" নামক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

ইউয়ান চোয়াং

তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে হর্ষবধনের বীরত্ব, ধর্মপ্রাণতা, দানশীলতা ও শাসননৈপুণ্য সম্পর্কে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কনৌজের

মহামোক্ষপরিষদ্ এবং প্রয়াগের মহামেলা সম্পর্কে সুন্দর বিবরণীও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়, হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ ঐ সময়ে ভারতবর্ষে পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐ শহরের দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ মাইল। বহু মঠ ও মন্দির উহার শোভাবর্ধন করিত। ঐ সময়ে ভারতীয় শহরগুলি চতুষ্কোণ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকিত। পথগুলি সংকীর্ণ ও সর্পিল ছিল। রাজপথের পার্শ্বে দোকান ও পান্থাবাস থাকিত। কশাই, জেলে, অভিনেতা, জল্লাদ ও মেথরের বাড়িগুলি শহরের বাহিরে থাকিত এবং তাহাদের বাড়ির গায়ে পেশা-সূচক চিহ্ন দেওয়া হইত। তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং পথের বাম পার্শ্ব দিয়া অতি সন্তর্পণে চলিত। শহরের প্রাচীরগুলি ইট দিয়া এবং বাড়ির দেওয়ালগুলি সাধারণত কাঠ ও বাঁশ দিয়া নির্মিত হইত। বাড়ির কড়ি-বরগাগুলিতে সুন্দর মূর্তি ও নকশা খোদাই করা থাকিত। কপাট, জানালা ও দেওয়ালগুলিতে অঙ্কিত থাকিত বহুবর্ণ চিত্র।

নগর ও গৃহশিল্প

ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছিল এবং বৌদ্ধগণ আঠারোটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ঐ সকল শাখার মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ ঘটিত। অসবর্ণ এবং মাতৃকুল ও পিতৃকুলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

ধর্ম

ভারতবাসিগণ ঐ সময়ে সেলাই-করা পোশাক পরিতেন না। তাঁহারা সাদা রঙের পোশাক খুবই পছন্দ করিতেন। মাথার উপরের চুলগুলি জটা বা বেণীর মতো করিয়া মাথার উপর বাঁধিতেন। বাকী চুলগুলি কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িত। ভারতীয়গণ মাথায় ফুলের মালা এবং গলায় হার পরিতে ভালোবাসিতেন।

বেশভূষা

ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে তিনি খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণত মিথ্যাভাষী ও প্রবঞ্চক ছিলেন না। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তবে দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ইউয়ান চোয়াং নিজেও দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। অপরাধীদের শাস্তির কঠোর

ভারতীয়গণের চরিত্র

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য খননকার্য চলিতেছে

ব্যবস্থা ছিল। অপরাধের জন্য নাক, কান ও পা কাটিয়া দেওয়া হইত।

রাজস্ব কৃষকগণ শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে দিত। রাজ্যের অধিকাংশ ব্যয় রাজার খাস সম্পত্তি হইতে নির্বাহ হইত।
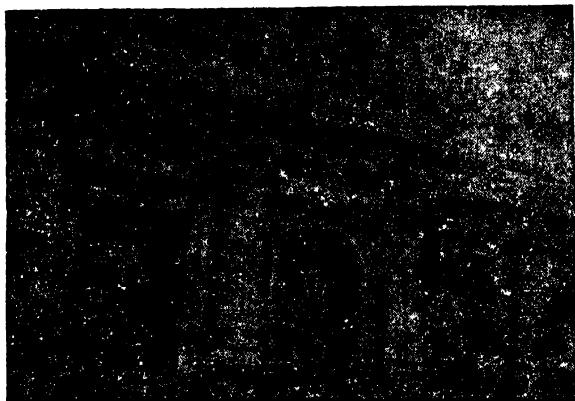
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ
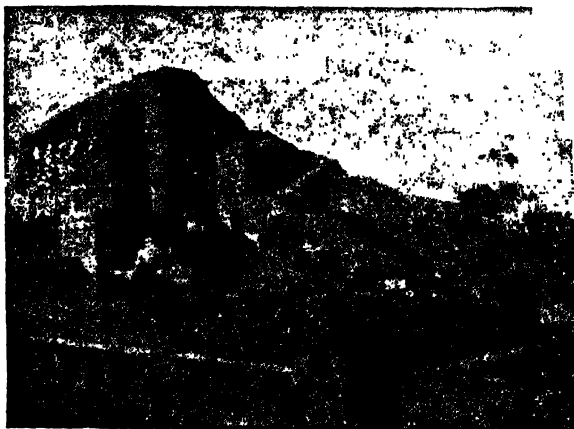
নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা গুপ্ত যুগের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

ধর্ম

হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বেশ কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, অস্পৃশ্যতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইউয়ান চোয়াং দুই বৎসর নালন্দায় ছিলেন। নালন্দা জায়গাটি এখনকার পাটনা জেলার বড়গাঁওয়ে অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য ব্যাপক খননকার্য চালাইয়াছেন। নালন্দার বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ইউয়ান চোয়াং বলেন যে, ভারতে ঐ সময়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকিলেও নালন্দা ছিল সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেখানে দেশ-বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিত। তৎকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ধর্মশাস্ত্র পড়ানো হইত না, ছাত্রদিগকে বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত ইত্যাদিও শেখানো হইত। ঐ সময় বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দা

নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করিত। ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা ছিল। ১৮০টি গ্রামের আয় হইতে নালন্দা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। ইউয়ান চোয়াং নালন্দায় একটি ৮০ ফুট উচ্চ তাম্রনির্মিত বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন।

তিনি দক্ষিণ ভারতেও পর্যটন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়। (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

হর্ষোত্তর উত্তর ভারত।—হর্ষবর্ধন অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সিংহাসন লইয়া রাজ্যে গোলযোগ বাধিল। অর্জুন বা অরুণাশ্ব নামে হর্ষবর্ধনের এক মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন অধিকার করিলেন। হর্ষ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে যে চীনা প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া-

অর্জুন

ছিলেন, অর্জুন তাঁহাদের অনেককে বধ বা বন্দী করিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতা কোনও রকমে জীবনরক্ষা করিয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নেপাল তিব্বতের অধীন ছিল। তিব্বতরাজ স্রং-ৎসান-গাম্পো একজন চীনা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চীনা প্রতিনিধিদলের এই নির্যাতনের প্রতিশোধ

গ্রহণের জন্য তিনি অর্জুনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় চীনদেশে প্রেরণ করা হইল। ইহার পর প্রায় ৭৫ বৎসর কনৌজের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (আনুঃ ৭২৫-৭৫২) যশোবর্মণ নামে এক শক্তিশালী রাজার অধীনে কনৌজ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। যশোবর্মণ সম্ভবত ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে দূত পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়ে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে তাঁহার বিজয়বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল।

যশোবর্মণ

তাঁহার দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী তাঁহার সভাকবি বাক্‌পতি-রাজ-রচিত "গৌডবহো" (গৌড়বধ) নামক কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী কতোখানি সত্য, তাহা জানা যায় নাই। যশোবর্মণ "উত্তররামচরিতম্‌", "মহাবীরচরিতম্‌" ও "মালতী-মাধব"-রচয়িতা মহাকবি ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে কর্কোটবংশীয় রাজগণের অধীনে কাশ্মীর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কহ্লণের "রাজতরঙ্গিণী" হইতে জানা যায়, কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড ললিতাদিত্যের হস্তে কনৌজরাজ যশোবর্মণ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর ভারতে পাল ও গুর্জর-প্রতিহারগণ শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই তিন প্রধান রাজবংশের দ্বন্দ্বই পরবর্তী সার্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৭১২ খ্রীঃ) আরবদেশীয় মুসলমানগণ সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্তী ভারতীয় অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। আরবগণের সহিত রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজগণের বন্ধুত্ব এবং গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজগণের স্থায়ী শত্রুতা ছিল। যাহাই হউক, অবশেষে গুর্জর-প্রতিহারগণই ত্রিদলীয় দ্বন্দ্বে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস।—প্রাচীন কালে বর্তমান উড়িষ্যার

একাংশে কলিঙ্গ নামে একটি রাজ্য খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অশোকের কলিঙ্গবিজয় ভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

অশোকের মৃত্যুর পর কলিঙ্গ "চেত" বা "চেতি" বংশীয় রাজাদের অধীনে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। চেতবংশের তৃতীয় রাজা খারবেল সম্পর্কে কিছু তথ্য বর্তমান ভুবনেশ্বর হইতে তিন মাইল দূরে উদয়গিরি নামক পাহাড়ের হাতীগুম্ফায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গিয়াছে। উক্ত লিপি খারবেলের রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহার কয়েকটি ভিন্নার্থক শব্দ হইতে জানা যায়, ঐ লিপি নন্দরাজগণের ৩০০ বা ১০৩ বৎসর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ খারবেল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা তৃতীয় শতকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ শিলালেখ হইতে আরও জানা যায়, রাজ্যলাভের পূর্বে খারবেল বিভিন্ন শিল্প-কলা, বিজ্ঞান, গণিত ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণি নামে এক রাজা তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। খারবেল দুইবার উত্তর ভারতে অভিযান করেন এবং শুঙ্গবংশীয় কোনও মগধরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্যও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে।

চেতবংশ

খারবেল জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং জৈন সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পর্বতে কতকগুলি গুহাগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী জীবন ও তাঁহার বংশধরগণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই।

খারবেল

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে প্রায় পঁয়ত্রিশটি স্থানে খননকার্যের ফলে যেসকল গুহাগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। কতকগুলি একতলবিশিষ্ট, এগুলিতে এক বা একাধিক কক্ষ সহ অলিন্দ রহিয়াছে। কতকগুলি দ্বিতলবিশিষ্ট। এগুলিতে বহু কক্ষ, অলিন্দ ও অঙ্গন রহিয়াছে। প্রবেশপথগুলির উপর অর্ধচক্রাকার খিলান আছে এবং এই অর্ধচক্রাকার খিলানের মধ্যবর্তী অংশে আছে মূর্তি ও কারুকার্যময় নকশা। এখানকার ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আছে গণেশ ও রানী গুম্ফায়। গুহাগৃহগুলি ভগ্নপ্রায়

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি
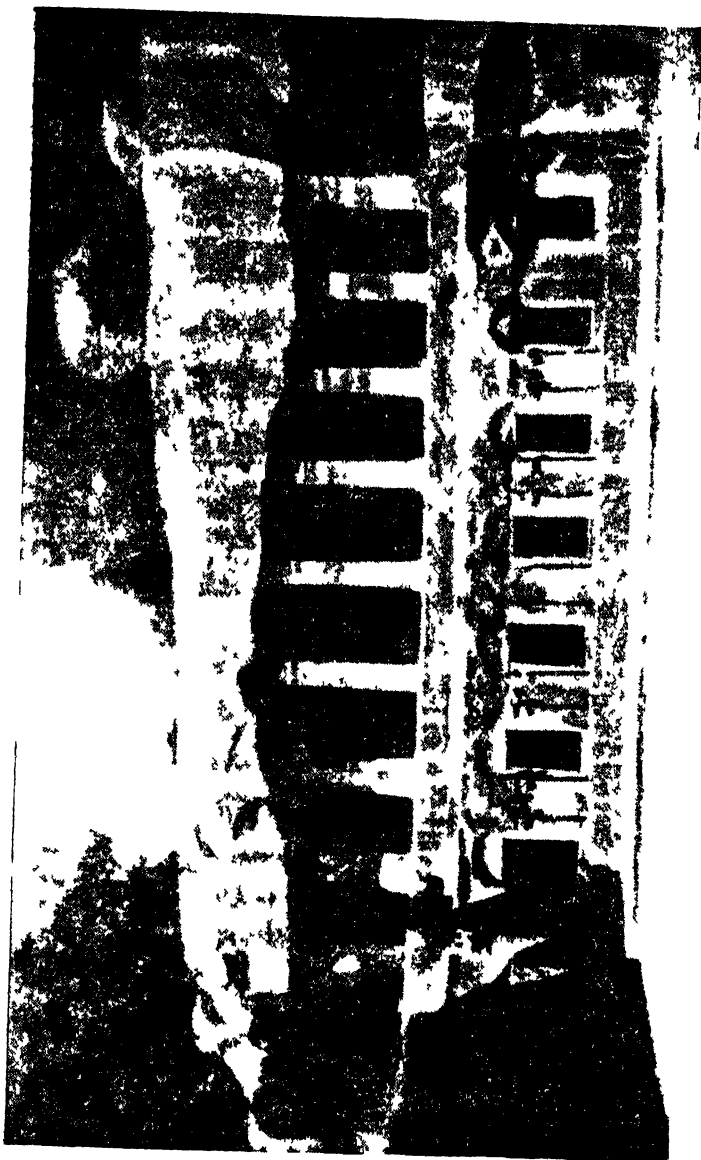
খণ্ডগিরিতে খারবেল-নির্মিত গুহাগৃহ

হইলেও এগুলি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে অনুপম নিদর্শন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রানীগুম্ফাটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার ভগ্নতাও অন্যান্য গুহাগৃহগুলির তুলনায় অল্প। ইহা দ্বিতলবিশিষ্ট। ইহার প্রত্যেক তলেই স্তম্ভশ্রেণীর উপর স্থাপিত প্রশস্ত অলিন্দ রহিয়াছে। উদয়গিরির ব্যাঘ্র-গুম্ফাটিও দেখিতে সুন্দর। দেখিলে মনে হয়, যেন একটি ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া আছে। প্রাচীনতার দিক হইতে উদয়গিরির মঞ্চপুরী ও স্বর্গপুরী নামে-পরিচিত দ্বিতল গুহাগৃহটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

চেতবংশীয় রাজগণের পর কয়েক শতাব্দী উড়িষ্যায় কোনও শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয় নাই। অতঃপর নবম ও দশম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

কামরূপের (আসামের) প্রাচীন ইতিহাস।—বর্তমান আসামের উত্তরাংশ (ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল) প্রাচীনকালে কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে এই অঞ্চলের একটি শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এখানে নরক নামে এক "অসুর" রাজত্ব করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত ও তাঁহার বংশধরগণ সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগেই কামরূপের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইতে শুরু করে। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ। তাঁহার নিধানপুরের তাম্রলিপিতে তাঁহার দশজন পূর্বপুরুষের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ছিলেন পুষ্যবর্মণ। তিনি সম্ভবত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় কামরূপ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বাণভট্টের হর্ষচরিতে ভাস্করবর্মণ, তাঁহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উল্লেখ আছে। মগধের গুপ্তরাজ আদিত্যসেনের লিপি হইতে জানা যায়, ভাস্করবর্মণের পিতা সুস্থিতবর্মণ গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কামরূপের এই রাজবংশ নিজদিগকে নরকাসুরের পুত্র ভগদত্তের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন

ভাস্করবর্মণের রাজত্বকালে কামরূপরাজ্য উত্তর ভারতের ইতিহাসে বিশেষ
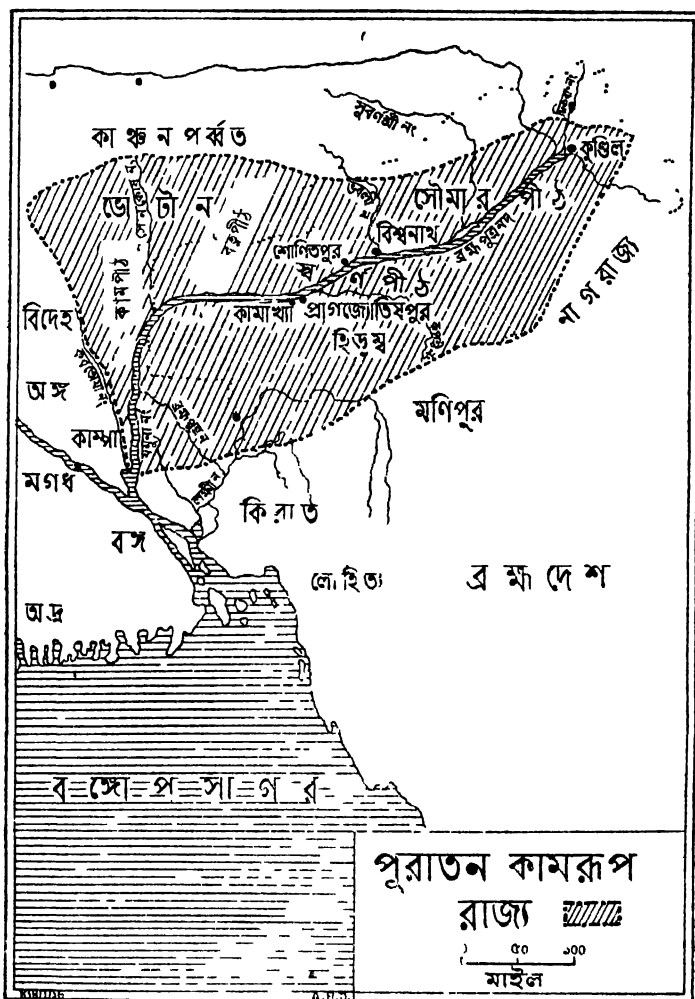
গুরুত্ব লাভ করে। গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন ভাস্করবর্মণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ভাগীরথীর পূর্ব তীর

পর্যন্ত বঙ্গদেশ ভাস্করবর্মণের অধিকারভুক্ত হয়। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হইতে তিনি যে ভূমিদানলিপি দিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। হর্ষবর্ধন কনৌজে যে ধর্ম-মহাসম্মেলন আহ্বান করেন, ভাস্করবর্মণ তাহাতে সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে চীনা পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং কামরূপে গিয়াছিলেন।

ভাস্করবর্মণের পরবর্তী কামরূপরাজগণের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly sketch the rise and fall of the Gupta Empire. Whom do you think the greatest of the Guptas? Trace the greatness of Chandra Gupta II

গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন সংক্ষেপে বর্ণনা কর। গুপ্তরাজগণের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

2. Who were the Huns? Describe their struggle against the Gupta Kings and Yasodharman. What do you know of Tormana and Mihirkula?

হূন কাহারা ছিলেন? গুপ্তরাজগণ ও যশোধর্মণের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রাম বর্ণনা কর। তোরমান ও মিহিরকুল সম্পর্কে কি জান?

3. What do you know about the two great Chinese travellers who visited India during the Gupta and post-Gupta period? What informations can we derive from their accounts? Can we mark any social, economic and religious change in Indian society during that period from a comparative study of their accounts?

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে যে দুইজন বিখ্যাত চীনা পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে কি জান? তাঁহাদের রচনা হইতে আমরা কি তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারি? তাঁহাদের রচনাগুলি তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলে ঐ সময়ে ভারতীয় সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কোনও পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি কি?

4 Why do we call the Gupta Age the Golden Age of India? Briefly trace the cultural and colonial expansion of India in that period

গুপ্ত যুগকে আমরা ভারতের স্বর্ণ যুগ বলি কেন? ঐ যুগে ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

5. Who was the last greatest Hindu Emperor? Describe his career and estimate his greatness.

শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু সম্রাট কে ছিলেন? তাঁহার জীবন ও শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

গুপ্তসম্রাটগণের বংশতালিকা

শ্রীগুপ্ত
|
ঘটোৎকচ
|
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রীঃ অঃ—'মহাবাজাধিরাজ' উপাধিগ্রহণ)
|
সমুদ্রগুপ্ত (বাজত্বকাল—৩২০ হইতে ৩৮০ খ্রীঃ অব্দেব মধ্যে)
|
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বাজত্বকাল—৩৮০ হইতে ৪১৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে)
|
গোবিন্দগুপ্ত — কুমাবগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (আঃ ৪১৫-৪৫৫) — প্রভাবতী (বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের মহিষী)
|
স্কন্দগুপ্ত — ভানুগুপ্ত (?) — পুরুগুপ্ত শ্রীবিক্রম — ঘটোৎকচগুপ্ত (?)
|
বুধগুপ্ত — নবসিংহগুপ্ত বলাদিত্য (?)
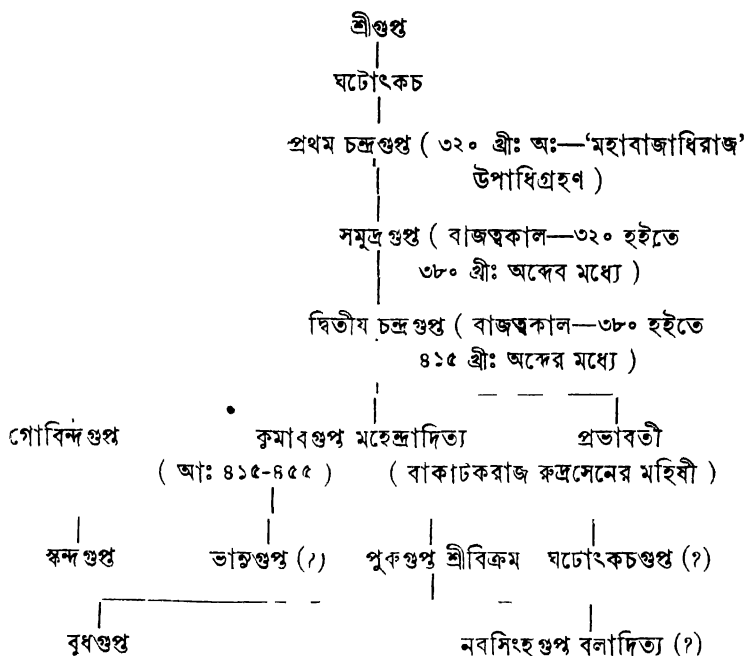
পুষ্যভূতিগণের বংশাবলী
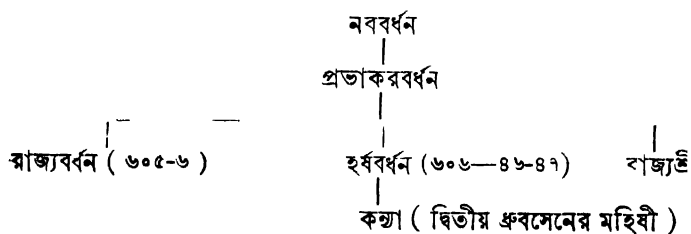
কালরেখা

মৌর্যযুগের শেষ হইতে গুপ্তযুগের আরম্ভ পর্যন্ত

সময়	ঘটনা
আঃ খ্রীঃ পূঃ ১৮৭	বৃহদ্রথের মৃত্যু শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা
" " " ৭৫	মগধে কাণ্ববংশের প্রতিষ্ঠা
" " " ৩০	কাণ্ববংশের পতন
আঃ খ্রীঃ অঃ ৪৭	গণ্ডফার্নিস
" " " ৭৮	শকাব্দ গণনা আরম্ভ (? কুষাণ রাজ কণিষ্ক)
" " " ১১৯—" " " ১৩০	শকরাজ নহপানের রাজত্বকাল
" " " ১৩০—" " " ১৫০	শকরাজ রুদ্রদামনের রাজত্বকাল
" " " ৩২০	গুপ্ত সংবৎ গণনা আরম্ভ

গুপ্তযুগ

সময়	ঘটনা
খ্রীঃ অঃ ৩২০	প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ
আঃ খ্রীঃ অঃ ৩৬০	সমুদ্রগুপ্তের নিকট সিংহলরাজ মেঘবর্ণের দূত প্রেরণ
আঃ খ্রীঃ অঃ ৩৮০	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনলাভ
আঃ খ্রীঃ অঃ ৪১৫	কুমারগুপ্তের সিংহাসনলাভ
খ্রীঃ অঃ ৪৫৫	স্কন্দগুপ্তের সিংহাসনলাভ
খ্রীঃ পূঃ ৫১০-৫১১	ভানুগুপ্ত
আঃ খ্রীঃ অঃ ৫৩৩	মিহিরকুলের পরাজয়
আঃ খ্রীঃ অঃ ৫৩৮	বাতাপিতে চালুক্যগণের অভ্যুত্থান

নবম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যা

Syllabus: *South India: Orissa* — The Chalukyas, the Pallavas, the Cholas, and the Pandyas The Chalukya-Pallava contest for the mastery of Southern India—Pallava art—Vaisnava Alavars and Saiva Nayanars—Chalukya art. Rastrakuta—Pratihara—Pala contest for Kanauj. Art of Ellora The Chola conquest and expansion to the Malaya Peninsula—Sri Vijaya and Ceylon. Chola administration. Rajarajeswara temple at Tanjore.

Different dynasties of Orissa. The Ganga revival.—The great temples of Puri, Bhuvaneswara and Konaraka.

পাঠসূচী: চালুক্যগণ, পল্লবগণ, চোলগণ ও পাণ্ড্যগণ। দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপনের জন্য চালুক্য ও পল্লবগণের প্রতিযোগিতা—পল্লব শিল্প—বৈষ্ণব আলবারগণ—শৈব নাযনারগণ—চালুক্য শিল্প। কনৌজের জন্য রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পালগণের প্রতিযোগিতা। ইলোরার শিল্প। চোলরাজগণের বিজয় অভিযান—মালয় উপদ্বীপে সাম্রাজ্যবিস্তার—শ্রীবিজয় ও সিংহল। চোল শাসনব্যবস্থা। তাঞ্জোরে রাজরাজেশ্বর মন্দির।

উড়িষ্যার বিভিন্ন রাজবংশ। গঙ্গগণের পুনরভ্যুত্থান—পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের বিখ্যাত মন্দিরগুলি।

দূর দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলি।—অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ শিলালিপি হইতে জানা যায়, তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, ও কেরলপুত্র নামে চারিটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। পরে সত্যপুত্র রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তাই দূর দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোল, পাণ্ড্য ও চের (কেরল) রাজ্যগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্তমান তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও পুডুকোট্টাইয়ের কিয়দংশে চোল রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। বর্তমান মাদুরা, রামনাড, তিনেভেল্লী ও ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশ পাণ্ড্য রাজ্য এবং মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশ চের (কেরল) রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন কালে পাণ্ড্য রাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই

উন্নত ছিল "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে" পাণ্ড্য রাজ্যের মুক্তা ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, জনৈক স্ত্রীলোক তৎকালে পাণ্ড্য রাজ্য শাসন করিতেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৬ অব্দে জনৈক পাণ্ড্যরাজ রোম-সম্রাট অগাস্টাসের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে চের ও চোল রাজ্য দুইটিও বেশ উন্নত ছিল। চেররাজ সেঙ্গুত্তবান একজন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চোল রাজকুমার এলরা সিংহল জয় করিয়াছিলেন। পরে পল্লবগণের অভ্যুদয়ের ফলে এই সকল রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল।

বাকাটকগণ।—সাতবাহন বংশের পতনের ফলে যে কয়টি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে বেরার (বিদর্ভ) ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাকাটক বংশীয় রাজগণের অধীনে শাসিত রাজ্যটিই প্রধান। উহা বিন্ধ্য অঞ্চল এবং বিন্ধ্যসংলগ্ন দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন, তখন বাকাটক রাজগণের সহিত তাঁহার সরাসরি সংঘর্ষ হয় নাই। ব্যাঘ্ররাজ নামে যে রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই রাজা সম্ভবত বাকাটক রাজগণের অধীন কোনও সামন্তরাজ ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রতিবেশী বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত তাঁহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। রুদ্রসেন ও প্রভাবতীর বংশধরগণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। পরে চালুক্যগণের অভ্যুত্থানের ফলে এই বংশ হীনবল হইয়া পড়ে।

কদম্বগণ।—বাকাটকগণের প্রায় সমসময়ে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে কদম্ববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতে থাকেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ময়ূরশর্মণ নামে এক ব্যক্তি বনবাসীকে কেন্দ্র করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন। ময়ূরশর্মণ-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই "কদম্ব বংশ" নামে পরিচিত। বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেন কুন্তল দেশের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বনবাসী কুন্তল নামেও পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ময়ূরশর্মণের পুত্র কঙ্গশর্মণই বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, প্রায় সার্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া

কদম্বগণ এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। অবশেষে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কদম্বরাজ হরিবর্মণ চালুক্যরাজ প্রথম পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হন। দ্বিতীয় পুলকেশী কদম্ব রাজ্যের কতকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত করেন। দক্ষিণাংশ গঙ্গগণের অধিকারভুক্ত হয়।

চালুক্যগণ।—চালুক্যগণ সম্ভবত উত্তর-ভারতীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা পরে দক্ষিণ-ভারতে গিয়া বসবাস করেন। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্ মনে করেন, তাঁহারা জাতিতে গুর্জর ছিলেন এবং রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যবংশীয় রাজা প্রথম পুলকেশী বাতাপিনগরে (বর্তমান বিজাপুর জেলার বাদামিতে) একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ ও মঙ্গলেশের অধীনে চালুক্য রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে। মঙ্গলেশ কীর্তিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীকে তাহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন (৬০৯)। দ্বিতীয় পুলকেশীই চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার রাজ্য উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি উত্তর কানাড়ার কদম্বদের রাজধানী অধিকার করেন, উত্তর কোঙ্কানের মৌর্যগণকে পদানত করেন। তাহার ভয়ে মহীশূরের গঙ্গগণ ভীত হইয়া উঠেন। গুজরাটের লাটগণ, মালবগণ ও গুজরগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাকোশল ও কলিঙ্গের নৃপতিগণ আতঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং পিষ্টপুরের (পিঠাপুরম্) দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তাঁহার বিজয় বাহিনী পল্লবগণের রাজধানী কাঞ্চীর অদূরেই পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করে। পুলকেশীর সৈন্যবাহিনী কাবেরী অতিক্রম করিলে চোল, চেল ও পাণ্ড্যরাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পুলকেশীই হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান চোয়াং চালুক্য রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী প্রায় একত্রিশ বৎসর (৬০৯-৬৪২) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু

দ্বিতীয় পুলকেশী

অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাঁহার গৌরবময় রাজত্বকালের অবসান ঘটে। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র রাজা নরসিংহবর্মণ বাতাপি আক্রমণ করিলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন।

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, পুলকেশী পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সহিত দূতবিনিময় করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অজন্তা গুহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্যগণ সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলেও তাঁহার অন্যতম পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮০) তাঁহার মাতামহ গঙ্গরাজ দুর্বিনীতের সাহায্যে পল্লবগণের কবল হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। পল্লবগণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। চালুক্যগণ পল্লবগণের রাজধানী কাঞ্চী লুণ্ঠন করেন। চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজগণও তাঁহাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অনুভব করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী প্রথম বিনয়াদিত্য সম্ভবত গুপ্তরাজ আদিত্যসেনের বিরুদ্ধে উত্তরাপথেও অভিযান করিয়াছিলেন।

প্রথম বিক্রমাদিত্য

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়ে চালুক্যবাহিনী পুনরায় পল্লবগণকে পরাজিত করে, কাঞ্চী লুণ্ঠিত হয়। চোল ও পাণ্ড্য রাজগণ চালুক্যগণের বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐ সময়ে আরবগণ সিন্ধু অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য ও বসতিস্থাপন করিয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ গুজরাটের লাট অঞ্চল আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এইভাবে দক্ষিণ ভারত আরব আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। আরবগণের বিরুদ্ধে এই অভিযানে দন্তিদুর্গ নামে তাঁহার এক সামন্তরাজ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। দন্তিদুর্গ ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অতঃপর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দন্তিদুর্গের পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে বাতাপির চালুক্যগণের রাজত্বকালের অবসান ঘটে (আঃ ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে)।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

চালুক্যগণ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তাঁহারা অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ ভাব দেখান নাই। চালুক্যরাজগণ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং বাদামি, ঐহোল, পট্টডকল প্রভৃতি স্থানে বহু দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চালুক্য রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত হ্রাস পাইলেও চীনা পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সেখানে প্রায় এক শত বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। চালুক্য রাজ্যে জৈন ধর্মও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

চালুক্যরাজগণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাদামি ও পট্টডকলে তাঁহাদের উৎসাহে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার উদ্দেশে বহু বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে পাহাড় কাটিয়া গুহাগৃহ নির্মাণের রীতি সুপ্রচলিত ছিল। অজন্তার বহু বিখ্যাত প্রাচীর চিত্র চালুক্য রাজগণের আমলেই অঙ্কিত হইয়াছিল।

পল্লবগণ।—খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে পল্লবগণ একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা সম্ভবত উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম্ (বর্তমান কঞ্জিভেরম্)। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু একটি ঐক্যবদ্ধ তামিল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি পাণ্ড্য, চোল, চের ও সিংহলের রাজগণকে পরাজিত করেন। সম্ভবত "কিরাতার্জুনীয়ম্"-প্রণেতা ভারবি তাঁহার সভাকবি ছিলেন। বাতাপির চালুক্যগণের সহিত পল্লবগণের দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা ছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবর্মণ

মহেন্দ্রবর্মণ (৬০০-৬৩০) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি "বিচিত্রচিত্ত", "মত্তবিলাস", "গুণভর" প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার "মত্তবিলাসপ্রহসন" নামে রচনাটি সুবিখ্যাত। তাঁহার রাজত্বকালে বহু সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে জৈন ছিলেন, পরে শৈব ধর্ম গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রবর্মণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মণ (৬৩০-৬৬৮) রাজা

হন। তাঁহার হস্তে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন। ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে পল্লবগণের শক্তি ও মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি সিংহলের বিরুদ্ধে দুইবার নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন এবং তাঁহার মনোনীত প্রার্থী মানবর্মাকে সিংহলের সিংহাসনে বসান। নরসিংহবর্মণ তাঁহার রাজত্বকালে বহু সুন্দর প্রাসাদে ও মন্দিরে সামুদ্রিক বন্দর মহাবলিপুরমের (মামল্লপুরম্) শোভা বর্ধিত করেন। তাঁহার সময়েই ইউয়ান চোয়াং (হিউয়েন সাং) পল্লবরাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

নরসিংহবর্মণ

নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ ও চালুক্যগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে পল্লবরাজ্য ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে। চোল, পাণ্ড্য ও গঙ্গ রাজগণের সহিতও তাঁহাদিগকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাঁহার হস্তে পল্লবরাজ দন্তিবর্মণ পরাজিত হন। অবশেষে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত-বর্মণকে (অঃ ৮৭৬-৯৫) চূড়ান্তরূপে পরাজিত করেন। এইরূপে পল্লব রাজ্য চোলগণের অধিকারভুক্ত হয়।

অধিকাংশ পল্লবরাজই শৈব ছিলেন। তবে বৈষ্ণব রাজারও অভাব ছিল না। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা সিংহবিষ্ণু সম্ভবত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মহেন্দ্রবর্মণ প্রথমে জৈন ছিলেন, পরে তিনি বিখ্যাত শৈব সন্ত অপ্পরের প্রভাবে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণু ও ব্রহ্মার জন্যও মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি জৈনধর্মের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন এবং দক্ষিণ আর্কটের একটি বিশাল জৈন মঠ ধ্বংস করেন। ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণ হইতে জানা যায়, পল্লব রাজ্যে বৌদ্ধধর্মেরও কিছু প্রভাব ছিল। কাঞ্চীতে ইউয়ান চোয়াং এক শত বৌদ্ধ বিহার ও প্রায় দশ হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। পল্লবরাজ্যে বৈষ্ণবধর্মও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবত আলবারগণই সেজন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন।

ধর্ম

ধর্ম চিরদিনই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের প্রেরণাদাতা রূপে কাজ করিয়াছে। পল্লবরাজ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। মহেন্দ্রবর্মণই সর্বপ্রথম পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি চালু করেন। নরসিংহবর্মণ মহাবলিপুরম্ নগর স্থাপন করিয়া তথায় একটি আস্ত পাহাড় কাটিয়া "সপ্তরথ" নির্মাণ করেন। পল্লবরাজগণ কাঞ্চী, দলবন্নুর, পল্লবরম্, বল্লম্, পুড়ুকোট্টাই, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। পল্লব রাজগণ সাহিত্যেরও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

স্থাপত্য

মামল্লপুরমের সপ্তরথ

তাঁহাদের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষায় বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কাঞ্চী সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পল্লব রাজ্যের মন্দিরে মন্দিরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। বিখ্যাত কবি ভারবি ও বিখ্যাত অলংকারশাস্ত্রবিদ্ দণ্ডী পল্লব রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্রবর্মণ নিজে কবি ও সুরসিক

সাহিত্য

ছিলেন। সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পল্লবরাজগণ সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

বেঙ্গীর চালুক্যগণ।—বেঙ্গী পল্লবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্যরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করিয়া বেঙ্গী অধিকার করেন এবং নিজ ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধনকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের হস্তে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হইলে সেই সুযোগে বিষ্ণুবর্ধনের পুত্র প্রথম জয়সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইরূপে বেঙ্গীতে একটি স্বাধীন চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহারা পূর্ব-চালুক্য নামেও পরিচিত। বেঙ্গীর চালুক্যগণ সমগ্র অন্ধ্র ও কলিঙ্গের কতকাংশে প্রায় সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। দশম শতাব্দীর শেষ পাদে বেঙ্গীর চালুক্যগণ চোলরাজ প্রথম রাজরাজ চোলের হস্তে পরাজিত হন। একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব-চালুক্যগণ চোলগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। চোলরাজ প্রথম কুলোত্তুঙ্গের (দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল) অধীনে চোল রাজ্যের সহিত বেঙ্গীর চালুক্য রাজ্য সংযুক্ত হয়।

মহীশূরের গঙ্গগণ।—গঙ্গ রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তাহাদের রাজ্য মহীশূরের অধিকাংশ অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং গঙ্গওয়াড়ি নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গগণের রাজধানী ছিল কাবেরী নদীর তীরবর্তী তালবনপুর (মহীশূর জেলার তালকাড)। দ্বিতীয় পুলকেশী গঙ্গগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। গঙ্গরাজ দুর্বিনীত দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহও দিয়াছিলেন। এই কন্যারই গর্ভজাত পুত্র ছিলেন চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য। এই আত্মীয়তার ফলে চালুক্যগণের সহিত গঙ্গগণের সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চালুক্যগণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূটগণ দাক্ষিণাত্যে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটগণের সহিত গঙ্গরাজগণের শত্রুতা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কদম্ব, পল্লব ও চোলগণের সহিতও তাঁহাদের বহু সংঘর্ষ হয়। অবশেষে ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে চোলগণের হস্তে পরাজিত হইয়া গঙ্গগণ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হন। গঙ্গরাজগণ জৈনধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রাষ্ট্রকূটগণ।—রাষ্ট্রকূটগণ প্রথমে চালুক্যগণের অধীনে সামন্তরাজ ছিলেন। চালুক্যবংশের পতনের সুযোগে রাষ্ট্রকূট বংশীয় দন্তিদুর্গ স্বাধীনতা
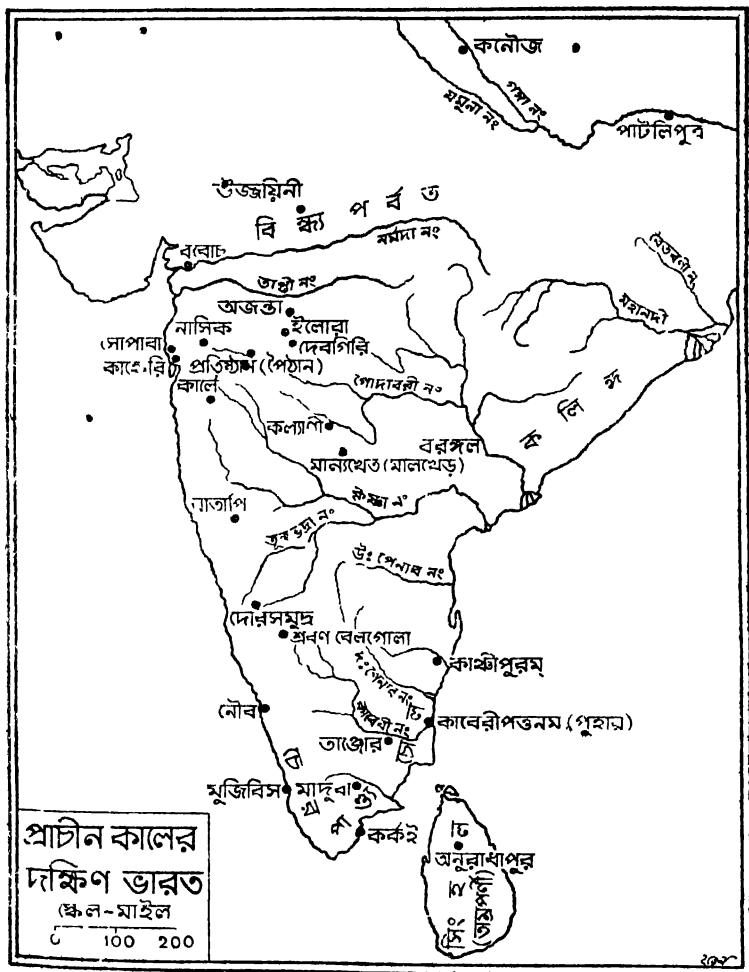
ঘোষণা করেন। অপুত্রক অবস্থায় রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ রাজা হন (আঃ ৭৫৬)। তাঁহার

অধীনে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করে। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজা এবং বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় রাজা চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধনকে তিনি পরাজিত করেন। কোঙ্কান তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। রহপ্পা নামে এক রাজকুমারও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। প্রথম কৃষ্ণ সম্রাট সূচক উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করেন। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির তিনিই নির্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ রাজা হন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব রাজা হন। ধ্রুবের রাজত্বকালে (৭৭৯-৭৯৩) রাষ্ট্রকূটগণের সাম্রাজ্য ও গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। ধ্রুব উত্তরে বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া মালব আক্রমণ করেন। প্রতিহাররাজ বৎসরাজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া রাজপুতানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। গৌড়রাজ ধর্মপালও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের (৭৯৩-৮১৪) হস্তে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। তৃতীয় গোবিন্দ কেবল ধ্রুবের পুত্রগণের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজগণের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি গুর্জর-প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটকে ও পালরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। পল্লবরাজ দন্তিবর্মণও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। সিংহলরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে।

প্রথম কৃষ্ণ

ধ্রুব

তৃতীয় গোবিন্দ

তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৭) রাজা হন। তিনি তাঁহার রাজধানী মান্যখেতে (বর্তমান বোম্বাই প্রদেশের মালখেড়) স্থানান্তরিত করেন। চালুক্য ও গুর্জর-প্রতিহারগণ আরবগণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণের সহিত আরবগণের সৌহার্দ্য ছিল। রাষ্টকূটগণ যে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আরব সাগরে তাঁহাদের

আরবদের সহিত সম্পর্ক

বাণিজ্যবিস্তার এবং সে বিষয়ে আরবগণের সহায়তা। অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে বিখ্যাত আরব পর্যটক সুলেমান ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। সুলেমানের মতে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৎকালীন পৃথিবীর চারিজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের অন্যতম ছিলেন। এই চারিজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট, কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট ও রাষ্ট্রকূটরাজ।

প্রথম অমোঘবর্ষের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ রাজা হন। তিনি খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন না। দ্বিতীয় কৃষ্ণের পর তাঁহার পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র রাজা হন। তিনি কনৌজের গুর্জর-প্রতিহারগণকে পরাজিত করেন। তাঁহার পরে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ রাজা হন। তাঁহারা সকলেই দুর্বল ছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৯৬৮)। তিনি গুর্জর-প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া কালঞ্জর ও চিত্রকূট অধিকার করেন। কাঞ্চী ও তাঞ্জোর তাঁহার পদানত হয়। চোলরাজ প্রথম পরান্তকের পুত্র রাজাদিত্য এবং চের ও পাণ্ড্য রাজগণ তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। কথিত আছে, সিংহলরাজও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তৃতীয় কৃষ্ণের পর রাষ্ট্রকূটগণ দুর্বল হইয়া পড়েন এবং এই বংশের শেষ রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষ কল্যাণীর চালুক্যরাজ তৈলপের হস্তে পরাজিত হন (৯৭৩)।

পল্লব ও চালুক্য রাজগণের মতো রাষ্ট্রকূট রাজগণও স্থাপত্যশিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পল্লব রাজগণ দক্ষিণ ভারতে আস্ত পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের যে রীতি চালু করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমেই উন্নত হইতেছিল এবং তাহার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল ইলোরার মন্দিরগুলিতে। এই মন্দিরগুলিকে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন মন্দিরে ভাগ করা যায়। মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল কৈলাসনাথের মন্দিরটি। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণই এই মন্দিরটি নির্মাণ করান।

স্থাপত্যকীর্তি

কল্যাণীর চালুক্যগণ।—চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈলপ রাষ্ট্রকূটগণের সামন্তরাজ ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ চতুর্থ অমোঘবর্ষকে পরাজিত

করিয়া পুনরায় চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কল্যাণীতে এই রাজবংশের রাজধানী হওয়ায় ইহারা "কল্যাণীর চালুক্য" নামে পরিচিত। কল্যাণীর চালুক্যরাজ সোমেশ্বর আহবমল্লের (১০৪২-১০৬৮) বিজয়-বাহিনী উত্তর ভারতে মালব, কনৌজ, জেজাকভুক্তি, মগধ, মিথিলা, অঙ্গ ও বঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। চোলরাজ প্রথম রাজাধিরাজ তাঁহারই হস্তে নিহত হন। চালুক্য-বাহিনী পল্লবগণের রাজধানীও

সোমেশ্বর আহবমল্ল

ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির—রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের অমর কীর্তি

বিধ্বস্ত করে। অবশেষে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের হস্তে সোমেশ্বর আহবমল্ল পরাজিত হন। তাঁহার পুত্র ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় বীর ছিলেন, পিতার অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি সেনাপতিত্ব করিতেন। তাঁহার

ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য

সভাকবি বিহ্লন তাঁহার জীবনী অবলম্বনে "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" রচনা করেন। হিন্দু উত্তরাধিকারবিধি সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ "মিতাক্ষরার" রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্যাণীর চালুক্য সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দেবগিরিতে যাদবগণ, বরঙ্গলে কাকতীয়গণ এবং দোরসমুদ্রে হোয়সলগণ তিনটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সেগুলি চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হয়।

চোলরাজগণ।—চোলগণ পল্লবরাজগণের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। পল্লবরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহারা তাঞ্জোর অধিকার করিয়া সেখানে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। চোলরাজ পরান্তক (৯০৭-৯৫৩) পল্লবরাজ্যের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেন। চোলরাজ প্রথম রাজরাজের (আঃ ৯৮৫-১০১৬) আমলে চোলগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। রাজরাজ চের ও পাণ্ড্য রাজ্য অধিকার করেন। কলিঙ্গ, সিংহলের উত্তরাংশ, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। কল্যাণীর চালুক্যরাজও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। তাঁহার সাম্রাজ্য বর্তমান অন্ধ্র ও মাদ্রাজ প্রদেশ, মহীশূর, কুর্গ, সিংহলের উত্তরাংশ এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ লইয়া গঠিত ছিল। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। চোল রাজগণের নৌশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলা চলে।

রাজরাজ চোল

রাজরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোল (আঃ ১০১৬-১০৪৪) রাজা হন। তাঁহার অধীনেই চোলরাজ্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে। তিনি সাতবাহন ও রাষ্ট্রকূটগণের ন্যায় উত্তর ভারতেও অভিযান করেন। চোলগণের একটি লিপি হইতে জানা যায়, উড়িষ্যা, দক্ষিণ কোশল (মধ্যপ্রদেশ), উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গ তাঁহার পদানত হয়। তিনি গঙ্গানদীর তীরবর্তী অঞ্চল জয় করিয়া "গঙ্গাইকোণ্ড" উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নূতন রাজধানীর নাম হয় "গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরম্" (বর্তমান গঙ্গাকুণ্ডপুরম্)। সমগ্র সিংহল

রাজেন্দ্র চোল

তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার নৌবাহিনী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, মালয ও ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জয় করে।

শ্রীবিজয়ের সহিত সংঘর্ষ।—মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী ও বোর্নিওতে শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় (পালেম্বং) নামে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ই-ৎসিং শ্রীবিজয়কে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ

শ্রীবিজয়
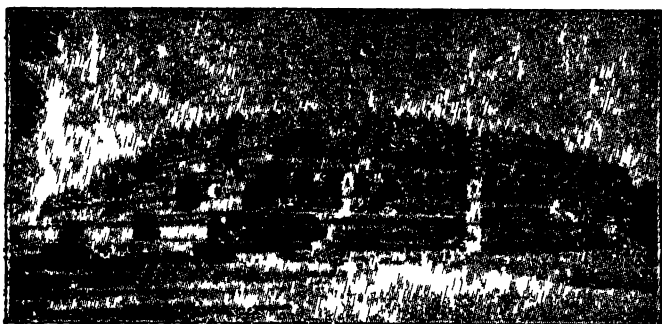
বরবুদুরের মন্দির—যবদ্বীপ

বলী ও বোর্নিও শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধীনে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। চম্পা ও কম্বুজেও তাহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। আরব বণিকগণ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পদ্ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে শৈলেন্দ্র রাজগণের ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, শৈলেন্দ্র "মহারাজ" প্রতিদিন প্রভাতে একটি স্বর্ণনির্মিত নিটোল ইষ্টক সরোবরে নিক্ষেপ করিতেন। ৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আরব লেখক লিখিয়াছেন যে, "তৎকালীন শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাই সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ধনী সম্রাট ছিলেন। পৃথিবীর কোনও সম্রাট তাঁহার অপেক্ষা অধিক রাজস্ব লাভ করিতেন না।"

শৈলেন্দ্র বংশ

অপর একজন আরব লেখক বলিয়াছেন, শৈলেন্দ্র সম্রাটের দৈনিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল দুই শত মণ স্বর্ণ।

শৈলেন্দ্র রাজগণ "মহাযান" বৌদ্ধ ছিলেন। ভারত ও চীন দেশের সহিত তাঁহাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজগণের গুরু ছিলেন। রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের সময়ে নালন্দায় বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বহু স্তূপ ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ আজও তাহার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। (বরবুদুরের বিখ্যাত স্তূপটি সম্পর্কে আলোচনা ৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

বরবুদুরের মন্দির

এই শৈলেন্দ্রবংশীয়গণের সহিত চোলগণের সংঘর্ষ ভারতীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চোলরাজ রাজরাজের শাসনকালে ও রাজেন্দ্র চোলের শাসনকালের গোড়ার দিকে শ্রীবিজয়ের সহিত চোল রাজ্যের সম্পর্ক ভালোই ছিল। কিন্তু চীনের সহিত চোল রাজগণের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের পথে শ্রীবিজয় অন্তরায়রূপে দেখা দেয়। ফলে রাজেন্দ্র চোল ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সংঘর্ষে রাজেন্দ্র চোলই বিজয়ী হইয়াছিলেন। শ্রীবিজয়রাজ সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গবর্মণ রাজেন্দ্র চোলের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল সম্ভবত তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে মুক্তি দেন এবং শ্রীবিজয়ের কতকাংশ চোল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ফলে চোল সাম্রাজ্য সমুদ্রপারেও বিস্তারলাভ করে।

শ্রীবিজয়ের পরাজয়

চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের ন্যায় অন্য কোনও ভারতীয় রাজা সমুদ্রপারে এতোবড়ো সাম্রাজ্যবিস্তার করিতে পারেন নাই। রাজেন্দ্র চোল ১০১৬, ১০৩৩ ও ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

চোলগণের পতন।—রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ রাজা হন। তিনি পাণ্ড্য, কেরল ও সিংহলের বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু কল্যাণীর চালুক্যগণের সহিত তাঁহার কলহের ফল শুভ হয়

নাই। তিনি কল্যাণীর চালুক্যরাজ সোমেশ্বর আহবমল্লের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন (১০৫২)।

যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র রাজা বলিয়া ঘোষিত হন এবং চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। তাঁহার পরবর্তী চোলরাজ বীর রাজেন্দ্র (আঃ ১০৬৪-৭০) চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরলের বিদ্রোহ দমন করেন। সিংহলের বিজয়বাহু চোল শাসন হইতে সিংহলকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে তিনি তাহা ব্যর্থ করেন। তিনি বেঙ্গীর চালুক্যগণের সিংহাসনে তাঁহার অনুগত দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যকে স্থাপন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জেও তিনি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।

বীর রাজেন্দ্র

তাঁহার মৃত্যুর পর চোল রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে তাঁহার পুত্র অধিরাজেন্দ্রের মৃত্যু ঘটে এবং দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল বা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ রাজা হন। মাতৃকুলের দিক হইতে তিনি বেঙ্গীর চালুক্যগণের আত্মীয় ছিলেন। ফলে তাহার অধীনে বেঙ্গীর চালুক্যরাজ্য চোল রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়। প্রথম কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ও চোলগণের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার হস্তে দুইবার কলিঙ্গ বিধ্বস্ত হয় এবং মালবের পরমারগণ পরাজিত হন। কিন্তু মহীশূর স্বাধীন হইয়া উঠে। সেখানে হোয়সলগণ ক্রমেই শক্তিশালী হইতে থাকেন। সমুদ্রপারের চোল-শাসিত অঞ্চলও সম্ভবত তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তাহার বংশধরগণ দুর্বল ছিলেন। এই দুর্বলতার সুযোগে পাণ্ড্য, হোয়সলগণ ও কাকতীয়গণ চোলরাজ্য অধিকার করেন।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গ

চোল রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা।—চোল রাজগণের বিভিন্ন লিপি হইতে চোল রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়াছে। চোলরাজ্য কতিপয় মণ্ডলম্ বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল; রাজবংশীয় ব্যক্তিরা ঐ সকল প্রদেশ শাসন করিতেন। তাহাছাড়া, চোল রাজ্যে বহু সামন্ত রাজা ছিলেন। সামন্ত রাজগণ রাজকর দিতেন এবং যুদ্ধের সময়ে সৈন্য সরবরাহ করিতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন

চোল শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গণপরিষদ্‌গুলি। জেলা ও নগরগুলির নিজ নিজ পরিষদ্ ছিল। প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক পরিষদ্ ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সকল পরিষদ্ কিভাবে গঠিত হইত বা তাহাদের কাজ কি ছিল, তাহা ঠিকমতো জানা যায় নাই।

গণপরিষদ্

চোল শাসন ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন। দক্ষিণ ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন একটি প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিল এবং তাহা চোলরাজগণের আমলে বিশেষভাবে বিকাশ পাইয়াছিল। সমগ্র চোল রাজ্য মণ্ডলম্ বা প্রদেশে এবং মণ্ডলম্‌গুলি কোট্টম্ বা বলনাড়ুতে (বিভাগে) বিভক্ত ছিল। সেগুলি নাড়ু বা জেলায় এবং নাড়ুগুলি আবার কুড়ম্ বা গ্রামে বিভক্ত ছিল। কুড়ম্‌গুলির শাসন-ব্যবস্থা স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকিত। পঞ্চায়েতগুলিকে "উর" বলা হইত। ব্রাহ্মণদের গ্রামগুলির পঞ্চায়েত "সভা" নামে অভিহিত হইত। উর ও সভার অধিবেশন সাধারণত গ্রামের বৃক্ষতলে, সবসাধারণের ব্যবহার্য গৃহে বা মন্দিরে হইত। উর ও সভার সদস্যদিগকে লটারি করিয়া নির্বাচন করা হইত। সদস্যরা সাধারণত এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। উর বা সভাই গ্রামের সমগ্র ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিল। রাজস্ব ও রাজকর সংগ্রহ, ছোট-খাটো অপরাধের বিচার এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা উর বা সভাই করিত।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

চোল শিল্প-কলা।—চোলরাজগণ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন শৈব। কেহ কেহ বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। ফলে চোলরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যে বহু দেবমন্দির নির্মাণ করেন। তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের মন্দিরগুলি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোরে চোলরাজ রাজরাজ-নির্মিত রাজরাজেশ্বরের (শিব) মন্দিরটি ভারতীয় মন্দিরশিল্পের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মন্দিরগুলিতে যেসব অসংখ্য মনোরম মূর্তি খোদিত রহিয়াছে, ভাস্কর্যশিল্পের দিক হইতে সেগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নহে। (মন্দির সম্পর্কে আলোচনা ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এই সকল মন্দিরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল "বিমান" বা শিখরগুলি। উত্তর ভারতীয় মন্দিরে এই ধরনের বিমান নাই।

পাণ্ড্যগণ।—পাণ্ড্যরাজ্যের সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে পাণ্ড্যগণের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে বাতাপির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লবগণের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দেন। পাণ্ড্যগণের প্রথম বিখ্যাত রাজা ছিলেন কডুঙ্গন। তাঁহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। অষ্টম শতাব্দীতে পাণ্ড্যগণ চোল ও চের রাজ্যের বহুলাংশ অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। পল্লবরাজগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ চলিতে থাকে। পাণ্ড্যরাজ বরগুণবর্মণ ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পল্লবরাজ অপরাজিতবর্মণের হস্তে পরাজিত হন। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে চোলরাজ প্রথম পরান্তক (৯০৭-৫৩) পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় মারবর্মণ জয়সিংহকে পরাজিত করেন। মারবর্মণ সিংহলে গিয়া আশ্রয় লন। পাণ্ড্য রাজ্য চোলগণের অধিকারভুক্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলের সময়ে পাণ্ড্যরাজ্য চোল রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

কডুঙ্গন

পরবর্তী তিন শতাব্দীকাল পাণ্ড্যরাজ্য চোলগণের অধীন থাকে। অবশ্য, সুযোগ পাইলেই পাণ্ড্যগণ স্বাধীনতালাভের জন্য বিদ্রোহ করিতে থাকেন। চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যুর পর পাণ্ড্যগণ পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মণ কুলশেখরের (আঃ ১১৯০-১২১৫) অধীনে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। পাণ্ড্যরাজ মারবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য (আঃ ১২১৬-৩৮) চোলরাজ্য বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করেন। পাণ্ড্যগণের শক্তি ও প্রতিপত্তি পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্যের সময়ে (আঃ ১২৫১-৭২) সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। তিনি কাঞ্চী অধিকার করেন। চোল, চের ও সিংহল রাজ্য তাঁহার পদানত হয়। হোয়সল ও কাকতীয়গণও তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। উত্তরে কুডাপ্পা ও নেলোর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তারলাভ করে।

জটাবর্মণ কুলশেখর

জটাবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভেনেসীয় পর্যটক মার্কো পোলো পাণ্ড্যরাজ্যে গিয়াছিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজ্য খুবই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল। চতুর্দশ

শতাব্দীর প্রথম দশকে পাণ্ড্যরাজ্যের সিংহাসন লইয়া কুলশেখরের দুই পুত্র সুন্দর পাণ্ড্য ও বীর পাণ্ড্যের মধ্যে বিবাদ বাধে। সুন্দর পাণ্ড্য ভ্রাতার নিকট পরাজিত হইয়া দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালেক কাফুর পাণ্ড্যরাজ্যে অভিযান করেন। পাণ্ড্যরাজ্য আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পাণ্ড্যরাজ্যের পতন

দক্ষিণ ভারতের ধর্ম।—দক্ষিণ ভারতে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে জৈন ধর্ম ও অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলিও বর্তমান ছিল। কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমেই কমিতেছিল এবং জৈন ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্মের বন্যা আসিয়াছিল। তবে ইহার সহিত প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পার্থক্য ছিল প্রচুর। ইহার মূলকথা ছিল "ভক্তি"। হিন্দুধর্মের এই ভক্তিবাদ প্রধানত শিব ও বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিবের উপাসকগণ "নায়নার" এবং বিষ্ণুর উপাসকগণ "আলবার" নামে পরিচিত ছিলেন। "নায়নার" ও "আলবার" ছাড়াও হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন বেদান্তবাদিগণ। "নায়নার", "আলবার" ও বেদান্তবাদী, তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। শৈব "নায়নার"গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন নান (জ্ঞান) সম্বন্দর। এখনও দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজ্যগুলিতে প্রায় সকল শিবমন্দিরেই নানসম্বন্দরের পূজা হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান

নায়নার ও আলবারগণ

বৈদান্তিক ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্ট সপ্তম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। অষ্টম শতাব্দীতে মালাবার অঞ্চলে কালডি গ্রামের এক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে শঙ্করাচার্যের জন্ম হয় (আঃ ৭৮৮)। তিনি গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার মতে, একমাত্র ব্রহ্ম

সত্য, আর সমস্তই মায়া। তাঁহার এই মত "অদ্বৈতবাদ" নামে পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করেন। এই মঠগুলির মধ্যে মহীশূরের

শঙ্করাচার্য

শৃঙ্গেরি মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমের যোশী মঠ প্রধান। মাত্র বত্রিশ (মতান্তরে আটত্রিশ) বৎসর বয়সে শঙ্করাচার্যের মৃত্যু হয়।

কয়েকজন বৈদান্তিক পণ্ডিত বৈষ্ণব ধর্মেরও একনিষ্ঠ প্রচারক হইয়া উঠেন। ইহাদের মধ্যে রামানুজ ও মধ্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামানুজ মাদ্রাজের নিকটবর্তী শ্রীপেরুম্বুদুর নামক স্থানে একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্যের ন্যায় তিনিও উপনিষদের ভাষ্য করেন। কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাহার মতে, ব্রহ্ম এবং এই জগৎ, উভয়ই সত্য, জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ মাত্র। তাঁহার এই মত "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" নামে পরিচিত। তাঁহার ধর্মে ভক্তি ও জীবে দয়া প্রধান স্থান লাভ করে এবং তিন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক হইয়া উঠেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁহার মৃত্যু হয়। মধ্বাচার্যও (.২০০) অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী কালের শৈবাচার্যদের মধ্যে বসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

রামানুজ

তিনি বিজাপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কল্যাণীর রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ "বীরশৈব" ও "লিঙ্গায়েৎ" নামে পরিচিত।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির।—দক্ষিণ ভারতে ধর্মের সহিত মন্দিরগুলি বিশেষভাবে জড়িত। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারগুলিকেই দক্ষিণ ভারতের সর্বপ্রাচীন মন্দির বলা চলে। এগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক

গুহামন্দির

হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি সাধারণত পাহাড়ের অভ্যন্তরে পাথর কাটিয়া গুহার আকারে নির্মিত। বেদসা, নাসিক, কার্লে, কাহ্নেরি, অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দিরগুলি এবং নাগার্জুনিকোণ্ড ও অমরাবতীর স্তূপগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে জৈন গুহামন্দিরেরও অভাব নাই।

কিন্তু হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-নির্মাণ-শিল্পেও ব্যাপক

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গুহামন্দিরগুলি পাহাড়ের অভ্যন্তর-ভাগ খোদাই করিয়া নির্মিত হইত। এখন প্রয়োজন মতো আস্ত পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ কাটিয়া-ছাঁটিয়া ও খোদাই করিয়া এক-একটি অপরূপ মন্দির বাহির করিয়া লওয়া হইতে লাগিল। পল্লবরাজগণই এই ধরনের পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের রীতিটি প্রচলিত করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ পাহাড় কাটিয়া মহাবলিপুরমে কতকগুলি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগুলি 'রথ' নামে পরিচিত। পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর নামেই এই রথগুলির নামকরণ হইয়াছিল—যথা, ধর্মরাজরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ ইত্যাদি। মহাবলিপুরমের গিরিগাত্রে ক্ষোদিত শিল্পকাযগুলিও অপূর্ব। আস্ত পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি ক্রমেই উন্নততর হইতেছিল এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছিল ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দিরে। এই মন্দিরটি যেমন বিশাল, ইহার পরিকল্পনা ও কারুকাযও তেমনি বিস্ময়কর। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন।

পাহাড় কাটিয়া নির্মিত মন্দির

আস্ত পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিত প্রস্তর দিয়া মন্দির নির্মাণও চলিতেছিল এবং তাহাও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির সহিত উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির দুইটি প্রধান পাথক্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির শিখরগুলি হঠাৎ ফাঁপিয়া গম্বুজের আকার ধারণ করিয়া তৎপরে হঠাৎ সূক্ষ্ম হইয়া উপরে শেষ হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে শিখরগুলির আয়তন উপরের দিকে স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইয়া অবশেষে একটি প্রস্তর খণ্ডে গিয়া শেষ হইয়াছে। উত্তর ভারতের মন্দিরগুলিতে স্তম্ভের ব্যবহার নাই বলিলেও চলে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে স্তম্ভগুলি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরে "গোপুরম্" নামে পরিচিত অপূর্ব তোরণগুলিও দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতীয় রীতি

এইরূপ মন্দির নির্মাণের শিল্পটি চোলগণের রাজত্বকালেই সর্বাধিক বিকাশ

লাভ করিয়াছিল। চোলরাজ রাজরাজ তাঞ্জোরে যে শিবমন্দিরটি নির্মাণ

তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির—চোলগণের অমর কীর্তি

করাইয়াছিলেন, তাহাই ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির। উহার উচ্চতা ১৯০ ফুট, উহা চৌদ্দটি তলায় সমাপ্ত। উহার শীর্ষদেশ একটি বিরাট শিলাখণ্ড দিয়া

গঠিত। ঐরূপ একটি বিরাট শিলাখণ্ড যে কিভাবে ঐরূপ উচ্চে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। মহীশূরের হোয়সল রাজগণও অনেক মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী দোরসমুদ্রে হোয়সলেশ্বরের মন্দিরটি সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য সুবিখ্যাত।

প্রস্তরনির্মিত মন্দির
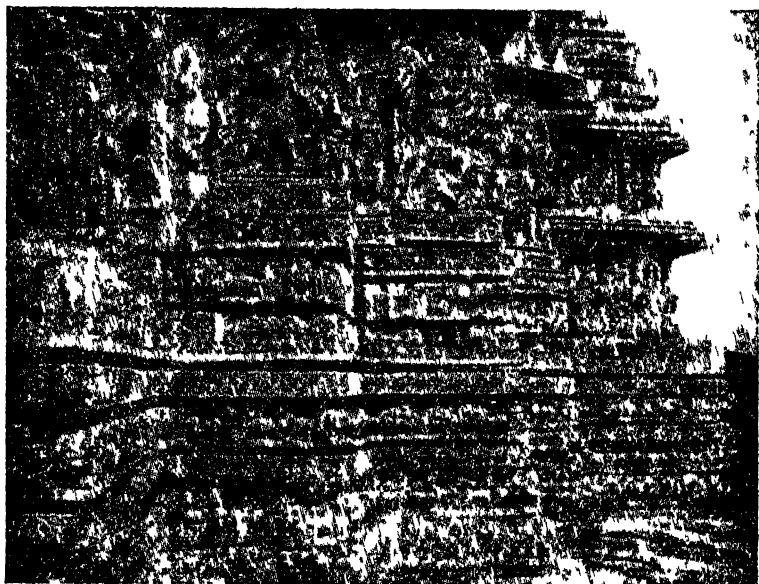
দোরসমুদ্রে হোয়সলেশ্বরের মন্দিরের একাংশ—হোয়সলগণের অমর কীর্তি

মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কেবল স্থাপত্যবিদ্যারই উন্নতি হয় নাই, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং নৃত্যগীতেরও যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল। মন্দিরগুলি দক্ষিণ ভারতের সমাজ-জীবনে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। এগুলির নির্মাণ ও সংরক্ষণকার্যে শত শত শ্রমিক ও শিল্পী অবিরাম নিযুক্ত থাকিত। এগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞানেরও অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। মন্দির-গুলিতে অসংখ্য পুরোহিত, গায়ক-গায়িকা, নট-নটী, দেবদাসী, মালী ও

পাচকের কর্মসংস্থান হইত। মন্দিরগুলিতে যেসব মেলা বসিত, তাহাতে শাস্ত্র আলোচনা, তর্কযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদ স্থান পাইত। মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিদ্যালয় এবং আরোগ্যশালা থাকিত। স্থানীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য মন্দিরগুলি মিলন-স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত।

সমাজ-জীবনে মন্দিরের স্থান

সাহিত্য।—দক্ষিণ ভারতে সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজা সাহিত্যের কেবল উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তাঁহারা নিজেরাও সাহিত্যের স্রষ্টা ছিলেন। সাতবাহনগণের আমলে রচিত গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা" এবং হালের "গাথা সপ্তশতী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাল সাতবাহন বংশের সপ্তদশ রাজা ছিলেন (আঃ ২০-২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। "কিরাতার্জুনীয়ম্" কাব্যের রচয়িতা মহাকবি ভারবিও দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ নিজেও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার "মত্তবিলাসপ্রহসন" একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁহার রচনায় তিনি কাপালিক ও ভিক্ষুদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিহাস-বিদ্রূপ করেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের সভায় বিখ্যাত আলংকারিক দণ্ডী উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডীর "কাব্যাদর্শ" প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে একটি নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। চালুক্যরাজগণও সাহিত্য ও সঙ্গীতের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কল্যাণীর চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্লের সভাকবি বিহ্লন ত্রিভুবনমল্লের জীবনী অবলম্বনে "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তামিল সাহিত্যে "শংগম" (সংঘম্) যুগের (খ্রীষ্টীয় ১০০-৩০০ অব্দ) লেখকগণের রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে লেখকগণ এক-একটি সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। তাই উহাকে "শংগম" যুগ বলা হয়। শংগম যুগের ৪৭৩ জন কবির রচিত প্রায় তেইশ শত কবিতা পাওয়া গিয়াছে। এই কবিতাগুলি প্রাচীন তামিল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। নায়নার ও আলবারগণের অসংখ্য পদাবলীও দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

সামুদ্রিক বাণিজ্য ও অভিযান।—দক্ষিণ ভারতের তিন দিক সমুদ্র-বেষ্টিত হওয়ায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই দক্ষিণ ভারতীয়গণ সামুদ্রিক অভিযান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভের পূর্বেও সম্ভবত তাঁহারা সমুদ্রপথে মিশর, সুমের প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬ অব্দের কাছাকাছি সময়ে জনৈক পাণ্ড্যরাজ রোম সম্রাট অগাস্টাসের দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। অগাস্টাস হইতে নেরো পর্যন্ত বহু রোম সম্রাটের নামাঙ্কিত মুদ্রা দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত রোমক লেখক প্লিনি (আঃ ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ রোমক মুদ্রা ভারতে চলিয়া আসে বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন। উহার অধিকাংশ মুদ্রা যে দক্ষিণ ভারতের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলেই আসিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক তাঁহার "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী" গ্রন্থে নৌর, মুজিবিস, নেলসিন্দা, কর্কই প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বন্দরগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়, সূক্ষ্ম বস্ত্র, হস্তিদন্ত ও মসলা প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল। মসলিয়া (অন্ধ্র দেশ) হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র "মসলিন" পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানী হইত। আরব, পারস্য ও মিশরের সহিত দক্ষিণ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত। প্রাচ্যের সহিতও দক্ষিণ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। গুপ্ত যুগে ফা-হিয়েন সিংহল ও যবদ্বীপের পথে চীনে ফিরিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ই-ৎসিং ও তাঁহার সমসাময়িক ৩৭ জন চীনা পর্যটক এই পথেই চীনে ফিরিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় পোতগুলি যে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত তাং-শাসিত চীন ও শৈলেন্দ্র-শাসিত শ্রীবিজয় রাজ্যের (সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয়) সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। চোলরাজগণ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশ ও দ্বীপপুঞ্জের উপর

পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্য

প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য

সমুদ্রপথে তাঁহাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত যে প্রাচীনকালে সামুদ্রিক অভিযান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উড়িষ্যা।—চেতবংশীয় রাজগণের পর উড়িষ্যার ইতিহাস দীর্ঘকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এখানে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সকল রাজ্য ও রাজবংশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কর বংশ সম্ভবত উড়িষ্যার পূর্বাংশে, ভঞ্জ রাজবংশের বিভিন্ন শাখা উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং শৈলোদ্ভব বংশ কোঙ্গোদ (গঞ্জাম) অঞ্চলে রাজত্ব করিত। জনৈক কোঙ্গোদ বংশীয় রাজা গৌড়রাজ শশাঙ্কের অধীন ছিলেন বলিয়া একটি লিপি হইতে জানা গিয়াছে। সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইঁহাদের প্রতিপত্তি লোপ পায়। ভঞ্জবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা প্রথম রণভঞ্জ নবম শতাব্দীতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য মহানদীর তীর হইতে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে তাঁহার বংশধরগণ ঐ রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ কোশলের সোমবংশী রাজগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। একাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় (পূর্ব) গঙ্গবংশের অভ্যুদয়ের ফলে সোমবংশী রাজগণের পতন ঘটে।

কর, শৈলোদ্ভব ও ভঞ্জ বংশ

পূর্ব-গঙ্গবংশীয় রাজগণ প্রথমে বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। পরে এই বংশের একটি শাখা গোদাবরী নদীর মোহানা হইতে ভাগীরথীর নিম্ন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গবংশ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। পূর্ব-গঙ্গবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ। অনন্তবর্মণের পিতা রাজরাজ চোলরাজ দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোলের (প্রথম কুলোত্তুঙ্গের) কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা গঙ্গবংশীয় রাজগণের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল। মাতৃকুলের দিক হইতে চোলগণের সহিত অনন্তবর্মণের সম্বন্ধ থাকায় এই বংশ "চোড়-গঙ্গ"

পূর্ব-গঙ্গবংশ

নামে পরিচিত হইয়াছে। চোড়-গঙ্গব শীয় রাজগণ এবং তাঁহাদের পরবর্তী বংশগুলি সম্পর্কে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ-মন্দির

উড়িষ্যার রাজবংশগুলি, বিশেষত কর ও গঙ্গবংশ, অকুণ্ঠভাবে কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। করবংশীয় রাজারা ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ-মন্দির ও মুক্তেশ্বর-মন্দির নির্মাণ করেন। (পূর্ব) গঙ্গবংশীয় রাজগণ উড়িষ্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মন্দির নির্মাণ করেন। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির, রাজারানী মন্দির, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির এবং কোনারকের সূর্যমন্দির ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

প্রশ্নাবলী

1. How did the Chalukyas and the Pallavas come to power? How did they contest for the mastery of Southern India? What contribution did they make towards the development of Indian Culture?

চালুক্য ও পল্লবগণ কিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন? দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপনের জন্য তাঁহারা কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন? ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে তাঁহাদের দান কি?

2. Briefly describe the rise of the Rastrakutas. What do you know of the Rastrakuta-Pratihara-Pala contest for Kanauj? What was the attitude of the Rastrakutas towards the Arabs?

রাষ্ট্রকূটগণের অভ্যুত্থান সম্পর্কে যাহা জান লিখ। কনৌজ লইয়া রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পাল রাজগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল? আরবগণ সম্পর্কে রাষ্ট্রকূটগণ কি মনোভাব পোষণ করিতেন?

3. What do you know about the Chola dynasty? How did the Chola kings administer their kingdom? What do you know of the Chola conquest and the over-sea expansion of Indian Empire?

চোল রাজবংশ সম্পর্কে কি জান? তাঁহারা কিভাবে তাঁহাদের রাজ্য শাসন করিতেন? ভারতের বাহিরে চোলগণের রাজ্যজয় ও সমুদ্রপারে ভারতীয় সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে কি জান?

4. Who were the Alavars and the Nayanars? Who were Sankaracharya and Ramanuja? Name and describe some of the greatest temples of South India. How did they influence the social life? How do they differ from the temples of the Northern India?

আলবার ও নায়নারগণ কে ছিলেন? শংকরাচার্য ও রামানুজ সম্পর্কে কি জান? দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরের নাম কর ও বর্ণনা দাও। মন্দিরগুলি কিভাবে সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিত? উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির সহিত এইগুলির কোনও পার্থক্য আছে কি?

দশম পরিচ্ছেদ

পালপূর্ব বঙ্গদেশ—পাল ও সেনগণের রাজত্বকাল

Syllabus : *Bengal under the Palas and the Senas :* Growth of the Pala power—Monghyr Grant, Nalanda Copper Plate—Gwalior Inscription of Bhoja. Local dynasties emerge during Mahipala II's rule. Rajendra Chola's invasion. Kalachuri invasion. Rise of indigenous chieftains—Kaivarta Rebellion—Rampala. Buddhist revival—Uddandapura and Bikramsila—mission of Dipankara—Chakrapani and Sandhyakara, Dhiman and Bitapala—Buddhist Tantric religion and practices—tolerance in religion of Pala kings—terracota figurines at Paharpur.

The Senas—Brahmanical revival—glory of Vikrampur. Ballala Sena and Kulinism. Lakshmana Sena reduces Kamarupa. Jayadeva and Dhoyi. Moslem conquest of West and North Bengal.

পাঠসূচী :—পাল ও সেনগণের আমলে বঙ্গদেশ : পাল শক্তির ক্রমবিকাশ—মুঙ্গের ও নালন্দার তাম্রশাসন—গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত রাজা ভোজের লিপি। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে স্থানীয় রাজবংশগুলির অভ্যুত্থান। রাজেন্দ্র চোলের বঙ্গাভিযান। কলচুরিগণের অভিযান। স্থানীয় দলপতিগণের অভ্যুত্থান কৈবর্ত বিদ্রোহ—রামপাল। বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন—উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশীলা—দীপংকরের ধর্মপ্রচার—চক্রপাণি ও সন্ধ্যাকর, ধীমান ও বীটপাল—বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান—পাল রাজগণের পরধর্মসহিষ্ণুতা—পাহাড়পুরের মৃৎশিল্প।

সেন বংশীয় রাজগণ—ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান -বিক্রমপুরের গৌরব বল্লাল সেন ও কৌলীন্য প্রথা। লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কামরূপ অধিকার। জয়দেব ও ধোয়ী। বঙ্গদেশের পশ্চিম ও উত্তর অংশে মুসলিম অধিকার।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল।—বঙ্গদেশ বলিতে সাধারণত উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে রাজমহল পর্বত হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলকেই বুঝাইয়া থাকে। বর্তমানে এই বঙ্গদেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্থান নামে দুই পৃথক অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালেও বঙ্গদেশ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। তখন সাধারণত উত্তর-বঙ্গকে 'পুণ্ড্রদেশ' বা 'বরেন্দ্র', পূর্ব-বঙ্গকে 'বঙ্গ', দক্ষিণ-বঙ্গকে 'সমতট',

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গকে 'রাঢ়' বা 'সুহ্ম' এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গকে 'গৌড়' বলা হইত। এই অংশগুলির মধ্যে গৌড়ই সম্ভবত সর্বাগ্রে ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাণিনি-সূত্রে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং বিভিন্ন পুরাণে গৌড় সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়ান চোয়াং তাঁহার বিবরণীতে কর্ণসুবর্ণ (গৌড়), পুণ্ড্রদেশ, তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ও সমতট রাজ্যগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীতে বঙ্গদেশ সম্ভবত 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এই দুই প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। কারণ, পালরাজগণ নিজেদিগকে 'গৌড়েশ্বর' ও 'বঙ্গপতি' উপাধিতে ভূষিত করিতেন। পরে 'গৌড়' বলিলে সমগ্র বঙ্গদেশকেই বুঝাইত।

গৌড়ের অভ্যুত্থান।—গুপ্তপূর্ব যুগের প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের রচনা হইতে জানা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) পূর্ব ভারতে "প্রাশিই" (প্রাচ্য) ও "গঙ্গরিডই" নামে দুইটি প্রবল জাতির বাস ছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, এই গঙ্গরিডই জাতিই বাঙ্গালী জাতি। জনৈক গ্রীক লেখক বলিয়াছেন, "ভারতে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গরিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের চারি সহস্র সুসজ্জিত রণহস্তী রহিয়াছে। সেজন্য অপর কোনও রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই।" অজ্ঞাতনামা গ্রীক-নাবিক রচিত "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী" গ্রন্থে এবং টোলেমি-রচিত ভৌগোলিক বিবরণেও এই গঙ্গরিডই জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রীকগণ-কথিত এই জাতি সম্পর্কে দেশীয় লিপি বা সাহিত্য হইতে কিছুই জানা যায় নাই।

প্রাক-মৌর্য যুগ

মৌর্যগণের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ সম্ভবত মগধের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু মৌর্য বংশের পতনের পর তথায় কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। সমুদ্রগুপ্ত যে চন্দ্রবর্মা নামে রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, অনেকের মতে, তাঁহার রাজধানী ছিল পুষ্করণে বা বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পোখরনে। গুপ্তযুগে সমগ্র বাংলাদেশ যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৌর্য ও গুপ্ত যুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাংলাদেশে সম্ভবত পুনরায় কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ সময়কার তিনজন রাজার নাম জানা গিয়াছে—ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। ইঁহাদের মধ্যে গোপচন্দ্রই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন মনে হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কনৌজের

গুপ্তোত্তর যুগ
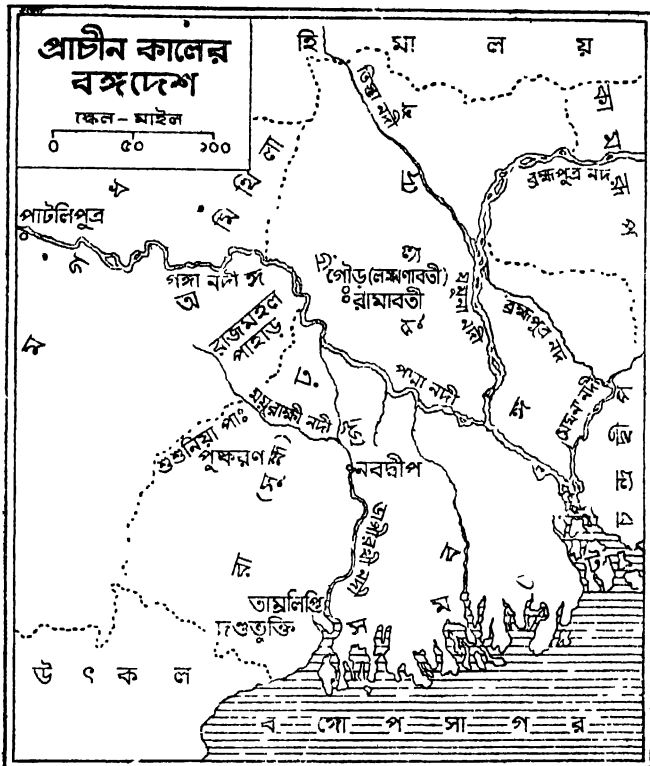
মৌখরিবংশীয় রাজা ঈশানবর্মণ ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়ে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন।

শশাঙ্ক।—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মহারাজ শশাঙ্কের অধীনে গৌড় খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি)। কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ এবং থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শশাঙ্ক কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও নির্ধারিত হয় নাই। রোটাসগড়ের পর্বতগাত্রে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' নামটি খোদিত রহিয়াছে। তাহা হইতে অনেকে মনে করেন, শশাঙ্ক গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে বারাণসী হইতে দক্ষিণে কোঙ্গোদ (গঞ্জাম জেলা) পযন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহার রাজত্বকাল এখনও সুনির্দিষ্ট হয় নাই। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সময়ে (৬০৬ খ্রীঃ অঃ) শশাঙ্কের অধীনে গৌড় বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভববংশীয় এক রাজা নিজেকে শশাঙ্কের অধীন সামন্তরাজ বলিয়া তাঁহার একটি লিপিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বোঝা যায়, শশাঙ্ক ঐ সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন ও তাঁহার অধিকার কোঙ্গোদ (গঞ্জাম) পযন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান চোয়াং যখন নালন্দায় গিয়াছিলেন, তখন শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন না। অর্থাৎ ৬১৯ হইতে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল।

বাণভট্ট ও ইউয়ান চোয়াংয়ের রচনা হইতে জানা যায়, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অভিযোগ সম্ভবত সত্য নহে। (১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শশাঙ্ক শিবের উপাসক এবং বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন। ইউয়ান চোয়াংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি বহু বৌদ্ধ-বিহার ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী একটি মন্দির হইতে বুদ্ধমূর্তি সরাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সর্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছিল এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইউয়ান চোয়াংয়ের এই উক্তিকে সর্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেই ইউয়ান চোয়াং গৌড়দেশ

ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই বিবরণী হইতে জানা যায়, তখন গৌড়ে বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। শশাঙ্ক যে গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড় পুনরায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলাদেশ সম্ভবত হর্ষ ও ভাস্করবর্মণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

পালগণের অভ্যুত্থান।—ইহার পর প্রায় একশত বৎসর বাংলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কনৌজরাজ যশোবর্মণ এবং কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই বাংলাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। দেশে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেগুলির মধ্যে অবিরাম বিবাদ-কলহ লাগিয়াই ছিল। ফলে দেশে অনৈক্য, অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে। তাহা হইতে ঐ সময়কার বংলাদেশে দুর্বলের উপর সবলের যে অত্যাচার চলিতেছিল, তাহাকে 'মাৎস্য ন্যায়' বলা হইয়াছে। মাৎস্য ন্যায়ের অবস্থা বাংলা দেশে প্রায় এক শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গোপাল নামে এক বীরকে রাজা নির্বাচিত করিলেন। গোপালের বংশপরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। পালরাজগণের একটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু বিখ্যাত পণ্ডিত ("সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ") ছিলেন এবং পিতা বপ্যট শত্রু দমন করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। গোপালের রাজত্বকাল এখনও সুনির্দিষ্টভাবে স্থির হয় নাই। সম্ভবত সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। মুঙ্গেরে দেবপালের ও নালন্দায় ধর্মপাল ও দেবপালের কতকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে পালবংশ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রাজা ভোজের তাম্রলিপিটিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

মাৎস্য ন্যায

গোপাল

মুঙ্গের, নালন্দা এবং গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত লিপি

ধর্মপাল।—গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল রাজা হন (আঃ ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। ধর্মপাল প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে তাঁহাকে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজগণের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহা দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্মপালের সাম্রাজ্য

নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের তাম্র-শাসন হইতে জানা যায়, ধর্মপাল হিমালয় হইতে রামেশ্বর (সেতুবন্ধ) পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন এবং দ্রাবিড়রাজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহা কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয়। গোয়ালিয়র লিপিতে গুর্জর-প্রতিহার ভোজ তাঁহার পিতামহ দ্বিতীয় নাগভটের সমসাময়িক পালরাজকে (ধর্মপালকে) 'বঙ্গেশ্বর' বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বোঝা যায়, সমগ্র পূর্ববঙ্গ ধর্মপালের অধিকারে ছিল। ধর্মপাল "বিক্রমশীল" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বর্তমান ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটে যে বিরাট বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বিক্রমশীলা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকালের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই মৌর্য ও গুপ্তরাজগণের বিখ্যাত রাজধানী পাটলিপুত্র পুনর্বায় উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি উত্তর বঙ্গে সোমপুর নামক স্থানে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষ হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারতের অন্য কোথাও এমন বিশাল বৌদ্ধ বিহার আর ছিল না। তিনি বিহারের উদ্দণ্ডপুরেও (ওদন্তপুর) একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী হইলেও অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ।

বিক্রমশীলা

সোমপুর বিহার পাহাড়পুর

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সোমপুর বিহারের একাংশ

দেবপাল।—ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজা হন (আঃ ৮১০)। তিনি কেবল পিতার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই, তাহা আরও বর্ধিত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার কতকাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। আসাম তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কাশ্মীরের নিকটবর্তী কাম্বোজ রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজা মিহির ভোজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। দেবপাল অন্তত ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই পাল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতের বাহিরেও তাঁহার প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার অনুমতি চাহিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক একটি আরবী পুস্তক হইতে জানা যায়, তাঁহার প্রায় ৫০,০০০ রণহস্তী ছিল; তাঁহার সৈন্যবাহিনীর পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করিবার জন্য ১৫,০০০ লোক নিযুক্ত থাকিত।

গৌরব ও প্রতিপত্তি

পরবর্তী পাল রাজগণ।—দেবপালের মৃত্যুর পর পালরাজগণ প্রায় তিন শত বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ তিন শত বৎসরের ইতিহাসকে পালবংশের "পতন-অভ্যুদয়ের" এক সুদীর্ঘ কাহিনী বলা চলে।

দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল (শূরপাল) এবং বিগ্রহ-পালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নারায়ণপাল (আঃ ৮৫৪—৯০৮) রাজা হন। এই সময়ে গুর্জর-প্রতিহারগণ মিহির ভোজ ও তৎপুত্র মহেন্দ্রপালের অধীনে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। নারায়ণপাল মিহির ভোজ ও মহেন্দ্রপালের নিকট পরাজিত হন এবং মগধ ও উত্তর বঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা আমোঘবর্ষের নিকটও সম্ভবত তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। কলচুরিরাজ কোক্কলও সম্ভবত এই সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এইভাবে নারায়ণপালের আমলেই পাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে, এমন কি বাংলাদেশের অনেকাংশ বহিঃশত্রুর পদানত হয়।

পাল সাম্রাজ্যের পতন

নারায়ণপালের পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল, পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল প্রায় ৮০ বৎসর (আঃ ৯০৮—৯৮৮) রাজত্ব করেন। ইঁহারা জেজাকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ড) চন্দেল্ল এবং মধ্যভারতের কলচুরি রাজগণের নিকট বার বার পরাজিত হন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বা তিব্বত হইতে কাম্বোজ নামে একটি জাতি আসিয়া উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে অধিকার বিস্তার করে। পালরাজ মহীপালের একটি তাম্রশাসনে এই কাম্বোজ রাজগণকেই সম্ভবত "অনধিকারী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সমসাময়িক চন্দেল্ল ও কলচুরি রাজগণের প্রশস্তিতে বঙ্গ, বঙ্গাল, গৌড়, রাঢ়, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যজয়ের বর্ণনা আছে। তাহা হইতে বোঝা যায়, ঐ সময়ে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য বঙ্গদেশে বর্তমান ছিল। হরিকেলে (পূর্ববঙ্গে) কান্তিদেব নামে এক রাজা দশম শতাব্দীতে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কান্তিদেব ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহার বংশধরগণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। কান্তিদেবের অল্পকাল পরে লয়হচন্দ্রদেব নামে এক ব্যক্তি কুমিল্লা অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যায়, "চন্দ্র" উপাধিধারী এক রাজবংশ হরিকেলে (পূর্ববঙ্গে) রাজত্ব করিতেছেন। চন্দ্রদ্বীপ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবত তাঁহাদের বংশের নাম অনুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পাঁচখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি "বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত। তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বিক্রমপুরই তাঁহাদের রাজধানী ছিল এবং তাঁহারা হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ

বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব

ইহা হইতে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পালরাজ্য তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে কাম্বোজ জাতীয় রাজগণ, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ এবং মগধ ও অঙ্গে পালবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

পালগণের পুনরভ্যুত্থান।—দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁহার পুত্র মহীপাল রাজা হন (আঃ ৯৮৮)। তিনি পাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব অনেকখানি ফিরাইয়া আনেন। রাজ্যলাভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ অধিকার করেন। মিথিলা (উত্তর বিহার) ও বারাণসী তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে পরাক্রান্ত রাজেন্দ্র চোল রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে মহীপালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। মহীপাল যুদ্ধে পরাজিত হইলেও তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। চোলরাজের সভাকবি এই অভিযানের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, শিব-উপাসক চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল শিব-পূজার উদ্দেশ্যে ভাগীরথী হইতে গঙ্গাজল আনিবার জন্যই অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সামান্য কারণে যে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, ইহা মনে করা সহজ নহে। তবে বঙ্গদেশে রাজেন্দ্র চোলের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, চালুক্য এবং মধ্য ভারতের কলচুরিগণের সহিতও সম্ভবত মহীপালের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মহীপাল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর (৯৮৮—১০৩৮) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহীপাল

চোল আক্রমণ

মহীপাল খুব জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ ও পাল-বংশীয় রাজগণের কীর্তি-চিহ্নগুলি রক্ষার জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের ফলে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি তাহার সংস্কার ও জীর্ণোদ্ধার করেন। বোধগয়াতেও তিনি দুইটি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি রাজ্যে বহু দীঘিকা খনন করেন। ঐ সকল দীঘির অনেকগুলির সহিত তাঁহার নাম আজও জড়িত আছে।

মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পাল রাজা হন (অঃ ১০৩৮-৫৫)। কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সহিত সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায়, লক্ষ্মীকর্ণ মগধ আক্রমণ করিলে প্রথমে নয়পাল পরাজিত হন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি শক্তি সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মীকর্ণকে পরাজিত করেন। এই সময়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মগধে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। কিন্তু সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। লক্ষ্মীকর্ণ পুনরায় পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। এবারেও প্রথমে লক্ষ্মীকর্ণ বিজয়ী হইলেও পরে তৃতীয় বিগ্রহপাল তাঁহাকে পরাভূত করেন। বিগ্রহপালের সহিত লক্ষ্মীকর্ণ স্বীয় কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে সম্ভবত পাল ও কলচুরি রাজগণের মধ্যে স্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হয়।

নয়পাল

পাল কলচুরি সংঘর্ষ

তৃতীয় বিগ্রহপাল

কলচুরিগণের সহিত সুদীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে পালরাজগণ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু খণ্ড ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পাল রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে দাক্ষিণাত্য হইতে কল্যাণীর চালুক্যবংশীয় এবং উড়িষ্যার সোমবংশী রাজগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কেবল বঙ্গদেশে নয়, মগধেও পালরাজগণ হীনবল হইয়া পড়েন।

দিনাজপুরের কৈবর্ত স্তম্ভ
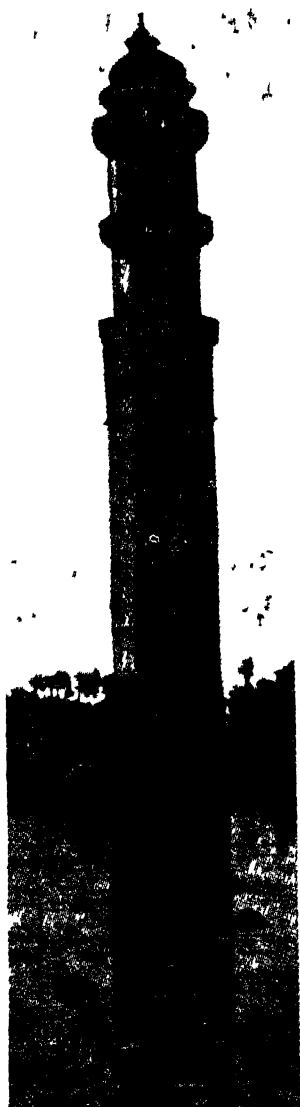
বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হন। দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালেই উত্তর বঙ্গে বিখ্যাত "কৈবর্ত বিদ্রোহ" ঘটিয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত "রামচরিত" গ্রন্থ হইতে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। কৈবর্ত নায়ক দিব্য বা দিব্বোক সম্ভবত প্রথম জীবনে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্রোহী দিব্যের হস্তে মহীপাল নিহত হন এবং উত্তর বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। দিনাজপুরের "কৈবর্ত স্তম্ভ" আজও এই রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রামপাল রাজা হন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার "রামচরিত" কাব্যে তাঁহারই জীবন বর্ণনা করেন। দিব্বোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রোক এবং তৎপরে রুদ্রোকের পুত্র ভীম রাজা হন। রামপাল অন্যান্য রাজার নিকট হইতে সৈন্য ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়া ভীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। যুদ্ধে ভীম বন্দী হন। পরে তাঁহাকে বধ্যভূমিতে পরিজনবর্গসহ হত্যা করা হয়। এইভাবে রামপাল উত্তর বঙ্গে পুনরায় পালগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের বর্মরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। কামরূপও তাঁহার পদানত হয়। উত্তর ও পূর্ব দিকে বিজয়ী হইয়া রামপাল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অভিযান করেন। রাঢ়ের সামন্তরাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কলিঙ্গ পর্যন্ত উৎকলদেশ তাঁহার পদানত হয়। এইভাবে রামপাল পাল রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ইহা নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার শেষ প্রজ্বলনের মতোই ক্ষণস্থায়ী ছিল। প্রায় ৪২ বৎসর রাজত্ব করিবার পর রামপালের মৃত্যু হইলে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব চিরতরে অস্তমিত হয়। পালবংশীয় রাজগণ আরও কিছুদিন উত্তর বঙ্গ, গৌড় ও মগধে রাজত্ব করেন।

দ্বিতীয় মহীপাল

কৈবর্ত বিদ্রোহ

দিব্বোক ও ভীম

রামপাল

বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুত্থান।—পাল রাজগণের সময়ে বঙ্গদেশে ও মগধে (বিহারে) বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। পাল সম্রাটগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্যে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, সোমপুর,

(পাহাড়পুর) প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষগুলি তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করিতেছে। পাল যুগে নালন্দার বৌদ্ধ-বিহারটিও শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে আপন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এই যুগে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতের বাহিরেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার

বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত ও তাঁহার ভগিনীপতি আচার্য পদ্মসম্ভব তিব্বতরাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন এবং তিব্বতীয় ভাষায় বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন। তিব্বতরাজ তাঁহার রাজধানী লাসায় ওদন্তপুর বিহারের অনুকরণে যে বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন, শান্তিরক্ষিত তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বিষয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অতীশ নামে পরিচিত। এখনও তিব্বতে তাঁহার স্মৃতিপূজা হইয়া থাকে। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বাংলা দেশের বিক্রমপুরের এক রাজবংশে অতীশের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তাঁহার পিতার নাম যৌবনশ্রী

অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

ও তাঁহার মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুর বিহারের অধ্যক্ষ শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার নূতন নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতঃপর ধর্মাচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট শিক্ষালাভের জন্য সুবর্ণদ্বীপে যান। সেখানে বারো বৎসর শিক্ষা-লাভের পর তিনি সিংহল ভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মগধে আসিলে পালরাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিব্বতরাজের কাতর মিনতির ফলে শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যান এবং সেখানে বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি তেরো বৎসর তিব্বতে থাকিয়া তথাকার বৌদ্ধ-ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। তিনি ১৬৮টি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী ও বোর্ণিওতে যে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের ধর্মগুরু ছিলেন বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য কুমার ঘোষ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙ্গালীরা যে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অনস্বীকার্য।

কুমার ঘোষ

পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক হইলেও অন্যান্য ধর্মের বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন না। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহারাও পরধর্মসহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

সেনগণের অভ্যুত্থান।—পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গদেশে সেন রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। সেনগণ দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক অঞ্চল হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস করিয়াছিলেন: সম্ভবত প্রথমে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে যুদ্ধাদি কর্মে ব্যস্ত থাকায় "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই বংশের হেমন্ত সেন বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিজয় সেন রাজা হন। ঐ সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ে শূর বংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিজয় সেন শূরবংশীয়া রাজকন্যা বিলাস-দেবীকে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই বিবাহের ফলে দক্ষিণ রাঢ়ে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে বর্ম বংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। বর্মবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া বিজয় সেন দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ অধিকার করেন। পশ্চিম বঙ্গে বিজয়পুর নামক কোনও স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়।

বিজয় সেন

বল্লাল সেন।—বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮—৭৯) রাজা হন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই বল্লাল সেনের নাম বাংলার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। পাল রাজগণের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার হইয়াছিল। বল্লাল সেন বাংলা দেশে পুনরায় হিন্দুধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনিই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন

কৌলীন্য প্রথা

করেন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তিনি পরবর্তী কালে অমর হইলেও তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। পিতার জীবদ্দশায় তিনি মিথিলা জয় করিয়াছিলেন। মগধের পালবংশীয় রাজা গোবিন্দপাল সম্ভবত তাঁহার হস্তেই পরাজিত হইয়াছিলেন (১১৬২)। লেখক ও বিদ্যোৎসাহী হিসাবেও তাঁহার

সাহিত্যপ্রতিভা

যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি কতিপয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে "দানসাগর" ও "অদ্ভুত-সাগর" সমধিক প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মণ সেন।—বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁব পুত্র লক্ষ্মণ সেন রাজা হন (১১৭৯-১২০৫)। তিনি যুবরাজরূপে বহু যুদ্ধে সৈনাপত্য করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ, কামরূপ ও মিথিলা জয়ের কৃতিত্ব সম্ভবত তাঁহারই ছিল। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তিনি পুরী, কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন

দিগ্বিজয়

করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ সকল স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গৌড় তখনও সম্ভবত কোনও পালবংশীয় রাজার অধীন ছিল। লক্ষ্মণ সেন গৌড় জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ রাজধানী "লক্ষ্মণাবতী" নামে পরিচিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে মুসলমানগণ উত্তর ভারত জয় করিয়া মগধে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময় লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন। মুসলমান সেনাপতি ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ্ বিন্ বক্তিয়ার খলজি অতর্কিতে

মুসলমান আক্রমণ

নদীয়া আক্রমণ করিলে লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। মুসলমানগণ নদীয়া অধিকার করিলেও অবশিষ্ট বাংলা তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি তথায় আরও চার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। অষ্টাদশ তুর্কী অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনী সত্য নহে। লক্ষ্মণ সেন একাধারে বীর ও বিদ্যোৎসাহী

লক্ষ্মণসেনের গুণাবলী

ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার অসমাপ্ত "অদ্ভুতসাগরের" রচনা শেষ করেন। জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর, শরণ প্রভৃতি বাংলার বিখ্যাত কবিগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ ছিলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি।

পরবর্তী সেনগণ।—লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন পর পর রাজা হন। সেন বংশীয় রাজগণ ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়েন। সেন বংশের শেষ রাজা সম্ভবত ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি।—আর্য সভ্যতা বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে বঙ্গদেশে কিরূপ সমাজ ও সভ্যতা প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায় নাই; তাহা সম্পূর্ণ অনুমানসাপেক্ষ। তবে একথা একান্ত সত্য যে, আর্য সভ্যতা বঙ্গদেশে কখনই আর্যপূর্ব সভ্যতাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। তাই আর্য ও আর্যপূর্ব সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলে বঙ্গদেশে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাতে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকাই ছিল অনিবার্য। খাদ্য ও বেশভূষার দিক হইতে এই স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষিত হয়। এখনকার বাঙ্গালীদের মতোই প্রাচীন বাঙ্গালীদেরও ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফল-মূল, দুধ, ঘি, দই, পিঠা, পায়স ইত্যাদি প্রধান খাদ্য ছিল। ব্রাহ্মণরাও আমিষ ভোজন করিতেন। সুরাপান সামাজিক ভাবে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাঙ্গালীরা মদ্যপান করিতেন। কারণ, প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যে শৌণ্ডিকালয়ের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হইতে প্রাচীন কালের বাঙ্গালীরা কি ধরনের বেশভূষা ব্যবহার করিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পুরুষরা মালকোচা দিয়া খাটো ধুতি পরিতেন। তাহা সাধারণত হাঁটুর নিচে নামিত না। মেয়েরা শাড়ি পরিতেন। তাঁহাদের শাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত নামিত; তবে নাভির উপরের অংশ সাধারণত অনাবৃত থাকিত। পুরুষরা উত্তরীয় এবং স্ত্রীলোকরা ওড়না ব্যবহার করিতেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলংকারপ্রিয় ছিলেন। পুরুষদের মাথার বাবরী চুল ঘাড়ের উপর ঝুলিয়া পড়িত। মেয়েরা নানা ভঙ্গিমায় খোপা বাঁধিতেন। শঙ্খ-বলয় তাঁহাদের প্রিয় ছিল। বাঙ্গালীরা চামড়ার জুতা ও কাঠের খড়ম এবং ছাতা ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গীয় সমাজ ও বৈশিষ্ট্য

খাদ্য ও বেশভূষা

বাঙ্গালীদের জাতীয় জীবন খুবই উন্নত ছিল। ইউয়ান চোয়াং তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছেন যে, সমতটের লোকেরা শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা দৃঢ়চরিত্র ও সাহসী এবং কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীরা সৎ ও অমায়িক এবং বাঙ্গালী রমণীরা মৃদুভাষিণী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। ইউয়ান চোয়াং বাঙ্গালীর বিদ্যোৎসাহ সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। মল্ল, মৃগয়া, শরীর-চর্চা ও নৃত্যগীতে বাঙ্গালীর খুবই সুনাম ছিল। পাশা ও দাবা খেলা বাঙ্গালীর প্রিয় ছিল।

রুচি ও চরিত্র

প্রাচীন বাংলা এখনকার মতোই কৃষিপ্রধান ছিল। কৃষিজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ধান্য। ধান্যের পরেই সম্ভবত স্থান ছিল ইক্ষুর। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে ইক্ষুর চাষ ও গুড় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইত। অনেকে মনে করেন, এই গুড় শব্দ হইতে "গৌড়" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। সরিষা, পান ও কার্পাসের চাষও প্রচুর পরিমাণে হইত। রাজাই ছিলেন জমির মালিক। জমির বণ্টন বা ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে সম্ভবত গ্রাম-প্রধানদের কিছু কর্তৃত্ব ছিল।

কৃষি

শ্রমশিল্পের দিক হইতে প্রাচীন বাংলা অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে" বাংলার বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে প্রচুর প্রশংসাসূচক উল্লেখ দেখা যায়। টোলেমির ভৌগোলিক বিবরণ ও "পেরিপ্লাস" পুস্তক হইতে জানা যায়, সুপ্রাচীন কালে বাংলাদেশ হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত। মাটি, সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, কাঁসা, শাঁখ ও হাতীর দাঁতের কাজেও প্রাচীন বাংলা অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল।

শ্রমশিল্প

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালী পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। গুপ্ত যুগে দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গের তাম্রলিপ্তি হইতে পণ্য ও যাত্রীবাহী পোতগুলি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিতেছে। ফা-হিয়েন ঐরূপ একটি পোতে করিয়াই সিংহলের পথে চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশম্‌" কাব্যে বাঙ্গালী জাতিকে "নৌসাধনোদ্যত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য সাধারণত নৌকা ও গোযান ব্যবহৃত হইত। বঙ্গদেশে স্বর্ণ,

ব্যবসায়-বাণিজ্য

রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। কপর্দক বা কড়িও ক্ষুদ্র মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় দেশে নগর ও বন্দরের উন্নতি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাম্রলিপ্তি প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার "রামচরিতে" রামপালের রাজধানী রামাবতীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে প্রাচীন বাংলার নগরগুলি কিরূপ ছিল, তাহা অনেকখানি অনুমান করা যায়। তাহাতে

নগর

বলা হইয়াছে, প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে তুষারধবল প্রাসাদশ্রেণী গিরিশিখরের ন্যায় বিরাজ করিত। প্রাসাদশীর্ষে স্বর্ণকলস শোভা পাইত।

বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মৌর্য যুগেই সম্ভবত উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে জৈনধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়. খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে ঐ স্থানে একটি জৈন বিহার ছিল। ইউয়ান চোয়াং তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছেন, তিনি বাংলাদেশে বহুসংখ্যক দিগম্বর জৈন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেই যে বাংলাদেশে জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, পাল ও সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ঐ সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু ও শিব অন্যতম প্রধান দেবতা হিসাবে পূজিত হইতেন। অন্যান্য দেবদেবীগণের মধ্যে দুর্গা, সরস্বতী ও কার্ত্তিকেয় ছিলেন প্রধান। বাংলাদেশে মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দেবদেবীগণের অসংখ্য মূর্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মই বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে

ধর্ম

বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, কেবল তাম্রলিপ্তিতেই বাইশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। ফা-হিয়েন দুই বৎসর তাম্রলিপ্তিতে থাকিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ মূর্তির ছবি আঁকিয়াছিলেন। ৫০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা

যায়, ঐ সময় কুমিল্লায় বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। পাল রাজগণের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অসংখ্য মূর্তি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশে নানা সম্প্রদায়ের হস্তে নানা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সেগুলির মধ্যে সহজযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সহজিয়া মত ও সাধন

সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই ধর্মের আচার্যগণ "সিদ্ধাচার্য" নামে খ্যাত। মোট ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা সম্ভবত দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সহজযান ধর্মমতে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। সহজিয়াপন্থীরা বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতি, জৈন, এমন কি অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর পরিহাস-বিদ্রূপ করেন। এ সম্পর্কে সিদ্ধাচার্য সরহের দোহাকোষ হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া চলে। "হোম করিলে মুক্তি হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষুর পীড়া হয় এই মাত্র।" "ঈশ্বরভক্তেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট করে, কানে খুসখুস করে ও লোককে ধোঁকা দেয়।" "যদি নগ্ন থাকিলে মুক্তি হয়, তবে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে আসিবে।" গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও গোপন রহস্যে আবৃত থাকায় সহজিয়া ধর্ম ক্রমেই অধঃপতিত হইল এবং নানা তান্ত্রিক ও শৈব সম্প্রদায়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া বীভৎস রূপ গ্রহণ করিল।

বজ্রযান

বজ্রযান সাধনরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাতে সাধক সাংকেতিক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবদেবীর পূজা করিতেন। পূজার ফলে দেবদেবীগণ নাকি সাধকের চারিদিকে উপবিষ্ট হইতেন। যখন সাধকের মন্ত্রোচ্চারণ-শক্তি লোপ পাইত, তখন সাধক কেবল মুদ্রার দ্বারা অর্থাৎ হস্ত ও অঙ্গুলির বিন্যাসের দ্বারা পূজা করিতেন।

প্রাচীন কালে বাংলাদেশ সাহিত্যের দিক হইতেও প্রচুর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বাস্তবিক পক্ষে মুসলিম

আমলের পূর্বে হয় নাই। তাই প্রাচীন বাংলার সাহিত্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হইত। বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডী ও চীনা পরিব্রাজকদের রচনা হইতে জানা যায় সাহিত্যে বঙ্গদেশ খুবই উন্নত ছিল। প্রাচীনকালে সংস্কৃত কাব্যে "গৌড়ী" ও "বৈদর্ভী" নামে দুইটি রচনারীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলংকারিক ভামহের মতে "গৌড়ী" রীতিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে। মহাকবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্য ভারতীয় সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে "পবনদূত" রচনা করিয়া ধোয়ী অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। চরক ও

প্রাচীন বাংলার অপরূপ একটি শিবমূর্তি

সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

"দায় ভাগ" নামক উত্তরাধিকার বিধি-সংক্রান্ত গ্রন্থপ্রণেতা জীমূতবাহনও বাঙ্গালী ছিলেন। সম্ভবত তিনি পাল যুগে জীবিত ছিলেন। শীলভদ্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ন্যায় মহামনীষীরাও প্রাচীন বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের মাত্র একখানি গ্রন্থের (আর্য-বুদ্ধভূমি-ব্যাখ্যান) অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় পাওয়া গিয়াছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১৬৮ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য

পাল ও সেন রাজগণের আমলেই বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছিল। তবে বাংলা ভাষায় তখনও কোনরূপ সাহিত্য রচিত হয় নাই। সিদ্ধাচার্যদের রচিত কয়েকটি গান বা দোহা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিকেই আদিম বঙ্গভাষার নমুনা মনে করা হয়।

বাংলা ভাষা

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ চিত্রশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। তিব্বতীয গ্রন্থ হইতে পাল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বিটপালের নাম জানা গিয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকখানি পুঁথিতে বজ্রযান-তন্ত্রমতোক্ত দেবদেবীর কিছু ছবি পাওয়া গিয়াছে। তাহার আগেকার কোন চিত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাপ্ত ছবিতে শিল্পীরা বর্ণ ও রেখার ব্যবহারে যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা সহজেই অজন্তা ও ইলোরার চিত্রগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে বাঙ্গালী শিল্পী কি ধরনের ছবি আঁকিতে পারিতেন, তাহার সুন্দর নিদর্শন সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মান পালের তাম্রশাসনেব অপর পৃষ্ঠে অঙ্কিত বিষ্ণুমূর্তিটি হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

চিত্রকলা

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মন্দির ও নগরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হইতে প্রাচীন কালের বাংলাদেশ যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে কিরূপ উন্নত ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাহাড়পুরে (রাজসাহী) সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মহাস্থানগড়ে (বগুড়া) পৌণ্ড্রনগরীর ধ্বংসাবশেষ, বাণগডে (দিনাজপুর) কোটিবর্ষের ধ্বংসাবশেষ ও বেড়াচাঁপায় (চব্বিশ পরগণা) চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ মন্দিরই কাঠ ও ইঁট দিয়া

নির্মিত ছিল। তাই সেগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়াছে। প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরগুলি ও ধ্বংসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য-খচিত বহু অংশ ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার অপরূপ একটি বিষ্ণুমূর্তি

ধ্বংসাবশেষ ও স্থাপত্য

সেগুলি হইতে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-শিল্প সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। ব্রোঞ্জনির্মিত যে সকল ছোট মন্দির পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে প্রাচীন মন্দিরের গঠন কিরূপ ছিল, তাহা অনুমান করা চলে।

মৃৎশিল্প

পোড়া মাটির শিল্পেও বাংলাদেশ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য পোড়া মাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলাদেশে প্রস্তর সুলভ না হওয়ায়, বাঙ্গালী

শিল্পীরা মৃৎশিল্পের প্রতি খুবই জোর দিয়াছিলেন এবং তাহাতে অসামান্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

বহির্বিশ্বের সহিত কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক হইতে নহে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের দিক হইতেও প্রাচীন বাংলা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুমার ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমার ঘোষ সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন। বাঙ্গালীর রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাচীনকালে এক বিশেষ ধরনের মন্দির-শিখর রচনা করা হইত, ব্রহ্মদেশে এখনও ঐ ধরনের মন্দিরশিখর নির্মাণরীতি দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার মূর্তিশিল্পের সহিত যবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জের মূর্তিশিল্পের খুবই সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাই পণ্ডিতগণ মনে করেন, এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারে বাঙ্গালীগণ একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের সহিত যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল, তাহাও বিভিন্ন সূত্র হইতে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

বিদেশের সহিত যোগাযোগ

প্রশ্নাবলী

1. Who was the first mighty king of Bengal? What was the political condition of Bengal before his accession? Do you agree with Hiun-Tsang's statements about him?

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা কে? তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? তাঁহার সম্পর্কে হিউয়ান চোয়াং যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কি একমত হওয়া যায়?

2. Who was the founder of Pala dynasty? What political condition led to his accession? Who were his famous son and grandson? What were their political and cultural achievements?

পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? কি অবস্থার ফলে তাঁহার রাজ্যলাভ ঘটিয়াছিল? তাঁহার বিখ্যাত পুত্র ও পৌত্র কে ছিলেন? তাঁহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তিগুলি কি?

3. What led to the fall of Pal dynasty and under whom did it revive? What do you know of the "Kaibarta rebellion" and the final dissolution of Pal kingdom?

কি কারণে পাল রাজবংশের পতন ঘটিয়াছিল? কাহার অধীনে পালবংশ সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল? "কৈবর্ত বিদ্রোহ" ও পাল রাজ্যের চূড়ান্ত পতন সম্পর্কে কি জান?
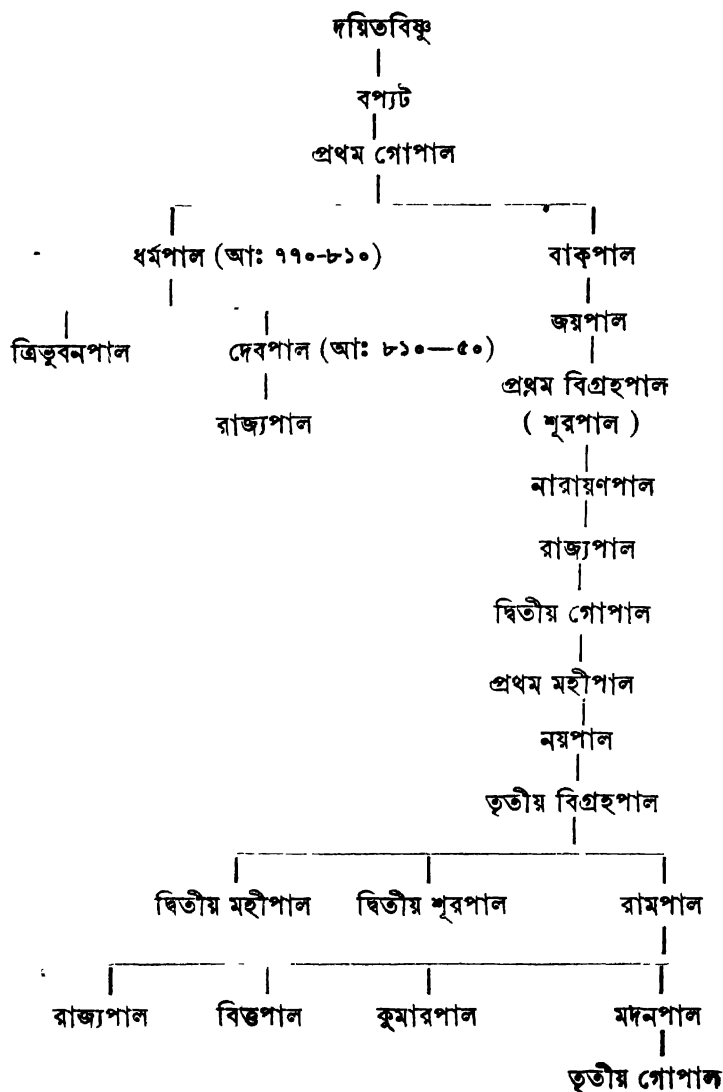
পালরাজগণের বংশাবলী

সেনরাজগণের বংশাবলী
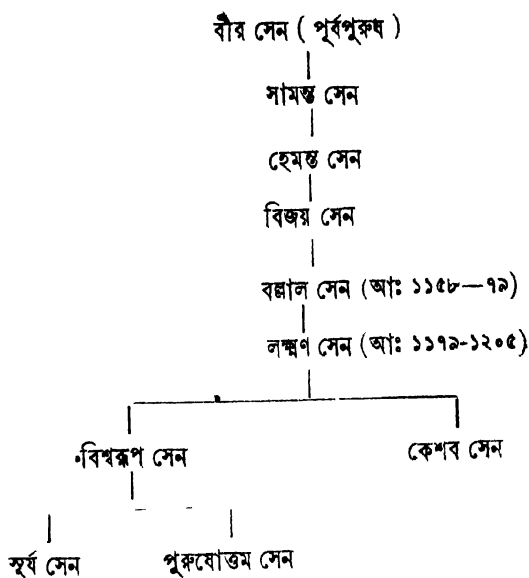
একাদশ পরিচ্ছেদ

খণ্ডিত ভারত ও মুসলমান আক্রমণ

Syllabus : Rise of Islam in Arabia—Arab invasion of Sind—spread of Islam in Central Asia and India—the Ghaznavids—Albiruni and his account. Resistance of the Gurjara-Pratiharas and the Rashtrakutas in the West and the Sahiyas in the North West. Rise of the Rajput principalities—discussion of origin. The Gurjara-Pratihara Empire. Pratihara-Rashtrakuta-Pala contest. Bhoja—Mahendrapala I and Mahipala.—Internal dissensions invite foreign aggression. Muhammad of Ghor's invasion—establishment of the Delhi *S*ultanate by Kutubuddin—North and West Bengal brought under Turkish rule.

পাঠসূচী ঃ আরবে ইসলামের অভ্যুত্থান—আরবগণের সিন্ধু অভিযান—মধ্য-এশিয়া ও ভারতে ইসলামের প্রসার—গজনবীগণ আলবিরুনি ও তাঁহার বিবরণ। পশ্চিমে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণের ও উত্তর-পশ্চিমে শাহীগণের বাধাদান। রাজপুত রাজ্যগুলির অভ্যুত্থান—রাজপুতগণের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা। গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য। প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট-পাল প্রতিযোগিতা। ভোজ—প্রথম মহেন্দ্রপাল ও মহীপাল—আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণ। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ—কুতবুদ্দিন কর্তৃক দিল্লী সুলতানির প্রতিষ্ঠা—উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে তুর্কী শাসনের সূত্রপাত।

ইসলামের অভ্যুত্থান।— ভারতবর্ষে কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন, গৌড়রাজ শশাঙ্ক, চালুক্যরাজ পুলকেশী, এবং পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের মতো শক্তিশালী রাজগণ যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন আরবের মরুপ্রান্তরে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়াছিল। উহা হইল ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ মক্কায় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে আরব জাতির মধ্যে এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। এই ধর্মের মূলকথা হইল—আল্লাহ্ বা ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার; সুতরাং দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া বা প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতিকে দেবদেবীর মূর্ত প্রকাশ ভাবিয়া পূজা করা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নহে; মহম্মদ স্বয়ং হইলেন ঈশ্বর-প্রেরিত দূত

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার বাণী

বা পয়গম্বর। মহম্মদ প্রায় ২০ বৎসর তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। অতঃপর ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইসলাম ধর্ম আরবগণের মধ্যে এক নবজীবন সঞ্চার করে এবং অসংখ্য আরব উপজাতি এক মহান্ প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হয়।

মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্মের প্রচারের অধিনায়কত্ব করেন ধর্মনায়ক বা খলিফাগণ। আবু বক্কর, ওমর ও ওসমান পর পর খলিফা নির্বাচিত হন। আবু বক্করের সময়ে সিরিয়া ও মেসোপটোমিয়া মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়। খলিফা ওমরের আমলে মুসলিম অধিকার পূর্বে আফগানিস্থান হইতে পশ্চিমে ত্রিপলি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাঁহার পরবর্তী খলিফা ওসমান্ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে খলিফা পদ লইয়া মুসলমানগণের মধ্যে বিরোধ বাধে। একদল হজরত মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র ও জামাতা আলিকে খলিফা নির্বাচিত করেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াইয়া এই নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। ফলে মুসলমানগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধে। আলি ও তাঁহার পুত্রদ্বয় হাসান ও হোসেন নিহত হন এবং মুয়াইয়া স্বয়ং খলিফা হন। এখন হইতে খলিফার শাসনকেন্দ্র মদিনা হইতে দামাস্কাসে স্থানান্তরিত হয়। মুয়াইয়া নিজেকে কেবল খলিফা নহে, রাজা বলিয়াও ঘোষণা করেন। মুয়াইয়ার বংশধরগণ "ওমাইয়াদ" নামে পরিচিত। এখন খলিফার পদ বংশগত হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, খলিফার পদ লইয়া এই সময় মুসলমানদের মধ্যে যে মতবিরোধ ঘটে, তাহার ফলে মুসলমানগণ 'শিয়া' ও 'সুন্নী' নামে দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। 'শিয়াগণ' কেবল চতুর্থ খলিফা আলিকেই ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলিয়া মনে করেন। অন্য পক্ষে, সুন্নীগণ প্রথম চারিজন খলিফাকেই ন্যায়সংগত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ এমন গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠে যে, তাহা চিরস্থায়ী বিদ্বেষ, ঘৃণা, কলহ ও সংঘর্ষের কারণ হয়। যাহাই হউক, ওমাইয়াদগণের আমলেই আরবগণ খুবই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য জাতিগুলির

প্রথম খলিফাগণ

ওমাইয়াদ বংশীয় খলিফাগণ

শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়

প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে থাকে। এই "ওমাইয়াদ" বংশীয় খলিফাগণের সময়েই আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

আরবগণের সিন্ধু অভিযান।—অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাহারা পূর্বে পারস্য হইতে পশ্চিমে আফ্রিকার মধ্য দিয়া ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মিশর হইতে উত্তরে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দ, ফরগনা ও কাশগড় পর্যন্ত একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এই সময়ে খলিফার অধীনে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হজ্জাজ। তিনি ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। সিন্ধুদেশে আবব সাগরের তীরে দেবল নামে একটি বন্দর ছিল। ঐ বন্দবে জলদস্যুগণ কিছুসংখ্যক আরব-পোত লুণ্ঠন করিলে হজ্জাজ সিন্ধুরাজের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। ঐ সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহির নামে এক ব্রাহ্মণ। তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিলে হজ্জাজ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ অভিযান ব্যর্থ হইল। অতঃপর হজ্জাজ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বিন্ কাশিমকে দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (৭১২)। মহম্মদ বিন্ কাশিম দেবল অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলে রওয়ার নামক স্থানে সিন্ধুরাজ দাহির এক বিশাল বাহিনী লইয়া তাঁহার প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু দাহির যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। অল্পকালের মধ্যে ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর ও মুলতান মহম্মদের পদানত হইল। মহম্মদ দেবল ও রওয়ারে বহু সহস্র হিন্দুকে হত্যা করিলেন। প্রচুর ধনরত্ন তাঁহাব হস্তগত হইল। সিন্ধু অঞ্চল খলিফার অধীনে আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু মহম্মদ বিন্ কাশিমের উপর তাঁহার ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন ছিলেন না। অকস্মাৎ খলিফা কোনও কারণে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কথিত আছে, মহম্মদ বিন্ কাশিম দাহিরের দুই কন্যা পরমল দেবী ও সুরজ দেবীকে বন্দী করিয়া খলিফাকে উপহার দেন। রাজকন্যাগণকে খলিফা তাঁহার হারেমে গ্রহণ করিতে চাহিলে তাঁহারা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মিথ্যা করিয়া

আরব শক্তির অভ্যুত্থান

সিন্ধুরাজ দাহির

মহম্মদ বিন্ কাশিম

অভিযোগ করেন যে, মহম্মদ বিন্ কাশিম তাঁহাদিগকে তিন দিন নিজের হারেমে স্ত্রীর মতো রাখিয়াছিলেন, সুতরাং খলিফার হারেমে স্থান পাইবার যোগ্যতা বা পবিত্রতা তাঁহাদের নাই। ইহাতে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে মহম্মদ বিন্ কাশিমকে গরুর চামড়ায় আপাদমস্তক সেলাই করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিবার আদেশ দেন। খলিফার আদেশ পাইয়া মহম্মদ বিন্ কাশিম স্বহস্তে গরুর চামড়ায় নিজেকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সেলাই করেন। এই অবস্থায় তিন দিন থাকার পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ বিন্ কাশিমের মৃত্যুর ফলে ভারতে আরব সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। পরে খলিফাগণ হীনবল হইয়া পড়িলে সিন্ধুর আরব-অধিকৃত অঞ্চল আরব সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তথায় আরবগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। নবম শতাব্দীতে ভারতে রাষ্ট্রকূট, গুর্জর-প্রতিহার ও পাল রাজগণের অভ্যুত্থানের ফলে ভারতে আরবগণের রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

আরবগণ সিন্ধুর অনুর্বর অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিয়া রাজনৈতিক দিক হইতে খুব লাভবান্ হন নাই। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক হইতে তাঁহারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল। বাগদাদের খলিফাগণ ভারতীয় পণ্ডিত, শিল্পী ও চিকিৎসকগণকে সাদরে বরণ করিয়াছিলেন। দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। আরবগণের নিকট হইতে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পরে পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার

রাজপুতগণের অভ্যুত্থান।—অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজপুতগণ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গুর্জর-প্রতিহারগণের নেতৃত্বেই ভারতে সর্বপ্রথম রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছিল। গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িলে উত্তর ভারতে চন্দেল্ল,

পরমার, চৌলুক্য (সোলাংকী), গাহড়বাল, চৌহান প্রভৃতি বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। রাজপুতবংশীয় রাজগণ নিজেদিগকে সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেন। গৌরীশঙ্কর ওঝা প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী ইঁহাদিগকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের বংশধর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" রচয়িতা টড প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, রাজপুতরা আসলে মধ্য-এশিয়া হইতে আগত শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতিগুলির বংশধর ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করায় ও রণনিপুণ হওয়ায় ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানগণের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

গুর্জর-প্রতিহারগণ।—গুর্জর-প্রতিহারগণ নিজেদিগকে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহারা নাকি লক্ষ্মণের বংশে জন্মিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের দ্বারে প্রতিহারী বা প্রহরী থাকিতেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের নাম "প্রতিহার" হইয়াছিল, এমনও তাঁহারা দাবী করিতেন। তবে উহার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করা যায় না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া হইতে হূণদের সহিত গুর্জর নামে একটি উপজাতি ভারতে আসিয়াছিল। গুর্জরগণের একটি শাখা রাজপুতানার মাড়বার অঞ্চলে শক্তিশালী হইয়া উঠে। রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোনও রাজা মালবে যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞে এক গুর্জররাজ দ্বাররক্ষার কাজ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই সম্ভবত রাজপুতানার গুর্জরগণ "গুর্জর-প্রতিহার" নামে পরিচিত হন।

গুর্জর-প্রতিহারগণ শীঘ্রই দক্ষিণ মালবেও অধিকার বিস্তার করেন। এই বংশের প্রথম নাগভট সিন্ধুর আরবগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া গুর্জর-প্রতিহারগণের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। ভৃগুকচ্ছ বা বরোচেও তিনি অভিযান করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র বৎসরাজ (আঃ ৭৩৮-৭৮৪) পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে গৌড়ে ও মগধে পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল (আঃ ৭৭০—৮১০) এবং দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা ধ্রুব (আঃ ৭৭৯—৭৯৩) রাজত্ব করিতেছিলেন। কনৌজ অধিকার করিয়া বৎসরাজ পূর্বদিকে অগ্রসর হইলে বৎসরাজের সহিত

যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজের এই শক্তিবৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবিস্তার নীরবে সহ্য করিলেন না। তিনি অবিলম্বে বৎসরাজকে আক্রমণ করিলেন। ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইয়া বৎসরাজ রাজপুতানায় পলাইতে বাধ্য হইলেন এবং ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপাল প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিলেন। কনৌজের সিংহাসনে তাঁহার অধীনে চক্রায়ুধ নামে এক রাজা প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বৎসরাজ

গুর্জর-প্রতিহারগণ কিন্তু নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। বৎসরাজের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট (আঃ ৮০৫—৮৩৩) রাজা হইয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গের রাজাদের সহিত মিত্রতা করিয়া নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন এবং কনৌজ আক্রমণ করিলেন। চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের নিকট পলায়ন করিলেন। দ্বিতীয় নাগভট কনৌজে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মুদ্গগিরির (মুঙ্গেরের) যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। এবারেও রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় গোবিন্দ (রাজা ধ্রুবের পুত্র) ধর্মপালকে বিপদ হইতে পরোক্ষভাবে রক্ষা করিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় নাগভট রাজপুতানায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলে উত্তর ভারতে পুনরায় ধর্মপালের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় নাগভট

দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের সময়ে (আঃ ৮৩৬—৮৮৫) গুর্জর-প্রতিহারগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মিহির ভোজ কনৌজ অধিকার করিলেন ; বুন্দেলখণ্ডও তাঁহারা অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু ধর্মপালের পুত্র দেবপালের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। এইভাবে পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি দক্ষিণে রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। শীঘ্রই মালব ও দক্ষিণ রাজপুতানা তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু তিনি পুনরায় রাষ্ট্রকূটগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হইলেন এবং পাল ও রাষ্ট্রকূটগণের হস্তে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার রাজ্য

মিহির ভোজ

আবার রাজপুতানার এক ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইল। তৎকালীন মুসলমান পর্যটক সুলেমান মিহির ভোজকে "আরবগণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন" এবং "ইসলামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ শত্রু" বলিয়া বর্ণনা করেন। সুলেমান ভোজের সৈন্যবাহিনীর, বিশেষত অশ্বারোহী বাহিনীর, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পালরাজগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে ভোজ পুনরায় উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেন। ভোজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল (আঃ ৮৮৫—৯১০) রাজা হন। তাঁহার আমলেই গুর্জর-প্রতিহার শক্তি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি পালবংশীয় রাজা নারায়ণপালকে পরাজিত করিয়া মগধ ও উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন। তিনি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "কর্পূরমঞ্জরী" নাটকের রচয়িতা বিখ্যাত আলংকারিক রাজশেখর তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

প্রথম মহেন্দ্রপাল

মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পব তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ রাজা হন। কিন্তু শীঘ্রই দ্বিতীয় ভোজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মহীপাল (আঃ ৯১২—৪৪) সিংহাসন অধিকার করেন। ইতিপূর্বে পালবংশীয় রাজা নারায়ণ-পাল বাংলা ও বিহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ৯১৫ হইতে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র এক যুদ্ধে মহীপালকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজ এবং প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্যন্ত প্রতিহার রাজ্য লুণ্ঠন করেন। পরেও মহীপাল রাষ্ট্রকূটগণের হস্তে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। রাষ্ট্রকূটরাজের হস্তে পরাজয়ের ফলেই প্রতিহার সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। এই বংশের শেষ রাজা রাজ্যপাল গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণকালে কনৌজ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধরের হস্তে নিহত হন।

মহীপাল

গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যকেই উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য বলা চলে। গুর্জর-প্রতিহারগণের চেষ্টাতেই ভারতে আরবগণের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের অভ্যুত্থান।—প্রতিহাররাজ মহীপালের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের আমলে উত্তর ভারতে কতিপয় রাজপুত রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। এগুলির মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ, চেদী রাজ্যের (মধ্য প্রদেশ) কলচুরিগণ, মালবের পরমারগণ, গুজরাটের চৌলুক্যগণ এবং শকম্ভরির (রাজপুতানা) চৌহানগণ ও কনৌজের গাহড়বালগণ প্রধান।

চন্দেল্লবংশ।—চন্দেল্লবংশীয় রাজগণ জেজাকভুক্তিতে (বুন্দেলখণ্ড) রাজত্ব করেন। চন্দেল্লগণ গুর্জর-প্রতিহারগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। সম্ভবত দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্জর-প্রতিহাররাজ মহীপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের হস্তে পরাজিত হইলে সেই সুযোগে চন্দেল্লগণ স্বাধীন হইয়া উঠেন। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন ধঙ্গ (৯৫৪—১০০২)। তাঁহার আমলে চন্দেল্ল রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। চন্দেল্লগণের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল খাজুরাহো। রাজা ধঙ্গ তথায় বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেন। গুপ্তোত্তর যুগের উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে খাজুরাহোর মহাদেবের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের হস্তে চন্দেল্লরাজ পরমর্দীদেব পরাজিত হন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতবুদ্দিন কালঞ্জর জয় করিলে চন্দেল্লগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। চন্দেল্লরাজগণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা কৃষ্ণ মিশ্র চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি ছিলেন।

কলচুরিগণ।—চেদী বা কলচুরিগণ ডহল বা ত্রিপুরীতে (বর্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্তী তেওয়ার) নবম শতাব্দীতে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহারা নিজেদিগকে পুরাণে বর্ণিত হৈহয় রাজগণের বংশধর বলিয়া দাবী করিলেও ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা লক্ষ্মণরাজের সময়ে চেদী রাজ্যের আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

সম্ভবত চালুক্য ও চন্দেল্লগণের আক্রমণের ফলেই চেদী রাজ্য সাময়িক-ভাবে হীনবল হইয়া পড়ে। পরে এই বংশের রাজা গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্য

(১০৩০-৪১) চেদী রাজ্যকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তোলেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকর্ণও (১০৪১-৭০) বীর যোদ্ধা ছিলেন। পালরাজ নয়পালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল এবং নয়পালের হস্তে একটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নয়পালকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। মালবের পরমার, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল এবং গুজরাটের চৌলুক্যগণের সহিতও চেদী রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতানগণের আক্রমণের ফলে অবশেষে চেদী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

পরমারগণ।—পরমারগণ প্রথমে রাষ্ট্রকূট সম্রাটের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর-প্রতিহারগণের দ্বন্দ্বের সুযোগে মালবে পরমারগণ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন মুঞ্জ (৯৭৩-৯৫)। কলচুরিরাজ দ্বিতীয় যুবরাজকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। চের, চোল, চৌলুক্য, চৌহান প্রভৃতি রাজগণের সহিতও তাঁহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈলপের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মুঞ্জ বিদ্যোৎসাহী, রসিক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ছান্দসিক হলায়ুধের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

পরমারবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ভোজ (১০১০-৫৫)। কল্যাণী ও কলচুরি রাজ্যগুলির সহিত তাঁহার বার বার সংঘর্ষ হয়। অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেও, অবশেষে কল্যাণীর চালুক্যরাজ ও ত্রিপুরীর কলচুরিরাজের মিলিত প্রচেষ্টায় পরাজিত ও নিহত হন। ভোজ কেবল সুযোদ্ধা ও বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিদ্বান্ বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্প-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কাব্য, দর্শন, অলংকার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, ভেষজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

ভোজের মৃত্যুর পর পরমারগণ দুর্বল হইয়া পড়েন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাটের চৌলুক্যগণ মালবের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস মালব আক্রমণ করেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক মালব অধিকৃত হয়।

চৌলুক্য বা সোলাংকীগণ।—দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৌলুক্যগণ গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা সোলাংকী নামেও খ্যাত। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা প্রথম ভীম (১০২২-৬৪) কল্যাণীর চালুক্যরাজ ও ত্রিপুরীর কলচুরিরাজের সাহায্যে মালবের পরমার বংশীয় ভোজরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। গজনীর সুলতান মামুদ অতর্কিতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি রাজধানী অন্‌হিলবাড়া (বর্তমান পাটন) ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং মামুদ বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন। ফিরিবার পথে মামুদের সৈন্যবাহিনী ভীমের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে গুজরাটের কোনও অংশে মামুদ অধিকার বিস্তার না করিয়াই চলিয়া যান।

এই বংশের জয়সিংহ সিদ্ধরাজের (১০৯৪-১১৪৪) সময়ে চৌলুক্য রাজ্য গুজরাট, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ ছাড়াও রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের কতকাংশে বিস্তার লাভ করে। জয়সিংহ সিদ্ধরাজ পরমারবংশীয় যশোবর্মণকে পরাজিত করিয়া মালবের একাংশ অধিকার করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাটনের সহস্রলিঙ্গের মন্দিরটি তাঁহারই কীর্তি।

চৌলুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় ভীমের (১১৭৮-১২৪১) আমলে মহম্মদ ঘুরী ও কুতবুদ্দিন আইবক গুজরাট আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। কিন্তু দ্বিতীয় ভীমের পর এই বংশের পতন ঘটে। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণ আলাউদ্দিন খলজির হস্তে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন (১২৯৬)।

চাহমান বা চৌহানগণ।—চৌহানগণ প্রথমে গুর্জর-প্রতিহারগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। যোধপুর ও জয়পুর রাজ্যের সীমান্তবর্তী সম্ভর (শকম্ভরী) চৌহান রাজবংশের বাসস্থান ছিল। দশম শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহারা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং দিল্লী ও আজমীর তাঁহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হইয়া উঠে। এই বংশের রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ (১১৭৯-৯২) সম্পর্কে বহু কাব্যকাহিনী রচিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে চাঁদ বরদাই-রচিত "পৃথ্বীরাজ-রাসো" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

চন্দেল্ল ও চৌলুক্য বংশীয় রাজগণের সহিত তৃতীয় পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সকল যুদ্ধে পৃথ্বীরাজই জয়ী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল এবং জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছায় মহম্মদ ঘুরীকে দিল্লী আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। যাহাই হউক, পৃথ্বীরাজের সময়েই মহম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পৃথ্বীরাজ

তরাইনের যুদ্ধ

থানেশ্বরের অদূরে তরাইনের প্রান্তরে পর পর দুইবার পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘুরীর সংঘর্ষ হয়। প্রথম বারের যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী পরাজিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে (১১৯২) পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। দিল্লী ও আজমীর মহম্মদ ঘুরীর অধিকারভুক্ত হয়।

গাহড়বালগণ।—সম্ভবত কাশীতেই গাহড়বাল রাজ্যটি প্রথমে স্থাপিত হয়। অতঃপর একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজ তাঁহাদের অধিকারে আসে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র (১১১৪-৫৪)। তিনি পাঞ্জাবের সুলতান মামুদের বংশধর, বঙ্গদেশের সেন, বিহারের পাল ও ত্রিপুরীর কলচুরি রাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, কিন্তু উত্তর ভারতের চন্দেল্ল ও দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলেন।

এই বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩)। লক্ষ্মণ সেন তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন কাশী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাহা সত্য হইলে, জয়চন্দ্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বলা চলে। জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘুরীকে দিল্লী আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে। ইহা ঐতিহাসিকতার দিক্ হইতে কতখানি সত্য, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর জয়চন্দ্রই উত্তর ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হিন্দু রাজা ছিলেন। তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর বৎসর মহম্মদ

জয়চন্দ্র

ঘুরী কনৌজ আক্রমণ করেন এবং চন্দাবারের যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন (১১৯৪)। অতঃপর গাহড়বাল রাজ্যের কিয়দংশে তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতে থাকেন। যোধপুরের বিখ্যাত রাঠোরগণ সম্ভবত ইঁহাদের বংশধর।

চন্দাবারের যুদ্ধ

তুর্কীগণের অভ্যুত্থান।—৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওমাইয়াদ বংশীয় শেষ খলিফা "আব্বাস বংশীয়" আবু বনীর হস্তে পরাজিত হন। এখন হইতে খলিফার রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে মুসলিম জগতে আরবগণের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং অন্যান্য মুসলিম জাতিগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। বিখ্যাত আব্বাস বংশীয় খলিফা হারুন-অল-রশিদের সময়েই সর্বপ্রথম তুর্কীগণ সৈন্যবাহিনীতে সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পরবর্তী জনৈক খলিফা দুই তিন হাজার তুর্কীকে তাঁহার দেহরক্ষী বাহিনীতে নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তুর্কী জাতি মুসলিম জগতে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা মিশর হইতে সমরখন্দ পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আফগানিস্থানের গজনী নামক স্থানে একটি স্বাধীন তুর্কী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

গজনীর অভ্যুত্থান।— দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে যখন রাজনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল, তখন গজনী রাজ্যটি ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। আলপ্তিগিন নামে এক তুর্কী গজনীতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন (৯৬৩)। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগিন গজনীর রাজা হন (৯৭৭)। এই সময়ে হিন্দু-শাহীবংশীয় রাজা জয়পাল পূর্বে চেনাব হইতে পশ্চিমে লামঘান পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। সবুক্তিগিন পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিলে জয়পালের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িল। জয়পাল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া গজনীর উদ্দেশ্যে অভিযান করিলেন। পথে অকস্মাৎ তুষারপাতের ফলে তাঁহার সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হইল এবং তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ, ৫০টি হস্তী

সবুক্তিগিন

এবং সীমান্তবর্তী কতিপয় দুর্গ ও নগর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সবুক্তিগিনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাজধানীতে ফিরিয়া তিনি সন্ধির এই সকল অপমানজনক শর্ত পালন করিলেন না এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজার সাহায্যে এক বিশাল বাহিনী লইয়া পুনরায় গজনী অভিযান করিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার পরাজয় ঘটিল। লামঘান হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল সবুক্তিগিনের অধিকারভুক্ত হইল।

সুলতান মামুদ।—সবুক্তিগিনের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মামুদ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে রাজা হইলেন (৯৯৮)। তাঁহার পূর্ববর্তীগণ 'আমীর' (অধীন রাজা) বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু খলিফা মামুদকে 'সুলতান' (স্বাধীন রাজা) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। মামুদের মধ্যে ধনলিপ্সা ও ধর্মান্ধতার এক ভয়ংকর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই ধনলিপ্সা ও ধর্মান্ধতা চরিতার্থ করিবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ। তাঁহার একত্রিশ-বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে তিনি সতের (মতান্তরে পনের) বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভারতে ধ্বংস, হত্যা ও লুণ্ঠনের যে তাণ্ডবলীলা চালাইয়াছিলেন, সচরাচর তাহার তুলনা মেলে না।

মামুদের ভারত অভিযান।—১০০০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ প্রথম বার ভারত অভিযান করিলেন। সীমান্ত অঞ্চলের কতিপয় দুর্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। পর বৎসর তিনি পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলে জয়পালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জয়পাল সপরিবারে বন্দী হইলেন। মামুদ জয়পালের রাজধানী উদভাণ্ডপুর ধ্বংস করিলেন। প্রচুর অর্থ ও ৫০টি হস্তী দেওয়ার শর্তে জয়পাল মুক্তি পাইলেন। কিন্তু লজ্জায় ও গ্লানিতে তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন (১০০২)। জয়পালের পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল শাহী রাজ্যের রাজা হইলেন। ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ ভাতিন্দা ও আলোয়ার রাজ্যের নারায়ণপুর অধিকার করিলেন। শীঘ্রই তাঁহার সহিত মুলতানের মুসলমান শাসনকর্তারও বিবাদ বাধিল। শাহী রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদ মুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে চাহিলে আনন্দপাল বাধা দিলেন। ফলে যুদ্ধ

জয়পালের মৃত্যু

বাধিল। আনন্দপাল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের হিন্দু রাজারা তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে উদভাণ্ডপুরের নিকট মামুদের সহিত আনন্দপালের সংঘর্ষ হইল। যখন আনন্দ পালের জয় প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া আসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ তাঁহার হস্তী ভীত হইয়া পলায়ন করিলে হিন্দু সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ও অপ্রত্যাশিতভাবে মামুদ জয়ী হইলেন। আনন্দপাল পরাজিত হইয়া নগরকোট (কাংড়া) অভিমুখে পলায়ন করিলেন। মামুদ নগরকোট লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনদৌলত লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। সিন্ধু নদ হইতে নগরকোট পযন্ত সমস্ত অঞ্চল সম্ভবত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। তিনি ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান এবং ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর অধিকার করিলেন। তাঁহাব হস্তে ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর, ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ, গোয়ালিয়র ও কালঞ্জর লুণ্ঠিত হইল। পাঞ্জাবেব পূর্বাংশে আনন্দপালেব পুত্র ত্রিলোচনপাল রাজত্ব করিতেছিলেন, মামুদ তাঁহাকেও পবাজিত করিলেন (১০১৯)। ত্রিলোচনপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভীমপাল কিছুদিন মামুদের বিরোধিতা করেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভীমপালের মৃত্যু হইলে শাহীবংশ লোপ পায়।

আনন্দপালের পরাজয়

অন্যান্য অভিযান

১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গুজরাট আক্রমণ করিলে চৌলুক্যরাজ প্রথম ভীম রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। মামুদ সমুদ্রতীরবর্তী সোমনাথেব বিখ্যাত মন্দির আক্রমণ করিলেন। তাঁহার হস্তে মন্দিররক্ষাকারী পাঁচ হাজাব হিন্দু নিহত ও মন্দিরের স্বর্ণনির্মিত শিবলিঙ্গ বিচূর্ণিত হইল। মামুদ অতুল ঐশ্বয লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন।

সোমনাথ লুণ্ঠন

ইহার কিছুকাল বাদে, ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে, মামুদের মৃত্যু হইল। মামুদ ভারতবাসীর নিকট নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারী ও পরধর্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর হইতে পূর্বে গঙ্গা নদী এবং উত্তরে আরল হ্রদ হইতে দক্ষিণে রাজপুতানা

পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁহার এই বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে গজনী ইসলাম জগতে একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মামুদ নিজে কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। "শাহ্‌নামা'র বিখ্যাত রচয়িতা ফিরদৌসী, আনসারি, ফারুকি ও আল-বিরুনির ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবি ও পণ্ডিতগণ তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন।

মামুদের চরিত্র

আল্-বিরুনি।—আল্-বিরুনির প্রকৃত নাম আবু রিহান। তিনি ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে খিবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে খিবা অধিকারকালে মামুদ তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। পরে তিনি মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আসেন এবং কিছুকাল ভারতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে বহু তথ্য সহানুভূতির সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া যান। উপনিষদের একেশ্বরবাদ তাঁহাকে মুগ্ধ করে। তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে ভারতে বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। রাজদ্বারে লিখিতভাবে অভিযোগ করা হইত। দণ্ড লঘু ছিল। ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইত না। রাজস্ব ও করভার লঘু ছিল। ব্রাহ্মণকে কর দিতে হইত না। ভারতীয়গণের মধ্যে নানারূপ কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সমসাময়িক ভারতের স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীর, সিন্ধু, মালব, গুজরাট, বঙ্গদেশ ও কনৌজের উল্লেখ করেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান।—মামুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ গৃহবিবাদের ফলে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়েন। হীরাট ও গজনীর মধ্যে ঘুর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। মামুদের মৃত্যুর শতাব্দী কাল পরে ঘুর রাজ্য গজনীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিল। ফলে গজনী ও ঘুর রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। অবশেষে ঘুররাজ গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ গজনী অধিকার করিয়া (১১৭৩) তাঁহার ভ্রাতা মুইজুদ্দিন মহম্মদকে গজনীর

শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এই মুইজুদ্দিন মহম্মদই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত।

মহম্মদ ঘুরী ঘুর সাম্রাজ্যকে পূর্বদিকে প্রসারিত করিতে চাহিলেন। তিনি ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান ও উচ অধিকার করিলেন। কিন্তু ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাট আক্রমণ করিয়া গুজরাটরাজের হস্তে পরাজিত হইলেন। সুলতান মামুদের বংশধর খসরু শাহ্ গজনী হইতে বিতাড়িত হইয়া পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী খসরু শাহ কে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন। এইভাবে পাঞ্জাব হস্তগত হওয়ায় তাঁহার নিকট ভারতের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইল। পাঞ্জাবের পূর্বেই দিল্লী ও আজমীর রাজ্য অবস্থিত ছিল এবং তথায় চৌহান বংশীয় রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। মহম্মদ ঘুরী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইনের প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল (১১৯১)। যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী পরাজিত হইলেন। কিন্তু পর বৎসর তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, তরাইনের প্রান্তরে পুনরায় যুদ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলেন। আজমীর ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুর সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল (১১৯২)। অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার তাহার অন্যতম প্রিয় সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবকের হস্তে দিয়া মহম্মদ ঘুরী দেশে ফিরিয়া গেলেন। কুতবুদ্দিন আইবক হানসী, মীরাট, দিল্লী ও রণথম্ভোর অধিকার করিলেন।

পাঞ্জাব অধিকার

তরাইনের যুদ্ধ

পর বৎসর মহম্মদ ঘুরী পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। কনৌজ ও বারাণসী অঞ্চলে গাহড়বাল বংশীয় রাজপুত রাজা জয়চন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। মহম্মদ ঘুরীর হস্তে জয়চন্দ্র চন্দাবারের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইভাবে ঘুর সাম্রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। মহম্মদ ঘুরীর অন্যতম সেনাপতি ইক্তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজি পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ অধিকার করিলেন। কুতবুদ্দিন কর্তৃক গুজরাট, কালঞ্জর মহোবা ও বদাউন অধিকৃত হইল। এইভাবে উত্তর ভারতে এক বিশাল মুসলমান

ঘুর সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। ঘুর সাম্রাজ্য আফগানিস্থান হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন মহম্মদের মৃত্যু হইলে মহম্মদ ঘুরী ঘুর, গজনী ও দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মধ্য-এশিয়ার খোয়ারিজমের শাহ্ আলাউদ্দিন মহম্মদের হস্তে পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ের ফলে ঘুর সাম্রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। পাঞ্জাবের খোকর উপজাতির লোকেরাও বিদ্রোহ করিয়াছিল। মহম্মদ ঘুরী কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন, কিন্তু ফিরিবার পথে পাঞ্জাবে এক গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন (১২০৬)।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু

মহম্মদ ঘুরী অপুত্রক ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্য যেমন হইয়াছিল, তেমনি মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইল। কুতবুদ্দিন আইবক ঘুর সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের অধীশ্বর হইলেন। দিল্লীই মুসলমান-শাসিত ভারতের রাজধানী হইল। এইভাবে ভারতে সুলতানী শাসন ও মুসলিম যুগের সূত্রপাত হইল।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the origin of the Rajputs ? How did internal dissensions among them invite foreign aggression and lead to the establishment of the Delhi Sultanate ?

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে কি জান ? রাজপুতগণের আত্মকলহ কিভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং কিভাবে দিল্লী সুলতানির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল ?

2. What do you know about the rise of Islam in Arabia and its spread to Central Asia and north-west India ? Who was Muhammad bin Kasim ? Who tried to resist his invasion ? Did the Arabs play any role in spreading Indian Culture abroad ?

আরবদেশে ইসলামধর্মের অভ্যুত্থান এবং মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে উহার প্রসার সম্পর্কে কি জান ? মহম্মদ বিন কাশিম কে ছিলেন ? কে তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন ? বহির্বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারের কাযে আরবগণ কি কোনও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ?

3. Who was Alberuni's patron ? Was he a great king ? What do you know of his invasion of India ?

কে আলবেরুনির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ? তিনি কি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন ? তাঁহার ভারত অভিযান সম্পর্কে কি জান ?